# স্বপ্নের খরাপাখি

পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ : কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ ১৩৬৭
প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট
প্রবীর সেন
মুদ্রাকর
মথুরামোহন দত্ত
মা শীতলা প্রেস
৭০ ডবলিউ. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৬
বাঁধিয়েছেন
গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স
৩৮/এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা ৯

# ফুলের দেশে ফুলপরী

নদী চাইলেই মানুষের কাছে যেতে পারে না অথচ পুরুষ চাইলেই পারুলের কাছে যেতে পারে সহজে। যাওয়া-আসায় কোনও বাধা নেই সেখানে। না এলেই বরং অখুশি হয় পারুল, চোখের ভ্রূ নাচিয়ে সারামুখে দুঃখের সর মেখে বলে, জানিস কনক, আজ আমি এক শালিকের মুখ দেখেছিলাম, আজ যে আমার ভাগ্যে খদ্দের জুটবে না এটা আমি জানতাম। অপয়া শালিকগুলো যে কোন আমার ঘরের সামনে সকাল হলে ঘুর ঘুর করে বুঝি না। আমার যদি শালিক ধরার ফাঁসজাল থাকত তা হলে আমি পাখিগুলো ধরে ওদের ডানা মুচড়ে ভেঙে দিতাম।

শালিক পাখি নিয়ে পারুলের আরও অনেক চাপা আক্রোশ আছে বুকের ভেতরে। যেদিন খারাপ যায় দিন সেদিন গ্যাঁজ গ্যাঁজ করে দুঃখ, পচা গুড়ের মতো মন নিয়ে সে কনককে বলবে, জানিস কি না — এই শালিকপাখি হল আমার জীবনে কালপাখি। যেদিন আমার মা মরল সেদিনও আমি সকালবেলায় এক শালিকের মুখ দেখেছিলাম।

কনক চুপ করে থাকতে ভালবাসে, এ লাইনে তাই তার আদর কম। তিন বছর পেরিয়ে গেল, লাইনের হাওয়া আঁচ লাগিয়ে তবু সে সড়গড় হল না। পারুলই তাকে টিপ্পুনী কেটে বলে, ময়না যতই সোন্দর হোক না কেন কথা না বললে তার দাম শালিকপাখির চাইতেও কম। এ লাইনে যার যত মুখ তার তত সুখ। দেখিসনে চম্পা কেমন ফটর ফটর কথা বলে যেন ধরানো তুবড়ি। চম্পার মুখের কাছে কোর্টের উকিলগুলো ফেল মেরে যাবে।

রাতজাগা চোখের নিচে বাসি কাজল, খোঁপায় বাঁধা বেলিফুল আর গন্ধ ছড়ায় না তবু ঝিমিয়ে যাওয়া ফুলগুলোই কনক খোঁপায় বেঁধে নিয়েছে যত্ন করে, ফুল দিলে তাকে নাকি ভারি সুন্দর দেখায় সেইজন্য। কনকের গায়ের রং চাপা নয়, পাকা গমের চেয়েও উজ্জ্বল, সেইজন্য বুঝি তার বাবা-মা নাম রেখেছিল কনকচাঁপা। এ লাইনে চাঁপা নামের যে মেয়েটা রোজ রেললাইনের ওপারে দেহ দেয় সে-ই একদিন তুমুল ঝগড়া করে বলল, তুই আমার ভাত মেরে দিবি নাম ভাঙিয়ে। ভাল চাস তো নামটাকে ছোট করে নে। আমি চাঁপা, তুই কনক — ব্যস, মিটে গেল ঝামেলা।

সেদিনও পারুল ছিল কনকের পাশে। গলায় ঝাঁঝ মিশিয়ে বলেছিল, চাঁপা, বলিহারি তোর নামের খিদে! পেটের খিদে মেটাতে গিয়ে বাবা-মা'র দেওয়া নামটাকে অমনভাবে চটকাস নে। আমি জানি রে আমাদের নামে কিছু এসে যায় না, এই গতরটা যত দিন তোর ঘষামাজা পেতলের হাঁড়ির মতো থাকবে ততদিন

খদ্দের তোর পিছু পিছু মাছির মতো ভনভনিয়ে উড়বে। হাঁড়িতে টোল পড়লে, রং চটলে খেল খতম। আমারও তো কম দিন হল না এ লাইনে। হারামির এই জীবনটার নাড়ি-নক্ষত্র আমি সব জানি। পিক ফেললেও পারুলের বেঁচে থাকা, শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, বাড়িভাড়া মেটানো সব এই দেহব্যবসাকে কেন্দ্র করে। ফুল ফুটলেই যে ভ্রমর আসবে এমন মাথার দিব্যি দেয়নি ভগবান। সুখলতা মাসি বলত, লজ্জা-ঘেন্না ভয়, এই তিন শরীল থেকে না তাড়ালে সেই শরীল রেল লাইনের খোয়ার চাইতে অধম। যারা খদ্দের ঠকিয়ে পয়সা নেয়, ছেনালি করে তারা গন্ধানালির মাছির চেয়েও অধম। মরে গেলে তাদের মুখে কেউ আগুন দেয় না। শ্যাল-কুকুরে ছিঁড়ে খায়। শকুনে খুবলে নেয়। এ লাইনে কেন যে কোনও লাইনে পসার জমাতে গেলে নিজে বরফের মতো জমে গেলে চলবে না, গলে গলে জল হয়ে পড়তে হবে। তবে গিয়ে শান্তি।

শুধু পারুল নয় ; কনক, চম্পা, ঝর্না আর বিন্‌তি সবাই হা করে শুনত সুখলতা মাসির মুখ নিঃসৃত কথাগুলো। যেন কথা নয়—বেদবাক্য, গায়ে না মাখলে সমূহ বিপদ।

স্টেশনটার বুকের পাঁজর ফাটিয়ে চলে গিয়েছে চকচকে রেললাইন। রিকশা স্ট্যান্ডটার পিছন দিকে দোকান আছে মন কাড়া। চা-দোকান থেকে শুরু করে চোলাই মদের দোকান কী নেই স্টেশন এলাকায়। রাতের ট্রেনে এখানে নেমে পারুল আর ফিরে গেল না। চা-দোকানে সুখলতা মাসি তার চোখ-মুখ দেখে বুঝেছিল। এ মেয়ে বনের পাখি, খাঁচায় পুরতে পারলে শুধু লাভ আর লাভ। চোখ-মুখের চেহারা ভাল ছিল পারুলের, সব চেয়ে ভাল ছিল তার শরীরের বাঁধন। সুখলতা মাসিই চায়ের দাম মিটিয়ে দিল, কাঁচা মদের দোকানের পেছন দিকটায় নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে শুধিয়েছিল, এ বেটি, তোর ঘর কোথায়?

সেদিন সহসা কোনও উত্তর দিতে পারেনি পারুল, শরীর ঝাঁকিয়ে কেঁদে ফেলেছিল, আঁচলে চোখ রগড়ে বোবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল। সুখলতা মাসিই প্রথম হাত ধরল তার, ভরসা জুগিয়ে বলেছিল, কাঁদিস নে। তোর সব কথা আমি বুঝে গিয়েছি। তুই আমার ঘরে থাকবি চল। এই মাসি যত দিন আছে, খাটতে না পারলেও তোর কোনও দিন ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।

স্টেশনের উল্টো দিকে ছোট ছোট ঘরগুলোয় হাওয়া-বাতাস কম আসে। দিনের বেলা আলো ঢোকে না, গুমোট দশা, থ্রু ট্রেন গেলে কেঁপে ওঠে চড়ুই পাখির বুকের মতোন পাঁচ ইঞ্চির দেওয়াল। তবু ওই ছোট-ছোট ঘরগুলোয় বাবুরা এসে কত শান্তি পায়। প্রথম প্রথম লজ্জায় কুঁকড়ে যেতো পারুল, অন্ধকার ঘর থেকে এক ছুটে পালিয়ে যেত মাসির কাছে, ছলছলে চোখে বন্যা নামত অসময়ে। সুখলতা মাসি তার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দিয়ে বলত, যা, ভয় করলে ভয়। ভয় না করলে জয়। মেয়েমানুষের জন্ম হয়েছে পুরুষকে সুখ দেবার জন্য। এ তো অধর্ম নয়, এও এক পুণ্য। সবাই এ পুণ্যের ভাগীদার হতে

পারে না। স্বর্গের মেনকা উর্বশী রম্ভা ওরাও তো আমাদের মতো। ওরা যখন লাজ করেনি তখন আমরা চুনোপুঁটি হয়ে লাজ দেখিয়ে কি মরব।

দিনে দিনে সব সয়ে গেল পারুলের, এখন শরীর থেকে শাড়ি খুলে ফেলতে তার লাজ লাগে না বরং খদ্দের দেরি করলে সে চটে ওঠে। 'ডবল রেট' দিতে হবে বলে চেল্লায়। ফেল কড়ি মাখো তেলের যুগ ফলে কাউকে বাড়তি সুযোগ দিতে সে রাজি নয়। সুখলতা মাসির নিষেধ আছে এসবে।

কনক মুখ শুকিয়ে ফিরে যেতে চাইছিল সেই শালিকের গল্পে, পারুল ও পথে আর হাঁটল না, মুখের ভেতর সুগন্ধি জর্দা পান গুঁজে দিয়ে শুধোল, হ্যাঁ রে, তোর সেই ফাঁড়াটা কি কেটে গিয়েছে? কোন ডাক্তার দেখালি?

দুটো প্রশ্নবাণেই কনক পাশে সরে এল পারুলের, ম্যাদামারা চোখে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ তারপর নাক টেনে নিয়ে কেমন খনখনে গলায় বলল, ডেলি একটা করে ইন্‌জিসিন আর সহ্য করতে পারিনে। ছোকরা ডাক্তারটা ইন্‌জিসিন দেয় হাতে, আর বুক ডলতে থাকে। কাল বলেছে কোমরে দেবে। কোমরে দিলে নাকি ব্যথাটা একটু কম লাগে।

পারুল বারুদবাতির মতো জ্বলে ওঠে, ঢ্যামনার চোখ গেলে দিতে পারিস নে। আমি হলে মজা বুঝিয়ে ছাড়তাম। বিনি পয়সায় ফুর্তি মারা ঘুচিয়ে দিতাম। আমি শুনেছি ডাক্তারের সুন্দরী বউ আছে ঘরে, তবু দেখ কেমন ইতরপনা।

---ফাউ পেলে কে না নেয়। কনকের মিনমিনে গলা, ওরা বুঝে গিয়েছে আমাদের আর কোনও উপায় নেই, এ শহরের আর কোনও ডাক্তার আমাদের ছোঁবে না।

—কাঁচা ঘায়ে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে যারা খুন-পসিনা বের করে তাদের কিন্তু ভাল হবে না। তারা ওলাউঠোয় মরবে দেখবি। পারুল হাঁপিয়ে উঠেছিল উত্তেজনায়, কনক তাকে শান্ত করে বলল, তোমার শরীর এখন কেমন আছে? মাসি বলছিল তোমাকেও নাকি রোগ ছুবলেছে।

পারুলের বুকের ভেতরে ধস নামল, আঁতকে উঠে সে বলল, যে ওঝা সাপ নিয়ে খেলা দেখায় তার মৃত্যু হয় সাপের বিষে। আমি আর নিজেকে নিয়ে ভাবি না রে! ভেবে কী হবে বল তো? আমার কে আছে যে আমি তার কাছে ফিরে যাব? মা ছিল, মা মরল। বাপ তো পাগল হয়ে চলে গেল। যারা আশে পাশে ছিল তারা আমাকে বিনে পয়সায় ছিঁড়ে খেতে এল। আমি কি ভাগাড়ের মরা গোরু যে চিত হয়ে থাকব যতক্ষণ না হাড়-পাঁজরা বেরয়। তাই প্রাণের দায়ে পালিয়ে এলাম। তারপরের ঘটনা তো তোরা সব জানিস। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে গন্ধ ছাড়বে।

পারুল চুপ করে গেলেও কনকের বুকের ভেতরে জোয়ার থামল না, হাই তুলে সে বলল, তোমার জন্য আমার ভীষণ কষ্ট হয়। কেন কষ্ট হয় আমি তা জানিনে। তবে এটুকু জানি তুমি না থাকলে আমার জীবন পচে গলে সার হয়ে

যেত। সে রাতে তুমি যদি ওই রাক্ষসগুলোর হাত থেকে না বাঁচাতে তাহলে ওরা আমাকে খুন করে পালিয়ে যেত। অতগুলো পশুর খিদে মেটাতে আমি কি পারতাম বলো? আমারও তো চামড়ার শরীর, কতক্ষণ আর ধকল সইতে পারত?

—পুরনো কথা সব ভুলে যা। পারুল কষ্ট করে তাকাল, কনকের পাশে সরে এসে হাত ধরল ওর, নিচু গলায় ভয়ে ভয়ে বলল, আমারও শরীরে ক্ষয় শুরু হয়েছে। আমি বুঝতে পারি আমার আর বেশি দিন নেই। গ্যাস বেলুনের হাওয়া বেরিয়ে গিয়েছে সব। খুব দুর্বল লাগে রে! মাসিকে সব কথা বলি না। মাসি যদি খচে যায়!

এখানে কনকের আপন বলতে পারুল ছাড়া আর কেউ নেই। বুড়ো ভামটা মাতাল হয়ে তার বুকে যেদিন দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল সেদিন এই পারুলই কোথা থেকে ওষুধ এনে লাগিয়ে দিয়েছিল তার বুকে, সারারাত পাশে বসে ছিল মায়ের মতো, সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, কাঁদিস নে বোন। তোর বুক দুটো যে খাবলে তুলে নেয়নি এই রক্ষে! ওই জানোয়ারগুলো তো মায়ের পেটে জন্মায়নি, ওরা আকাশ থেকে খসে পড়েছে, ওরা আর মেয়েমানুষের দুঃখ কী বুঝবে বল? তবে ওই বুড়ো ভামটাকে আমি যদি কোনও দিন পাই সেদিন আমি ওর বারোটা বাজিয়ে দফারফা শেষ করে দেব। সেদিন বুঝবে মেয়েমানুষের বুকে শুধু দুধ নয়, বিষও থাকে।

পারুলের অসুখের খবর জানাজানি হয়ে গিয়েছে পাড়ায়। পারুল আর চোখে কাজল মেখে, মুখে কমা পাউডার ঘষে, খোঁপায় ফুল গুঁজে প্লাস্টিকের চপ্পল পায়ে গলিয়ে স্টেশনের অন্ধকার রাস্তায় ঘোরাফেরা করে না। সুখলতা মাসি তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছে, একটা মুরগির রোগ হলে সব মুরগি ধড়াধড় মরে যায়। যার রোগ হয়েছে তার সরে যাওয়া ভাল। একের জন্য দশের ক্ষতি হোক এ আমি চাইনে। পারু, তুই ঘরে থাক। আমি তো বলেছি তোর খাওয়া পরার সব দায় দায়িত্ব আমার।

রোগটা কবে যে পারুলের শরীরে ঢুকেছে এ কথা সে মনে করতে পারে না। তবে বম্বে থেকে আসা লাস্ট ট্রেনের সেই খদ্দেরটাকে দায়ী করছে পারুল। লোকটার তর সইছিল না। দরদাম না করেই দুটো পঞ্চাশ টাকার নোট ধরিয়ে দিয়েছিল হাতে। আদর করে বলেছিল, আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি ভদ্রঘরের ছেলে। ঘরে আমার বউ আছে। ছ'মাসের উপর বউ ছাড়া আমি। শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। কী করে থাকি বলো?

অন্ধকারে পারুল তার মুখটাকে ভাল করে দেখতে পারেনি। বেলা পড়ে গেলে আঁধার নামে। যৌবন চলে গেলে মুখে ফুটে ওঠে মেচেতার দাগ। বয়স বাড়লে শরীরের খাঁজগুলো আর অলঙ্কার থাকে না, কলঙ্ক দাগ হয়ে ফুটে ওঠে। মাস কয়েক থেকে বাজার পড়তি ছিল পারুলের। একটা পাউরুটি খেতে মন

হলে কনকের কাছে হাত পাতত। চাঁপা চোখ টেরিয়ে চলে যেত। বলত, শরীলে আগুন না থাকলে ছাই হয়ে যায় সব। আমার এমন দশা হওয়ার আগে যেন মরণ হয়। দোকান আছে কিন্তু মাল নেই, এভাবে আমি বাঁচতে চাইনে। সাত-পাঁচ ভেবে মাথার ঠিক রাখতে পারেনি পারুল। টাকাগুলো মুঠো করে ধরে নিয়ে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল বম্বে ফেরত বাবুর সেবায়। মনে মনে গর্বিত হয়েছিল সে। এই পড়ন্ত বেলায় তার শরীর কীভাবে যুবক বাঘকে ঘায়েল করছে এই ভেবে। ছেলেটি কাজ মিটে যাওয়ার পর আর দাঁড়ায়নি। ভোরের বাস ধরে চলে গেল। এ ঘটনার পরেই ঝিমিয়ে গেল পারুল। কনক তাকে জোর করে পরিচিত ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। হাতুড়ে ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, ইনজেকশন নিতে হবে, এ বেলায় ও বেলায় দুটো করে। কড়া ডোজের ওষুধ খেতে হবে। রোগটা সাধারণ নয়, একেবারে হাড়ে গিয়ে ঠেকেছে।

ওষুধ-ইনজেকশন সব বিফলে গেল। সুখলতা বিরক্ত হয়ে বলল, আর কত দিন ঘাটের মড়া বয়ে বেড়াব? আমারও আয় কমেছে। নিজেরই চলে না।

কথাটা বড্ড গায়ে লেগেছিল কনকের, থাকতে না পেরে সে বলেছিল, পারুলের সব খরচ আমার। তোমার যদি অসুবিধা থাকে আমি তাহলে ওকে আমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। দু-পাঁচ বছরের মধ্যে আমার বাজারদর কমবে না। পারুল আমার রান্নাঘরে থাকবে। বিপদে পড়েছে বলে আমি ওকে ফেলে দেব না। ও না থাকলে আমি যে ভেসে যেতাম। এখন ও ভেসে যাচ্ছে, ওর দুর্দিনে আমি তো ওকে ভাসিয়ে দিতে পারিনে। এত পাপ করেছি, পাপের ঘড়া ভরে গিয়েছে, আমি আর পাপ করতে পারব না।

কনকের হাত ধরে পারুল চলে এল কনকের ঘুপচি রান্নাঘরে। দড়ির খাটিয়া ছেড়ে সে এখন আর উঠতে পারে না। চোখ বসে গেছে, চোখের নীচের কালি ভরে যাচ্ছে সারা মুখে। মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে শুকনো ভুঁই পুরো মুখ। ঠোঁট ফ্যাকাসে। জ্বর আসে প্রায়ই। আবার ছেড়েও যায়। হাড়ের ভেতর থেকে শুলোনি ওঠে। বুকের চারপাশে একফোঁটা বল পায় না। বড় করে চোখ মেলতেও কষ্ট। কথা বলতেও কষ্ট। তবু সে কান্না কান্না মুখ করে বলে, কনক আমি বাঁচব না রে। আমাকে জাতসাপে ছোবল মেরেছে। আমার এ রোগটা সে রোগ নয়। এটা সম্পূর্ণ অন্য রোগ। এ লাইনে এতদিন আছি, কই আমার মতো তো কাউকে ভুগতে দেখিনি। আমি মরে যাব কনক। চোখের জল আর কথা শোনে না। কনকের হাত আঁকড়ে কেঁপে ওঠে পারুল।

এত কষ্ট তার শরীরে তো কোনও দিন ছিল না। ছোটবেলায় জ্বরজ্বালা কম হত পারুলের, সর্দি কাশিরও ধাত ছিল না। ছাইগাদার মানকচুর মতো বেড়ে যাওয়া তার শরীরে সৌন্দর্যটাই ছিল আসল নজরকাড়ার মূলমন্ত্র। তার মা বলত,

আমার মেয়েটাকে বড় ঘরে বিয়ে থাওয়া দেব। আমার তো হাজার গণ্ডা নেই সবে ধন এই পারুল। মায়ের স্বপ্নপূরণ হয়নি। বহু জ্বালা নিয়ে সেও মরল। তারপর থেকে পারুলের চোখের সামনে শুধু পচা পাঁক অন্ধকার। সুখলতা মাসি বিকেলে এল। পারুলের শোচনীয় অবস্থা দেখে তার মন কু-গেয়ে উঠল। কনককে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, পারুলের রোগটা মোটে ভাল নয়। আমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। ডাক্তার বলল, এ রোগের কোনও চিকিৎসা নেই।

মেয়েটা চোখের সামনে মরবে অথচ ওর মরার বয়স হয়নি। আমাদের এই খচ্চড় লাইনে পারুলের মতো মেয়েরা খুব কম আসে। আমি যেদিন ওকে প্রথম দেখলাম সেদিনই বুঝেছিলাম ও খুব বড় ঘরের মেয়ে। প্রথম থেকে আমি চেষ্টা করতাম ওকে একটু সুখে রাখার। পারুলও আমার জন্য কম করেনি। ওর পেটে যখন ছানাপুনা এল তখন আমার কথাতেই বস্তিতে গিয়ে পেট ধসিয়ে এল। আমি হলফ করে বলতে পারি পেটে বাচ্চা এলে সব মেয়েরই মা হওয়ার সখ হয়। কেউ তার পেটের ছানাকে নষ্ট করতে চায় না। অথচ দেখ পারুল কেমন এক কথায় রাজি হয়ে গেল। ও মুঠো মুঠো টাকা কামিয়ে এনে আমাকে দিয়েছে। কোনওদিন টাকাপয়সার হিসাব চায়নি। ওর বিপদের দিনে আমারও কিছু করা উচিত। না হলে বুড়ো শিব আমাকে যে পাপ দেবে।

সুখলতা পারুলের চিকিৎসার জন্য শহরের নামকরা ডাক্তারদের দোরে দোরে ঘুরল। কনকও ধান্দা কামাই করে সঙ্গী হল তার। যা শুনল নিজের কানে তা না শুনলেই বুঝি ভাল হত। পারুলের রোগটা এ দেশের নয়, বিদেশের। বম্বের সেই স্বর্ণকার ছেলেটা ওর রক্তে রোগ ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেছে। পারুল সহজ বিশ্বাসে তার কাছে দেহ দিয়েছিল। এ সব লাইনে বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। খদ্দের খুশ্ না হলে সেই পয়সা নিয়ে কোনও সুখ নেই। তাছাড়া ধর্মেও সইবে না। পারুলের অসুখের কথা ভেবে কনকের মুখ শুকিয়ে গেল। বস্তিতে ঢোকার মুখে প্রকাণ্ড পাকুড়গাছ। ওখানে এসে মেয়েরা সুতো বেঁধে দেয় বৃহস্পতিবারে। পেতলের ঘটি ভরে জল ঢালে গাছের গোড়ায়। গাছটার একটা দেবমাহাত্ম্য আছে। সন্ধেবেলায় সুখলতা বস্তির আর সব দেহকর্মীদের ডেকে মিটিং বসাল পাকুড়গাছের শান বাঁধানো মেঝেয়। চাপা গলায় জনে জনে বলল, পারুলকে কালরোগে ধরেছে। বিটি আমার আর বাঁচবে না। মানুষের জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে নিয়ে উপরওলার লেখা ছাড়া কারওর কোনও খবরদারি সাজে না। পারুল মরছে মরুক কিন্তু তোদের বাঁচতে হবে। ডাক্তারবাবু বলেছে, রোগটা ছোঁয়াচে। ওকে একটু আড়ালে রাখা দরকার। তা ছাড়া লোক জানাজানি হলে আমাদের ধান্দা চোপাট হবে। থানায় খবর গেলে পুলিশ আসবে। তখন আমাদের সবাইকে মাজায় দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে। খদ্দের যদি ভয়ে না আসে তা হলে আমরা কী খেয়ে বাঁচব? সুখলতার বয়স্ক কপালে চিন্তার সুস্পষ্ট ভাঁজ। চম্পা মুখরা।

সে এগিয়ে এল, গলা খাদে নামিয়ে বলল, পারুলের কঠিন অসুখ যখন সারবে না তখন ওকে আর বাঁচিয়ে রেখে কী লাভ; ওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হোক। আপদ চুকে গেলে আমরা শান্তিতে থাকতে পারব।

সুখলতার চোখ চকচকিয়ে উঠল পথ খুঁজে পেয়ে, কিন্তু দ্বিধা দ্বন্দ্বের জড়তায় সে পরক্ষণে কাহিল হয়ে গেল ; মিনমিনে স্বরে বলল, চম্পার কথাটা ভাববার মতো। হাত পচে গেলে হাত কেটে ফেলতে হয়। গাছ শুকিয়ে গেলে সে গাছের আর কী দাম। যত তাড়াতাড়ি তাকে পুড়িয়ে ফেলা যায় ততই মঙ্গল। কনক মাথার নিকি খোঁটা থামিয়ে চিৎকার করে উঠল প্রতিবাদে, না, না এমন ভাবা মহাপাপ। পারুলের অসুখটা আমাদের যে কারওর হতে পারত। চম্পারও হতে পারত। তখন কি আমরা বিষ খাইয়ে চম্পাকে মারতে পারতাম? পারতাম না। ও যখন মরতে বসেছে তখন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মেরে তাকে আর কষ্ট দেওয়া আমদের উচিত হবে না। এমনিতে আমরা পাপে ডুবে আছি আর পাপ করে তলিয়ে যেতে চাই না।

সুখলতা সব শুনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, তোরা যা ভাল বুঝিস কর। তবে পারুলের অসুখের কথা আর লোক জানাজানি করবি নে। ডাক্তারবাবু বলেছে, লোক জানাজানি হলে পাবলিকের হাতে আমাদের মরণ হতে পারে।

বস্তিতে লেংটা কার্তিকের পুজো করে চম্পারা। কনক, ঝর্না, মালতি, বিন্‌তিরা উপোসে আছে সারাদিন। লেংটা কার্তিক ঠাকুরের মূর্তি গড়িয়ে দিয়েছে চেনাজানা একজন কারিগর। মাত্র দু'হাত মাপের ঠাকুরটার দাম নিয়েছে দুশো টাকা। সুখলতা মুখ ভার করে বলল, পঞ্চাশ টাকার ঠাকুরটার দাম নিল দুশো টাকা। এ কেমন বিচার দেখ তো? আমাদের জন্য বাজারহাট সব আলাদা। আমাদের মেয়েগুলোকে দেখলে দোকানদাররা পানের দাম বাড়িয়ে দেয়। আমাদের শরীর-বেচা পয়সার কি কোনও মূল্য নেই? শালারা আসুক এ বার। ওদের আমি নুন-মরিচ গুঁড়া ঘষে দেব। দেখি ওরা কেমন করে আমাদের হাত থেকে বাঁচতে পারে।

কার্তিককে একটু চুমু খেল কনক। বিড়বিড় করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, হে ঠাকুর, খদ্দের যেন বরাবর আসে। তোমার মতো ভাল খদ্দের যেন বছরভর পাই। তুমি আমাদের দেখো। তুমি আমাদের রক্ষা করো। হাত কপালে ঠেকাতেই পারুলের দুঃস্থ, বিধ্বস্ত মুখটা মনে ভেসে উঠল কনকের, নিজেকে অপরাধী মনে হল তার। পারুলের জন্য সে ঠাকুরের কাছে গদগদ কণ্ঠে প্রার্থনা জানাল, হে কার্তিকঠাকুর, আমাদের পারুলটাকে আর কষ্ট দিয়ো না। ওকে যদি তোমার নেবার মন হয় তাহলে তোমার শ্রীচরণে ঠাঁই দাও। ওর কষ্ট যে ঠাকুর আর চোখে দেখা যাচ্ছে না। কনকের চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। পুরু কাজল ঘেঁটে গেল। একটা কলকে ফুল ঠাকুরের পায়ের কাছ থেকে তুলে নিয়ে সে আর দাঁড়াল না, এক ছুটে চলে এল নিজের ঘরে। ঘরের শেকল না খুলে চিৎকার

করে ডাকল, পারুল, পারুল, এই দেখ—আমি তোমার জন্য ঠাকুরের ফুল এনেছি। ঠাকুরের ফুল ছোঁয়ালে তুমি আবার আগের মতো ভাল হয়ে উঠবে।

রান্নাঘরের মেঝেটা হিম শীতল। পারুলের শুতে কষ্ট হয় বলে দড়ির খাটিয়াটা জোর করে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে কনক। খাটিয়াটা পাতার পর থেকে ঘরে আর এক ফোঁটা জায়গা নেই। পারুল কত নিষেধ করে ছিল খাটিয়া না ঢোকানোর জন্য, কনক তার কথা কানে তোলেনি। ছেলেমানুষের মতো আব্দার করে বলেছে, আমি সুস্থ মানুষ। মেঝেতে শুলে আমার বুকে ঠাণ্ডা বসবে না। অসুখের সময় তোমার একটু আরামে থাকা দরকার। তোমার যা খেতে মন চাইবে আমাকে বলো। আমি তোমার জন্য এনে দেব।

পারুলের নিষ্প্রভ চোখের তারায় হাজার বিস্ময়মাখা প্রশ্ন, কনক, তুই কি আগের জন্মে আমার বোন ছিলিস?

কনক তার হাত ধরে বলেছে, আগের জন্মে কেন গো, আমি তো তোমার এই জন্মের বোন। এক মায়ের পেটে না জন্মালে কি বোন হওয়া যায় না? তারপর পারুলের অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে তাকিয়ে সে চমকে ওঠে, কাতর হয়ে বলে, তুমি কেন কাঁদছ? তোমার কী হয়েছে যে কাঁদবে? চোখের জল মুছে নাও। মন খুলে হাসো। আমি তো তোমার পাশে আছি।

কনক হাটখোলা রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। বস্তিতে কোথাও বুঝি মাইক বাজছিল, 'পরদেশী, পরদেশী' গান হচ্ছিল, কনক সেই শব্দযন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ঘরের আবছা অন্ধকারের দিকে তাকাল। খাটিয়া থেকে ঝুলে পড়েছে পারুলের ঘাড় লটকান নিথর শরীর, এলো চুল হাওয়ায় নড়ছিল ঘরের মেঝে ন্যাতা দেওয়ার মতো। কনক ছুটে গেল, অস্ফুটে তার মুখ থেকে যন্ত্রণার শব্দ বেরিয়ে এল, পারুল, তোমার কী হয়েছে গো? কেন কথা বলছ না? দেরি হয়েছে বলে কি রাগ করলে? কনক হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে পারুলের মুখটা কোলের উপর তুলে নিতে গেলেই মুখের দু'পাশে জমে থাকা গ্যাঁজরাগুলো তার হাতের চেটোয় আটকে যায়। পারুলের চোখ আধবোজা, শক্ত ঠোঁট, রক্তহীন যন্ত্রণায় ভরা মুখে প্রাণের কোনও স্পন্দন নেই, হাত বাড়িয়ে সে কি জলের কলসিটা ধরতে চেয়েছিল? মাত্র বিঘত খানিক দূরে রাখা ছিল মাটির কলসি। তার মুখের উপর উপুড় করা গ্লাস। মরার আগে পারুলের তৃষ্ণা পেয়েছিল বড্ড। সে এক ফোঁটা জল পেল না। কেন মরতে কার্তিক ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল কনক। আত্মদহনে সে যখন বিধ্বস্ত হল তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল নিজের। চিৎকার করে ডুকরে উঠল. কে কোথায় আছে গো, ছুটে আস। দেখ, এখানে কী অঘটন ঘটে গেছে! পারুল আর নেই গো-ও-ও-ও!

তার কান্নাভরা আর্তনাদ হিন্দি গানের সুরেলা ধ্বনিকে পিষে দিয়ে পৌঁছে গেল সুখলতা মাসির কানে। বুকের কাপড় না সামলে পৃথুলা শরীর নিয়ে দৌড়ে এল সে, কী হয়েছে রে কনক?

—পারুল আর নেই গো মাসি!

—সে কী রে, এই তো আধাঘণ্টা আগে তাকে আমি দেখে গেলাম, এর মধ্যে সে চলে গেল! কাঁদতে গিয়েও কান্নার আবেগকে যথাযথ গলায় তুলতে না পেরে সে ভ্যালভেলিয়ে কনকের শোকে বিপর্যস্ত মুখের দিকে তাকাল, কিছু বলতে হয় এমন গোছের মুখের ভঙ্গিমা করে বলল, গিয়ে ভালই হয়েছে। বিটি আমার বড় কষ্ট পাচ্ছিল। ওর কষ্ট চোখে দেখা যায় না। সুখলতার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে এল, কোনওমতে ঢোক গিলে সে বলল, বিটি আমার মহা পুণ্যবতী ছিল না হলে কার্তিক পুজোর দিনে কেউ আবার মরে নাকি? কার ভাগ্যে এমন মরণ লেখা থাকে বল? কর্তা কার্তিক তাকে শ্রীচরণে ঠাঁই দিয়েছে। এ বড় পুণ্যের কথা, এ বড় ভাগ্যের কথা। তুই এখানে থাক কনক, আমি গিয়ে সবাইকে ডেকে আনি।

খবর রটে গেল বস্তি ছাড়িয়ে রেলবাজার পর্যন্ত। চম্পা পান চিবোতে চিবোতে এল অনেক পরে, ড্যামা ড্যামা চোখের গুলি ঘুরিয়ে বলল, হেই মা গো, এমন মরণ যেন কারওর না হয়! এ কী মরার মতো মরা গো। টুক করে পাকা ফলের মতো ঝরে পড়ল। কেউ মুখে এক ফোঁটা জলও দেবার সময় পেল না।

ঝর্না সেই তখন থেকেই কাঁদছিল, কনকের হাত ধরে বলল, পারুল আমাকে ছোট বোনের চাইতে ভালবাসত। জন্মাষ্টমীর মেলা থেকে সে আমার জন্য এক পাতা টিপ কিনে দিয়েছিল। আমার অসুখের সময় সে আমাকে দুধ-সাবু ফুটিয়ে খাইয়েছে গো। তার জন্য আমি যে কিছু করতে পারলাম না।

কথা-কান্না আর শোকালোচনায় অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল। সুখলতার মাথায় যেন বাজ পড়েছে এমন ভাব দেখিয়ে বলল, ঘরে মড়া রেখে তোরা আর ঢঙের কথা বসিল নে। সন্ধের আগে পারুলকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরে বাসি মড়া রেখে আরামে পান চিবুলে চলবে না। পুলিশ জানতে পারলে আবার টাকা চাইবে। আমার অত গচ্চা দেবার টাকা নেই। যা করার তাড়াতাড়ি কর।

এ সব মামলায় বংশীর নামটা সবার আগে মনে পড়ল সুখলতার। কনকের মুখের দিকে চেয়ে সে শুধোল, হ্যাঁ রে, বংশী ব্যাটা কোথায়? তাকে তো আজ সকাল থেকে দেখিনি।

ঝর্নার সঙ্গে বংশীর একটু লটঘট চলছে, সে ওর খোঁজখবর রাখে, কনক তার দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকাতেই অসন্তুষ্ট ঝর্না গা ঝাড়া দিয়ে বলল, সে শালার কি জাতের কোনও ঠিক আছে? কাল আমার কাছ থেকে বিশ টাকা জোর করে কেড়ে নিল। সেই যে টাকা নিয়ে ভেগেছে আর এদিকে মুখ দেখায়নি। দেখো গে যাও কোনও মদভাটিতে চুর হয়ে পড়ে আছে।

—কাজের সময় কোনও হারামির দেখা পাওয়া যায় না। সুখলতার মুখ ঝুঁকে পড়ল রাগে মাটির দিকে, আসুক ও, ওর কান দুটো কেটে আমি কুকুর

দিয়ে খাওয়াব। আমাকে চেনে না তো, আমি যার পেছনে লাগব তার চোদ্দো গুষ্টির পিণ্ডি চটকে ছেড়ে দেব।

—এখন রাগারাগি করার সময় নয় মাসি। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ নিতে হয়ে। কনক বুঝিয়ে বলল, তুমি চুপ করো মাসি। আমি যাচ্ছি ওকে ডেকে আনতে।

ঝর্না চোখের জল মুছে সঙ্গে সঙ্গে বলল, তোর যাওয়ার দরকার নেই, আমিই যাচ্ছি। তুই এখানে থাক। মাসিকে সামলে রাখ। আমি যাব আর আসব।

ঝর্না বংশীর দেখা পেল রেল ব্রিজের উল্টো দিকের মদ ভাটিটায়। রেলের স্লিপার কাঠের উপর বসে মদের নেশায় ঝিমোচ্ছিল সে। ঝর্না পেছন থেকে খামচে ধরল তার জামা, গায়ের শক্তিতে টেনে দাঁড় করাবার চেষ্টা করল, বংশী, মাসি তোকে খুঁজচে, চল।

—মাসি, কোন মা-সি? ঘোলাটে চোখে তাকাল বংশী। তারপর পিঠে খিঁচ লাগতেই বিরক্তিতে মুখ ভেংচে বলল, জামা ছেড়ে দে। তুই ব্যাটাছেলে হলে আমি জামা ধরার জন্য তোর মুখে একটা ঘুষি মারতাম। কিন্তু মেয়েছেলে বলে তোর সাতখুন মাফ। যা ভাগ।

—আমি ভাগতে আসিনি, তোকে নিতে এসেছি।

—কেন বে হঠাৎ আমার এত তোয়াজ?

—পারুল টসকে গেচে, মাসি তোকে ডাকচে।

চোখ মাথায় তুলে মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ বের করল বংশী, মাগীটা মরেচে! বেশ ভাল হয়েচে। বেঁচে থাকতে ও শালী আমাকে একটা ফুটো কড়ি দিয়ে পোছেনি। একদিন আদর করে হাত ধরেছিলাম বলে ঠাস করে একটা চড় মারল। মাইরি বলচি, বড্ড লেগেছিল সেদিন। গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গিয়েছিল।

—সে সব কথা ছাড় বংশী। যে মরে গিয়েচে তাকে নিয়ে পাঁকঘাটা ঠিক নয়। এখন মাসি তোকে ডাকচে শ্মশানে যাবার জন্য। ঝর্না বিশেষ কায়দায় বংশীর ঘাড়ের উপর হাত রাখল।

বংশী ঝর্নাকে ঠেলা মেরে ছিটকে গেল দূরে, তার যেন নেশা ছুটে গিয়েছে এমন চোখ-মুখের ভাব করে বলল, উরি বাস, আমি সেখানে যাব না। পারুলের রোগটা খতরনাক। ওকে ছুঁলে আমিও যে মরব। সব জেনে-শুনে বাপের দেওয়া প্রাণটা আমি হারাতে পারব না।

—তা হলে মড়া কে ঘাটে নিয়ে যাবে? ঝর্নার মুখে কালি ছিটিয়ে গেল, আমাদের মড়া যে তুই ছাড়া আর কেউ ছোঁবে না?

—কেন ছোঁবে না? ভাত ছিটোলে কাকের অভাব হবে না। স্টেশনের কুলিগুলোকে ধর। পয়সা দিলে ওরা বডি ঘাট অব্দি পৌঁছে দেবে।

—তুই যাবি না? ঝর্নার চোখে অভিমান ফুটে উঠল, আমি মরলে তুই কি যেতিস না?

—তোর ওই রোগ হলে কেন যাব? আমি কি অতই বোকা?

—বেঁচে থাকতে তা হলে কেন দরজায় টোকা মারিস? তোর মতন ব্যাটাছেলেগুলো হল কুত্তার জাত। আমি তোদের মুখে ছেপ ফেলি। বংশীর কাঁধের উপর থেকে হাত উঠিয়ে নিয়ে ঝর্না ফুঁসতে ফুঁসতে চলে গেল।

শুধু ঝর্না নয়, সুখলতা মাসিও হেরে গেল লোক যোগাড় করতে গিয়ে। কী করে সবাই যেন জেনে গিয়েছিল পারুলের অসুখের সংবাদ। অসুখটা মোটেও ভাল নয়, ছোঁয়াচে এসব খবর রটে গিয়েছিল বাজারে। কপালে হাত দিয়ে সুখলতা মাসি দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে থাকল। কনক তার জন্য লাল চা বানিয়ে নিয়ে এল। চম্পার মাথায় বেশি চিন্তা থাকলে সিগারেটে টান দেয় ঘন ঘন। গাঢ় ধোঁয়া ছেড়ে বলল, রাতটা পারুলকে খাটিয়ায় শুয়ে থাকতে দাও। এখন অসময়ে ওকে নিয়ে আমরা কোথায় যাব?

—মড়া যদি পচে যায়? সুখলতাকে খুব বিধ্বস্ত দেখাল, ঘরে মড়া থাকলে ধান্দা চোপাট হয়ে যাবে। কার্তিক পুজোর দিনে ঘরে নাগর না এলে পুজো করার কোনও মানে হয় নাকি? সারা বছর তা হলে বরাত খারাপ যাবে। চম্পা ঠোঁট উল্টে তাকাল, মোক্ষম একটা গালি ছুঁড়ে দিয়ে বলল, পারুলটা আর মরার দিনক্ষণ পেল না! ও তো মরল, সেই সঙ্গে আমাদেরও মারল।

—কেন এ কথা বলচিস? কনক মৃদু গলায় প্রতিবাদ জানাতে গেলে, চম্পা তাকে খেয়ে নেবার মতো চোখ করে তাকাল, রোজ রোজ কি কার্তিক পুজো হবে নাকি? আজ রেল লাইনের ধারে গেলে খদ্দের জুটত মেলা। কিছু না হোক শ'টাকা কামিয়ে নিতে পারতাম। পারুলের জন্য সব ভেস্তে গেল।

সুখলতা ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল, তোরা ঝগড়া করবি না থামবি? বলিহারি তোদের গলা। তোদের বাপ-ঠাকুরদা কি কাক ছিল?

কনক আর চম্পা গুটিয়ে গেল। পরিবেশ শান্ত হতেই সুখলতা মাথার উকুন খুঁটে বুড়ো আঙুলের নখে চিপে মেরে বলল, তোরা আয় দেখি আমার সাথে। পারুলকে ঘরের বাইরে বের করে দিই। ঘরে থাকলে গুমসা গরমে ওর গা-গতর পচে যাবে। দুর্গন্ধ ছাড়বে। আমার তো আতর কেনার পয়সা নেই যে বোতল বোতল কিনে ওর পচা শরীরে ছিটোব।

—আতর না থাকলেও চলবে মাসি। তুমি তো মদ খাও। মদ ছিটিয়ে দাও পারুলের গায়ে। বদ ঘেরান পালিয়ে যাবে। চম্পা বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, খোলা আকাশের নীচে রাখলে পারুল পচবে না। রাতে হিম ঝরবে। সারারাত হিম খেলে বরফের আর কী দরকার?

ধরাধরি করে পারুলকে বাইরে বের করে আনল ওরা। কনকের ছোট্ট উঠোনটাতে সারারাত শুয়ে থাকল পারুল। হিম ঝরে পড়ল তার বুকের উপর। কনকের চোখে ঘুম এল না। সে তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল নিশ্চুপ। বেঁচে থাকতে পারুলের কেউ অমর্যাদা করেনি। সবাই যৌবনের সময়

একরাত ওকে কাছে পাবার জন্য হুড়োহুড়ি করত! সুখলতা মাসি তার ঘাড়ে গর্দানে এমনকী বুকের খাঁজে, নাভির কোলে পাউডার ঢেলে দিয়ে বলত, তুই আমার গোলাপ, তুই আমার ফুলপরী। তোর সেবাযত্ন করলে আমার কোনওদিন কোনও কিছুর অভাব হবে না। তুই নদী। আমি তোর শরীরের কামাইয়ের জল খেয়ে বেঁচে থাকব। কোথায় হারিয়ে গেল সে সব গালভরা কথা! এখন পারুল যেন সমস্যার পাহাড় সবার কাছে; সবাই তাকে ছুঁতে ভয় পাচ্ছে। প্রত্যেকের মৃত্যুকে ভীষণ ভয়।

ভোরের প্রথম আলো কনকের মুখে এসে পড়েছে। রাত জাগা চোখ ডালে নিয়ে কনক দেখল শাড়ি নাভির নীচে গুঁজে হেঁটে আসছে চম্পা। ওর গা-গতরে ধকলের চিহ্ন। চম্পার পেছন পেছন এল ঝর্না। সহবাসের চিহ্ন ওর সারা শরীরে ছড়ানো। বংশী কাল রাতে ওর ঘরেই পড়ে ছিল। ঝর্নার একটু দয়া পাবার জন্য সে পায়ে মুখ ঘষে কাঁদল। ঝর্না তাকে পিপাসার জল দিল। সুখলতা এল সবার পরে। তার চর্বি বোঝাই মাদী ব্যাঙ শরীরটায় এখন কোনও নারীসুলভ কমনীয়তা লুকানো নেই। সে এসে ধপ করে বসল একটা ছোট মাচিয়ায়। পারুলের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, গত রাত তো সবার মাঠে মারা গেল। আজকের রাত যাতে নষ্ট না হয় সেই চেষ্টা কর। সবার আগে পারুলকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া দরকার। অথচ ওকে কাঁধ দেওয়ার কেউ নেই। এ শহরের সব লোক হিজড়ে হয়ে গিয়েছে। আমি আর হিজড়েদের কাছে গিয়ে কাঁদতে পারব না।

চম্পা চিরিক করে পানের পিক ফেলে বলল, তা হলে কী করা যায় মাসি এখন?

—কিছু করার দরকার নেই! চল, পারুলের পা দুটো ধরে রেল লাইনের ধারে রেখে আসি। ওকে শ্যাল-কুকুরে ছিঁড়ে খাক। সুখলতার গলা ভারী হয়ে এল, সারাজীবন জ্বলল মেয়েটা। মরার পরেও ভগবান তার কপালে সুখ লিখল না। এ যে কেমন ভগবানের বিচার আমি বুঝি না! বলি, কোন মানুষটার না অসুখ হয়? অসুখ হলে কি মানুষকে অমন ঘেন্না করতে হয়? ছিঃ ছিঃ, এ কী সমাজে বাস করছি আমরা! এ কেমন দেশ গো যে দেশে চারটে মরদ পাওয়া যায় না একটা মেয়েকে ঘাটে নিয়ে যাবার জন্য? অথচ বেঁচে থাকতে ওরাই এই মেয়েটার পেছনে ভাদুরে কুকুরের মতো ঘুরঘুর করত। ছ্যা-ছ্যা, আমার যে ছেপ ফেলতেও মন করছে না।

কনক কী বুঝে উঠে গেল সুখলতার কাছে, চোখে চোখ রেখে শান্ত নিস্তেজ স্বরে বলল, মাসি, আমার একটা কথা শোন তো বলি, যে দেশে মরদ নেই সে দেশের মেয়েরা কেন পিছিয়ে থাকবে। আমরা যখন দেহ বেচে খাই তখন একটা দেহ বয়ে নিয়ে যেতে দোষ কোথায়?

—তোর কথা আমি বুঝতে পারলাম না? সুখলতা খুব অসহায় চোখে তাকাল। কনক তার মুখোমুখি বসে বলল, পারুলের বাসি-দেহ আমরাই শ্মশানে

নিয়ে যাব। কেন মূর্খের মতো ওকে আমরা রেল লাইনের ধারে ফেলে দেব? তাতে লোক হাসবে। বলবে—দেখ, মরার পরেও বেশ্যাদের মরণ দেখ। ওদের বেঁচেও সুখ নেই, মরেও সুখ নেই। তুমি বলো মাসি—আমাদের কীসের অসুখ? মানুষ তো অসুখ সারাতে আমাদের কাছে আসে। মানুষের রোগজ্বালা আমরা রক্তে পুরে নিই। মানুষ মুক্তি পায়, আমরা তবু মুক্তি পাই না। যারা সবাইকে মুক্তি দেয়, তাদের আত্মা কেন মুক্তি পাবে না! চলো মাসি, পারুলের খাটিয়ায় আমরা কাঁধ লাগাই। রেল বাজারের লোকগুলো দেখুক—আমরাও কারওর চাইতে কম যাই না।

সুখলতা মাসি কনকের মাথায় হাত রাখল, তোর কথা শুনে শরীরে আমার প্রাণ এলো। সত্যিই তো আমরা কেন ওই ভেড়ুয়াগুলোর কাছে ছোট হতে যাব। ওরা তো ছোট হয়ে মাথা হেঁট করে আমাদের কাছে আসে। আমাদের গতর না চাটলে ওদের খসখসে জিভের ধার কমে না। যারা আগে থেকেই মরে আছে, তাদের কাছে আমরা কেন মড়া কাঁধ দেবার কথা বলব? এতে আমার বিটির আত্মা সুখী হবে না। সারাজীবন যে কেঁদেছে মরার সময় চল আমরা তাকে একটু সুখ দিই।

শ্মশান যাত্রার আয়োজন সব শেষ। সুখলতা মাসির হাতে খুচরো পয়সা আর খই! কনক চম্পা বিনতি আর ঝর্না গিয়ে কাঁধ লাগাল খাটিয়ায়, পারুলের গলায় দুলছে রজনীগন্ধার মালা। বুকের উপর কুঁচো ফুলের ছড়াছড়ি। পারুল ফুলের পোশাক পরে চলেছে ফুলের দেশে।

চম্পা গলা ফাড়িয়ে বলল, বল হরি, হরি বোল! বল হরি হরি বোল! সকালের রোদ-হাওয়ায় মিশে গেল তার গলা। কনক বিনতি আর ঝর্না চেঁচিয়ে উঠল, বল হরি, হরি বোল!

খুচরো পয়সা আর খই ছিটিয়ে দিল সুখলতা। সাদা খই হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল কিছু দূরে। অবাক বিস্ময়ে রাস্তার দু-পাশের লোক দেখল, একটা শবদেহ নিয়ে রাস্তা কেটে এগিয়ে চলেছে রাস্তার মেয়েরা। ওদের চোখে-মুখে হতাশা কিংবা পরাজয়ের কোনও চিহ্ন নেই বরং ওরা হেমন্তের ভোরে ফোটা ফুলের চেয়েও স্বচ্ছ, তরতাজা। ফুলের বিছানায় ফুলের মতো মেয়েটি ফুলপরী সেজে ফুলের দেশে পাড়ি দেয়।

# অমৃতের স্বাদ

সকালে যাওয়ার সময় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে ধুলো ভরা পথে ফুটে উঠেছিল জলবসন্তের দাগ, নয়নতারা সেই দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে গিয়েছিল কিছু সময়। আয়নায় রোজ সে তার মুখখানা দেখে, চেনা মুখটায় বসন্তের দাগগুলো ধুলোর দাগের সাথে মিলে যায় হুবহু। যেন ধুলো পথে সে শুয়ে আছে আকাশের দিকে মুখ করে, ঘামে চকচক করছে মুখখানা, রোদ এসে পেছল করে দিয়েছে এবড়ো-খেবড়ো মুখশ্রী। তার মা মেনকা বলে, তোর মুখের দাগগুলো আর মেলাবে না, ওগুলো তোর সঙ্গে যাবে।

জন্মদাগ নয়, মাত্র তের বছর বয়সের ক্ষত চিহ্ন, সে এখন আঠার ছাড়িয়ে উনিশে তবু দাগগুলো মিলাল না, যত দিন যাচ্ছে গুটি গুটি দাগগুলো চামড়া ফুটো করে ঢুকে যাচ্ছে আরো গভীরে। এত সুন্দর মুখখানা প্রকৃতির অভিশাপে শিল পড়া কচুপাতার মত বিশ্রী হয়ে গিয়েছে, প্রথম-প্রথম নিজের মুখ দেখে ভয়ে কুঁকড়ে উঠত সে। দুধের সর ঘষত মুখে, ডাবের জল মাখত ক্রীম মাখার যত্ন নিয়ে। তার দুঃশ্চিন্তা দেখে মেনকা বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলেছিল, ভগবানের মার দুনিয়ার বার। যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে। ওসব নিয়ে মন খারাপ করবি নে। ভগবানের যা ইচ্ছে ছিল তাই হয়েছে। তার যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে ভাল ঘরে তোর বিয়ে হবে। উপরওলার দয়াতে জলে পাথর ভাসে, চিতায় চাপান মড়া মানুষও জ্যান্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসে। মেনকার কথাগুলোয় বুকে বল ফিরে পেত নয়নতারা, নিজের বিশ্রী মুখখানার দিকে তাকিয়ে সে নানাভাবে ও ভঙ্গিমায় দেখতে থাকত নিজেকে। বসন্ত অনেকেরই হয়, কিন্তু তার মত মারাত্মক বুঝি কারোরই হয় না। আয়নায় নিজেকে দেখতে-দেখতে নয়নতারা ভাবত, তার মুখটার সবটাই কি অসুন্দর, হতকুৎসিত। অসুন্দরের মাঝখানে সে খুঁজে বেড়াতে নিজের সামান্য সুন্দরতাকে। তার চোখ দুটো ভারি চমৎকার। পটলচেরা, পাখি ওড়া চোখ বলতে যা বোঝায় তা হলো তার চোখ দুটো। ধনুকের মত ভ্রু, ভ্রুর নীচে টলটলে ভাসমান পদ্মের পাপড়ির চেয়েও সুন্দর চোখের বাহার। চোখের জমি নয়নতারা ফুলের চেয়েও সাদা, যে চোখে পাপ নেই সেই চোখ তো বকের পালকের চেয়েও নয়নলোভন সাদা। বাড়ন্ত ভরন্ত শরীরের এই চোখ দুটোই তার গর্ব করার মত। উপরওলা সব কেড়ে নিলেও এই চোখ দুটো কেড়ে নেয়নি, রোগের আগে চোখ দুটো যেমন ছিল এখনও সেই চোখে সমান আকর্ষণ। কুৎসিত হলেও গ্রামের ছেলেগুলো তার দিকে তাকায়, তারা ওর মুখের দিকে না তাকিয়ে সরাসরি বুকের দিকে তাকায়। যারা একটু ভদ্রগোছের তারা তো মুখের উপর বলে দেয়, মাইরি দেখ কেমন তাকায়

নয়নতারা—ওর চোখ দুটো যেন জলে ভাসা ঠাকুরের ফুল। কেউ বলে চোখের মণি দুটো জামের চেয়েও কুচকুচে কালো। এত ধারাল চোখের দৃষ্টি কম নজরে পড়ে। যাওয়া আসার পথে অনেক কিছুই কানে আসে নয়নতারার, গ্রামের আর দশ পাঁচটা মেয়ের মত তার ঘরে বসে থাকলে চলবে না, পরিমল মারা যাবার পর থেকে তাকে তো হাটে-বাজারে যেতে হয় যখন-তখন। মেনকা সাধারণত ডাগর মেয়েকে বাজারে পাঠাতে চায় না, কিন্তু এমন অনেক পরিস্থিতি আসে যখন মেয়েকে ঘরের বাইরে না পাঠালে তার চলে না। পরিমল বেঁচে থাকলে নয়নতারার উপর এত চাপ পড়ত না, সে মেয়ে বলতে পাগল ছিল, গর্ব করে বলত, আমার তারা ইস্কুলে পড়বে, ওকে আমি নার্স দিদিমণি বানাব। আমি চাষা বলেই কি মেয়ে আমার চাষা হবে নাকি? আমার মেয়ে গাঁয়ের দশটা মেয়ের চাইতে ঢের ভাল হবে।

পরিমলের স্বপ্ন ভোরে ফোটা ফুলের মত চটজলদি ঝরে গেল, চার ক্লাস অব্দি পড়েও নয়নতারা বড় ইস্কুলের মুখ দেখতে পেল না। যার মাথার উপরে ছায়া নেই, তার গায়ে রোদ-ঝড়-জল তো লাগবেই। মেনকা থান কাপড় গায়ে জড়িয়ে ফাঁকা সিঁথির চেয়েও বেদনাময় মুখ করে বলল, তারারে, তোর আর পড়া লিখা শিখে কাজ নেই, যার বাপ নেই, তাকে যে দেখার কেউ নেই। আমি একা মানুষ, আমি আর কত দিকে সামলাব। মেনকার ইচ্ছে ছিল নয়নতারা চোখে লাগার মত হলেই পাত্র খুঁজে তার সিঁথি সিঁদুরে রাঙিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। কেন না তার মেয়ে ডানা কাটা পরী না হলেও দেখতে শুনতে মন্দ নয়। কাচবরণ গায়ের রঙ বয়স বাড়লে আরো খোলতাই হবে, মুঠো করে ধরা যাবে না চুলের ডগা, যৌবন লালিত্যে ভরপুর হয়ে উঠবে ছাইগাদার মনকচু গাছের মত। কিন্তু মন ভাবল এক আর হল এক। সর্বনাশী কালরোগ আকাশের চেয়েও সুন্দর মুখশ্রীতে ছিটিয়ে দিল গুঁড়ো গুঁড়ো তীক্ষ্ণ সুচালো কালমেঘের টুকরো, নয়নতারার সব কিছু যেন হারিয়ে গেল, শুধু বেঁচে থাকল হরিণী কালো চোখের মায়া। প্রথম প্রথম মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে আঁতকে উঠত মেনকা, ঠাকুরের কাছে মানত করে বলত, মা শীতলাবুড়ি, তুমি আমার তারাকে আকাশের তারার চেয়েও উজ্বল করে দাও, যাতে আমি ওকে ভাল ঘরের সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারি।

যা হবার নয়, তা বুঝি কোনদিনও হয় না। দু'বছরে নয়নতারাকে দেখে গিয়েছে দশ জন, সবাই ভরপেট খেয়ে ঢেকুর তুলে বলেছে, এখন যাই, পরে চিঠি লিখে জানাব। সুখবর বয়ে নিয়ে আসা চিঠি মেনকার জীবনে কোনদিনও আসেনি। আশাহত মেনকার বুক ভেঙে গিয়েছে দুঃখে, দুঃখের পাথরকে সে লুকিয়ে রেখেছে বুকের ভেতর, সান্ত্বনার জল সিঞ্চনে সে আবার তরতাজা করে তুলতে চেয়েছে থেতলে যাওয়া আশার চারাগাছটাকে।

মেনকার সংসারে অভাব-অনটন লেগেই অছে। জমির রোগ প্রতি বছর

বাড়তেই থাকে, তাই খরা-বন্যা-মড়ক ছাপিয়ে ফসল ওঠে না খামারে। নয়নতারাকে বাজারে কাঁচা আনাজ নিয়ে যেতে হয় বিক্রি করতে, সেই পয়সা নিয়ে চাল-তেল-নুন কিনে আনে সে। এই ভাবেই চলছিল সংসার, হঠাৎ সংসার দেবে গেল দুর্ভাগ্যের কাদায়। মেনকা রোগ-জ্বালায় বিছানা নিয়েছে। গ্রামের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বলল, মনে হচ্ছে রোগ পুরিয়াতে সারবে না, ছুঁচ ফোঁড়াতে হবে তোর মাকে। এখনও সময় আছে, একে তুই বাজারের বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যা। দু-চারটে ছুঁচ পড়লে তোর মা আবার খাড়া হয়ে যাবে।

বাজারের ডাক্তারের খাই অনেক, নাড়ি ধরলেই টাকার গাড়ি ছোটায়। নয়নতারার মুখ শুকিয়ে আমচুর হয়ে গেল টাকার চিন্তায়। ফলে আনাজ নিয়ে তার হাটে যাওয়া বেড়েছে। আজও তার মাথায় আছে লাউয়ের ঝুড়ি, মোট সাতখানা কচি লাউ কিছু না হলেও মুখ মাঙা দামে বিকুবে। গ্রাম ছাড়িয়ে এলেই ধুলোয় ভরা পথ ঘাট, পথের দু-পাশে বিস্তীর্ণ ধান মাঠ, দু'একটা বনবাবলা আর ঝাঁকড়া মাথার খেজুরগাছ পাহারাদারের ঢঙে দাঁড়িয়ে। একা হাঁটলে ছমছম করে গা, ভয়ে কুঁকড়ে যায় নয়নতারার শরীরের শিরা-উপশিরা। কালও ছকা তাকে কালভার্টটার কাছে ধরেছিল, গায়ে পড়ে হ্যাংলা গলায় বলেছিল, হাটে যাচ্ছিস? রঙিন চুড়ি কিনে হাতে পরিস, দেখতে খাসা লাগবে। কথাগুলো বলেই সে দাঁত বের করে হেসেছিল, ফেরার পথে সেই একই রকম হেসে সে বলেছিল, একটু দাঁড়িয়ে যা, তোর সাথে দুটো কথা আছে।

—কি কথা? ভয়ে ভয়ে শুধিয়েছিল নয়নতারা।

ছকা বলেছিল, তোর যা চেহারার ধরন, মুখের ছিরি, তোকে কেউ বিয়ে করবে না। যৌবন পালিয়ে গেলে তুই কি নিয়ে বাঁচবি? আমি তোকে বাঁচাতে চাই, এই নে দশ টাকা, তোর অভাবের সংসারে লাগবে।

—তোমার টাকা আমি নেব না। কেন, কিসের জন্য নেব? মুখ কঠিন করে কথাগুলো বলেছিল নয়নতারা। ছকা তার গজ দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলেছিল, টাকা আমি এমনি দেব না। আমি তোকে ভালবাসি, তুই আমাকে ভালবাস। ব্যস, মিটে গেল কথা।

জীবনে প্রথম ভালবাসার কথা শুনে কুলকুলিয়ে ঘেমে গিয়েছিল নয়নতারা। ছকাকে চেনে না, জানে না এ গাঁয়ে আর কেউ নেই। ছকা হল চরিত্রহীন, লম্পট। মেয়েদের ধোঁকা দেওয়া তার স্বভাব। এ ছাড়াও তার বড়গুণ হল সে চোর। থানা থেকে প্রায় রাতেই পুলিশ আসে তাদের ঘরে। আশে পাশের কোন গ্রামে চুরি হলে থানার দারোগা মারতে-মারতে ধরে নিয়ে যায় তাকে। জেলের ভাত খাইয়ে তারপর আবার ছেড়ে দেয়। এহেন দাগী চোর ছকা হবে তার প্রেমিক! ঘেন্নায় গা গুলিয়ে উঠেছিল নয়নতারার। মুখে উঠে এসেছিল থুতু। চোখ-মুখ কঠিন করে ধুলো পথে থুতু ফেলে সে বলেছিল, কুঁজোরও মন হয়

চিৎ হয়ে শুতে? যার হাত-পা নেই সে আবার সাঁতার কাটতে চায় নদীতে? ছ্যা. পথ ছাড়। আমাকে যেতে দাও।

—যাবি, যাবার জন্য তো পথ পড়ে আছে। ছকা সারস পাখির মত ডানা মেলে আটকে দিয়েছিল তার পথ। জোর করে এগোতে গেলেই ছকা তার হাত ধরে কাতর গলায় বলেছিল, যাচা অন্ন ছাড়তে নেই। আমি তোর প্রেমে পাগল, নয়নতারা।

—তুমি চোর, তোমাকে আমি ঘৃণা করি।

—তুই আমাকে ঘৃণা করলেও, আমি তোকে ভালবাসি।

—তোমার ভালবাসায় আমি থুতু ফেলি।

—তোর থুতু আমার কাছে চন্দন। শুধু একবার হ্যাঁ কর, তারপর দেখ আমি কেমন পাল্টে যাই। হাতটা শক্তভাবে চেপে ধরে ছকা চাতক চোখে তাকিয়ে ছিল। নয়নতারা রাগে-ঘেন্নায় পথের ধুলো তুলে নিয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিল ছকার চোখে, রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সে বলেছিল, আবার যদি পেছনে লাগ তাহলে আমি তোমার মুখে পচা গোবর লেপে দেব।

—গোবর লেপে দিলেও আমি তোকে ভালবাসব। চোখ রগড়ে কোনমতে তাকাবার চেষ্টা করেছিল ছকা, তুই লায়লা, আমি তোর মজনু। তুই ফুল, আমি ভ্রমর। তুই চাঁদ, আমি হলাম আকাশ। তুই আমাকে কোনদিনও হারাতে পারবি নে। তোকে আমি যে করেই হোক পাবই, পাব।

ছকার জেদ, আবেগ, ভালবাসা বেড়ে গিয়েছিল দিনকে দিন। সে হাঁ-করে নয়নতারার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। ইশারায় কথা বলতে চাইত। ছকার জ্বালায় নয়নতারার ঘরের বাইরে বেরনোর উপায় ছিল না। পুকুরে স্নান করতে গেলেও ছকার ছায়া মাঝ পুকুরের জলে নড়ে উঠত, কখনও বা সে ডুব সাঁতার দিয়ে ছুঁয়ে দিত নয়নতারার ভেজা শরীর। ছুঁয়ে দিয়েই আবার ডুব সাঁতার কেটে পালিয়ে যেত ভিন্ পাড়ে। নিজেকে বাঁচানোর জন্য নয়নতারা গ্রামপ্রধানের পা ধরে কেঁদে উঠল, কাকা, তোমরা আমাকে বাঁচাও। পুব পাড়ার ছকার জন্য আমি পথে-ঘাটে চলতে পারি নে, ও সদা সর্বদা আমার পেছনে লেগে আছে। ওর জন্য আমি হাটে যেতে পারি নে, পুকুরে স্নান করতে পারি নে। ও আমার গায়ে কাদা ছুঁড়ে মারে। আমাকে টাকা দিয়ে কিনতে চায়।

তেঁতুলতলায় বিচার সভায় ছকা মাথা হেঁট করে দাঁড়াল। গ্রামপ্রধানের বিচারে তার জরিমানা হল বিশ ঘা বেত খাওয়া আর বিশ হাত নাক খৎ দেওয়া। শুকনো মাটিতে নাক খৎ দিতে গিয়ে ছকার নাকের চামড়া ছড়ে গেল। ফিরে যাওয়ার সময় সে দাঁতে দাঁতে ঘষে বলল, আমি হারব না। আমি জিতব। নয়নতারাকে আমি ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলব।

গ্রামের মানুষ ছকাকে ক্ষমা করল না, তারা মারতে মারতে ওকে তুলে দিল থানার দারোগাবাবুর হাতে। দারোগাবাবু ছকাকে জেলের ঘানি টানিয়ে ছাড়ল।

জেল থেকে এসেও ছকার কোন পরিবর্তন হল না। নয়নতারাকে একদিন একা পেয়ে সে বলল, তোর যা রূপের ছিরি তোকে আমি ছাড়া আর কেউ বিয়ে করবে না। তারারে, তুই আমার কথায় রাজি হয়ে যা। আমি তোকে রাজরানীর সুখ দেব।

—তোমার মুখে আমি ছেপ ফেলি। নয়নতারার চোখ থেকে আগুন ঝরে পড়ল, আমি চোরের হাত ধরব না, তাতে যদি মরতে হয় মরব।

—এই তোর শেষ কথা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ এই আমার শেষ কথা। ছকার ছায়া না মাড়িয়ে সদম্ভে চলে গিয়েছিল নয়নতারা। ছকা উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, ঠিক আছে যা। তবে তোর ভাল হবে না। আমি বেঁচে থাকতে তুই শান্তিতে বাঁচতে পারবি নে।

অবশেষে নয়নতারার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল পাশের গ্রামে। ছেলে চাষী। জনমজুর খাটে। তার বিঘে খানিক ধানজমি আছে। সামনের মাঘ মাসে নয়নতারার বিয়ে। ছকা ফুঁসছিল রাগে। বিড়িতে ঘন ঘন দম মেরে সে ভাবছিল কী ভাবে নয়নতারার বিয়েটা ভেঙে দেওয়া যায়। পাত্রের ঘর অব্দি গিয়েছে সে। পাত্রকে আড়ালে ডেকে বলেছে, নয়নতারাকে বিয়ে করো না, ওর সাথে আমার লটর-পটর আছে। বিয়ে করলে পরে তোমাকে পস্তাতে হবে। তবু বিয়ে ভাঙল না নয়নতারার। পাত্রপক্ষ বার বার এসে মেনকাকে সাবধান করে দিয়ে গেল। ভয় শুকনো গলায় মেনকা বলল, তারারে, তোর আর হাটে গিয়ে কাজ নেই। আর ক'মাস পরেই তো তুই শ্বশুরঘরে চলে যাবি। এখন তুই ঘরে থাক মা। বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাবার পর মেয়েদের যে বাইরে বেরোন মানা।

—হাটে না গেলে সংসার চলবে কীভাবে? আমার তো বাবা নেই, মাথার উপরে দাদা নেই। সব কিছুই তো আমাকে করতে হবে।

বিয়ের ফুল ফুটতে আর বেশি দেরি নেই। হাট থেকে সে একটা স্নো কিনে এনেছে মুখে মাখার জন্য। যখনই স্নো'টা সে মাখতে যায় তখনই ছকার কথা তার মনে পড়ে। অমনি থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে হাত। ঠোঁট শক্ত হয়ে ওঠে। চোখের জমিতে জড়ো হয় রক্ত। তার ঠোঁট পিছলে বেরিয়ে আসে, শয়তান, জানোয়ার!

বেশ কয় দিন হল ছকাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে পুলিশে। ফাঁকা মাঠ দিয়ে আসা যাওয়া করতে নয়নতারার ভয় করে না এখন। যে তার পিছনে ছিনেজোঁকের মত ঘুরঘুর করত তার মুখে নুন ঢেলে দিয়েছে গ্রামের মানুষ. থানার পুলিশ। নয়নতারা শুনেছে, ছকার এখন হাঁটা চলার ক্ষমতা নেই। পুলিশের রুলের বাড়ি খেয়ে কনকনানি বেড়েছে মাজার। ভয়ে সে আর গ্রামের পথ দিয়ে হাঁটে না।

পথের কাঁটা সরে যেতেই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে নয়নতারা। মাঠ পেরিয়ে হাটে যেতে তার এখন আর ভয় লাগে না। সে মনে মনে বেশ খুশি।

সাঁঝ লাগার মুখে হাট থেকে ঘরে ফিরছিল নয়নতারা। আজ সে লাউ বেচে মায়ের জন্য দু'খানা আপেল কিনেছে। সাবু ছিল না ঘরে, সাবু কিনেছে এক পোয়া। জনপথ পেরিয়ে মেঠোপথ ধরতে তারা ফুটল আকাশে। হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ করে তার বাবার কথা মনে পড়ল। বাবা বেঁচে থাকলে তাকে এমন জীবনযাত্রার মুখোমুখি হতে হত না। একটা শরীর কাঁপান দীর্ঘশ্বাস নয়নতারার বুকে ছুঁয়ে নেমে এল নাভি বরাবর। জোরে জোরে পা চালাল সে। ফাঁকা মাঠটা পেরিয়ে গেলেই গ্রামের সীমানা ভেসে উঠবে। আলপথ ধরে সে খুব জোরে জোরে হাঁটছিল। হাওয়ায় উড়ল তার আঁচল। গ্রামে তার বয়সি মেয়েদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে কবে। ওরা পূজা পার্বণে ঘরে আসলে দেখা হয়। তখন কষ্টে বুক ভেঙে যেতে থাকে। এই কষ্টের কথা কাউকে সে কোনদিন মুখ ফুটিয়ে বলেনি। কেন বলবে? দেখতে খারাপ বলেই কি তার কোন মান-সম্মান বোধ নেই? পা ছাপিয়ে পথের ধুলো শাড়ির সূতোয় গিয়ে মিশেছে। ধুলোয় সিরসিরিয়ে ওঠে তার গা-গতর। দু'চোখে ছড়িয়ে পড়ে অদ্ভুত একটা কাঁপুনী। এই কাঁপুনীটা অনেকটা ডুব সাঁতার দিয়ে হঠাৎ ছুঁয়ে যাওয়া ভীতু ছকার আঙুলের কাঁপুনীর মত।

নয়নতারার পা আটকে যায় পথের ধুলোয়. ভয়ে ভয়ে সে পিছন ফিরে তাকায়, আবছা আঁধারে সে কাউকে দেখতে পায় না. শুধু স্পর্শানুভূতির ঢেউটা শরীর জুড়ে খেলা করে। কালভার্টটার কাছে এসে নয়নতারা আকাশের দিকে মুখ করে তাকাল। অজস্র তারায় ভরেছিল সন্ধের আকাশ। হাওয়া থেমে যাওয়া গুমোট একটা পরিবেশ। নয়নতারা হাঁপিয়ে উঠেছিল একা-একা। এ সময় কারোর সঙ্গ পেলে কথায় কথায় পথ ফুরিয়ে সে গ্রামের ভেতর ঢুকে যেতে পারত অনায়াসে। পিছন ফিরে তাকাতেই দূরে ছায়ার মত কিছু একটা দেখতে পেল সে। এ মাঠে বদ মানুষের আনাগোনা বাড়ে সন্ধের পরে। দূরে, বাবলা গাছটার নীচে কে দাঁড়িয়ে আছে অমন করে? যে-ই দাঁড়িয়ে থাকুক না কেন এতে তার কোনো আগ্রহ নেই। বুকে দম পুরে নিয়ে সে যখন সামনের দিকে এগোতে যাবে তখনই ছুটতে-ছুটতে তার নিঃশ্বাসের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ছকা। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, আমি তোর জন্য সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

—কেন? মুখ বেঁকিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিল নয়নতারা।

ছকা মলিন হেসে বলল. তোর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে শুনলাম। শুনে খুব ভাল লাগল।

—এটা কি তোমার মনের কথা?

—হ্যাঁ, এটা আমার মনের কথা। ছকা ঢোলা পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ে বের করে আনল একটা হার, মুখ কাচুমাচু করে বলল, তোর বিয়েতে তো যেতে পারব না, তাই এই হারটা রাখ। বিয়ের দিন যদি সম্ভব হয় তো গলায় পরবি।

হাত পেতে হারটা নিল নয়নতারা, তারপর ওটা নেড়ে-চেড়ে মুখ বিকৃত করে বলল, এটা মনে হচ্ছে সোনার হার? নিশ্চয়ই চুরি করে এনেছ?

—বিশ্বাস কর, এটা চুরির মাল নয়। এটা আমার মায়ের হার। মা বলেছিল, এই হারটা আমার মনের মানুষকে দিতে। তাই তোকে দেব বলে আমি সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। ছকা অন্তর দিয়ে বোঝাতে চাইল কথাগুলো। নয়নতারা হারটা বার চারেক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেই ঘেন্নায় শরীর ঝাঁকিয়ে বলল, চোরের মায়ের বড় গলা। এই নাও তোমার হার......। কথা শেষ না করেই সে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল হারটা, তারপর ধুলো পথে ছুড়ে দিয়ে বলল, খবরদার আর কোনদিন তুমি আমার সামনে আসবে না। তুমি চোর, লম্পট, ধোকাবাজ। আমি তোমাকে ঘৃণা করি......

—তুই আমার মায়ের হারটা টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললি? নয়নতারার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে শুধোল ছকা, কাজটা তোর কি ভাল হল? হ্যাঁরে, এটা কি মানুষের কাজ হল? মায়ের চিহ্নটা তুই অমনভাবে ধুলোয় ফেলে দিতে পারলি? না নিতিস, ফিরিয়ে দিতিস—তুই কেন হারটা ছিঁড়ে ফেললি বল? বল, তোকে বলতেই হবে। কথা বলতে বলতে উত্তেজিত ছকা নয়নতারার গলার দিকে বাড়িয়ে দিল হাত, তারপর দাঁতে-দাঁত ঘষে বলল, আজ তোকে বাঁচতে দেব না, আজ আমার হাতে তোর মরণ আছে।

—আঃ ছাড় লাগছে! ককিয়ে উঠল নয়নতারা।

ছকা ভ্রূক্ষেপহীন, বেপরোয়া। ওর সবল হাত দুটো ক্রমশ চেপে বসেছিল নয়নতারার গলায়, তোর এত গর্ব কিসের আমি বুঝি নে? যারে তুই জীবনভর ঘৃণা করলি, আজ সে তোর সর্বস্ব লুটে নেবে। আজ তোকে আমি ছাড়ব না। ভালবাসা যখন পেলাম না, তখন তোর শরীর পেতে দোষ কি? আমি তো চোর, চুরি করা আমার স্বভাব। আজ আমি চুরি করব না, তোর সব কিছু লুটে-পুটে নেব। গলা ছেড়ে দিয়ে নয়নতারার হাত ধরে হিড়হিড়িয়ে কালভার্টের কাছে টেনে আনল ছকা। বাধা দেওয়ার শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল নয়নতারা।

ছকা দু'হাতে জোর করে তুলে নিয়েছে নয়নতারার ভরন্ত শরীর। হাত পা ছুড়ে সে কাঁদছে, ছেড়ে দাও গো, তোমার দুটো পায়ে ধরি, ছেড়ে দাও। বর্ষায় কালভার্টের নীচে খেলা করে ঘোলা জল। খরানীতে কালভার্টের নীচে বুনো আগাছার দঙ্গল। সাধারণত কালভার্টের নির্জনতায় দিনের বেলাতেও যায় না কেউ। ছকা ঐ নির্জন জায়গাকেই বেছে নিল বদলা নেবার জন্য। নয়নতারার খোলা শরীরের উপর শরীর বিছিয়ে সে যখন পশু হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে তখন আলো আঁধারীতে সে হঠাৎ দেখল শুয়ে থাকা যুবতীর চোখে ফোঁটা ফোঁটা বেদনার মুক্তো দানা। ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার করার আগেই তার ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, এ কী করছিস ছকা, এ পাপ, মহাপাপ। ঝড়ে ফুল ঝরে যায়, গায়ের জোরে ভালোবাসার ফুল ফোটান যায় না। ছকার গা-হাত-পা শিথিল

হয়ে এল নিমেষে। উঠে দাঁড়িয়ে দলা পাকান শাড়িটা সে নয়নতারার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, দেরী না করে তুই ঘর যা। আমি চোর কিন্তু লুটেরা নই। পালা, আমার সামনে থেকে পালা। আমি আর কোনদিন তোর মুখ দেখব না। শেষের দিকে গলা বুজে এল ছকার, গায়ের জোরে সব কিছু পাওয়া গেলেও আকাশের চাঁদ তো পাওয়া যায় না! আমি অধম, আমি চোর, আমার বুকে যে ভালবাসা থাকতে নেই।

যে মুক্তো বিন্দুগুলো ভয়ে ফুটে উঠেছিল নয়নতারার চোখে, সেগুলোই বুঝি ভেসে উঠল ছকার ঝিনুক চোখে। মাথা নীচু করে ছকা পালিয়ে বাঁচতে চাইল নয়নতারার দৃষ্টির বাইরে গিয়ে।

ঝড়ে নুয়ানো শিউলি গাছের মত শাড়িটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে নয়নতারা ভাবছিল ছকার কথাগুলো। কথাগুলো যেন তার বুকে ধারাল ব্লেড দিয়ে আঁকি বুঁকি দিয়েছে। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেও সে পারছিল না। তার সারা শরীরে তীক্ষ্ণ নখের আঁচড় যেন কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত কচি লাউয়ের মত, সরু রক্তের ধারা মিশে যাচ্ছিল ঘামে। ছকাকে সে কোনদিনও ক্ষমা করতে পারবে না। ছকা তাকে ক্ষমা করে দিলেও এক ফোঁটা সহানুভূতি এখন আর নয়নতারার মনে অবশিষ্ট নেই। গ্রামে ফিরে গিয়ে সে ছুটে যাবে থানায়। সুবিচার চাইবে দারোগাবাবুর কাছে।

নয়নতারা যখন এসব ভাবছিল তখন কালভার্টের বাইরে এসে হৃদয় বিদারক লোম চাগান আর্তনাদ করে উঠল ছকা। তারপর পায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে দেখল সদ্য ছোবল মারা চ্যাপ্টা বিষধর সাপটাকে। যন্ত্রণাভয়ে অস্থির হয়ে উঠল তার সমস্ত সত্তা। নয়তাবার দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে সে বলল, আমি আমার পাপের ফল হাতে-নাতে পেয়ে গেলাম। আর আমাকে চেষ্টা করেও সাজা দিতে পারবি না তুই। আমি তোকে হারিয়ে দেব বলেছিলাম। দেখ, কেমন তোকে হারিয়ে দিলাম।

ছকার গোঙানীভরা কথাগুলো শুনে টলমল পায়ে ছুটে এল নয়নতারা। ছকার পায়ের কাছে বসে পড়ে সে দেখল মৃত্যুদূত সরীসৃপ ফিরে যাচ্ছে অবশ-বিবশ শরীর নিয়ে। কালবিলম্ব না করে নয়নতারা তার কোলের উপর তুলে নিল ছকার পা। পরনের শাড়ির পাড় ছিঁড়ে সে পর পর বাঁধন দিল পায়ে তারপর ঘাড় নামিয়ে ছকার ক্ষতস্থানে মুখ নিয়ে গিয়ে চুষতে লাগল প্রাণপণে। চুষতে চুষতে হাঁপিয়ে উঠেছিল নয়নতারা। মুখ ভর্তি রক্তমাখা থুতু সে থুঃ থুঃ করে ফেলে দিচ্ছিল পৃথিবীর ধুলোয়। কিছুতেই সে ছকার কাছে হারবে না। জেদে টইটম্বুর তার হৃদয়। প্রেমের আকাশে ভালবাসার চাঁদ উঠলে ক্লান্ত নয়নতারা একসময় নিজেকে সঁপে দেয় ছকার বুকে।

# পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

ঘরখানা ঢাকা পড়ে আছে ছায়ায়, গাছ-গাছালির নুয়ে পড়া মাথা সম্ভ্রমে ছুঁয়েছে শ্যাওলা ধরা টালির ছাদ। এখানে সবসময় আলোর বড় অভাব। পাহাড় পেরিয়ে হাওয়া এলে ঝাঁটি বেড়ার ওপর শিমলতা দুলে ওঠে ফণাধারী সাপের মত। অমৃতার শরীর ভাল নেই ক'দিন থেকে। তবু প্রীতম তার কোন কথা শুনল না, গলার জোর খাটিয়ে বলল, চলো ঘুরে আসি, এমন সুযোগ বারবার আসবে না।

পাহাড়ে ঘুরতে যাবার অভিজ্ঞতা অমৃতার যে নেই তা নয়, তবে জংলী পাহাড়ের আকর্ষণ অন্যখানে, এ পাহাড়ে মানুষের পায়ের ছাপ কমই পড়ে, খুব ভ্রমণ পিপাসু পাগল ছাড়া এ পাহাড়ে মানুষ কমই আসে। এখানে দেখার মতো আহামরি কিছু নেই, বুনো গাছপালা ছাড়া আর কিছু আছে নাম না জানা লতা-পাতার ঝোপঝাড়। বর্ষার পরে পরেই সব পাহাড়ের চাকচিক্য বাড়ে, চতুর্দিকে সবুজের হাতছানি মনটাকে কিছু সময়ের জন্য সবুজ করে দেয়। অমৃতা নিমরাজী হয়ে বলেছিল, যাব, তবে একা নয়। অলকাও আমার সঙ্গে যাবে। ও তো কোথাও যাওয়ার সুযোগ পায় না। এই সুযোগে জামাইবাবুর সঙ্গে একটু পাহাড়ে ঘুরে আসবে।

বেড়াতে বেরিয়ে পিছু টান রেখে যাওয়া ভাল নয়, অলকাকে না নিয়ে গেলে প্রীতমেরই সমস্যা বাড়বে। চার মাসও হয়নি অমৃতার মাতৃবিয়োগ ঘটেছে, ফলে অলকা হোস্টেল থেকে ছুটি নিয়ে এসে একাই থাকে ঘরে। জামাইবাবুর চিঠি পেয়ে সে হাসিমুখে হাজির হল। অমৃতা বোনের সহজ সুন্দর চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবল একে আর বেশি দিন ঘরে রাখা যাবে না। ফুল ফুটেছে, সুগন্ধ ছুটছে চতুর্দিকে। এখন বুঝি ফাগুন রাঙান বসন্তবেলা। অলকার মুখশ্রী দেখে মনে হল এমন কথা। নিজের বোন বলে নয়, অলকা রীতিমত সুন্দরী। ওর কাচবরণ শরীরের লালিত্য, টিকালো নাসিকার যাদুময় আকর্ষণ, জোড়া ঠোঁটের মায়াবী সঞ্চালন—সব মিলিয়ে ওর কোন তুলনা নেই। সাধারণত বাঙালি ঘরের মেয়েরা এত বেশি লম্বা হয় না, অলকা সহজে বেড়ে ওঠা দেবদারু গাছ, ওর দীর্ঘাঙ্গী শরীরের আবেদনময় ছন্দ শুধু পুরুষ নয়, যে কোন মেয়ের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে অনায়াসে। অন্যের আয়নায় মেয়েরা তো নিজেদের দেখতে ভালবাসে। অলকা আয়না নয়, দামী বেলজিয়াম কাচ। ওর কপালে লুটিয়ে পড়েছে ফুরফুরে রেশমী চুল। ওগুলো স্প্রিংয়ের চেয়েও কুঁচকান। বাঁ হাতের লম্বা আঙুল দিয়ে ও যখন কপাল থেকে কুঁচো চুলেগুলো সরিয়ে দূরের পাহাড়টার দিকে তাকাল, তখন মেঘ উড়ে এসে থেমে গেল তার মাথার উপর। এক ঝাঁক চরতে বেড়ান তেলাপিয়া রঙের মেঘের ছায়া পড়ল তার মুখের

উপর। কাচবরন মুখে কালো ধোঁয়া মেঘের ছায়া কেমন বিসদৃশ দেখাল অমৃতার চোখে। শিমলতায় এ সময় ফুল আসার কথা। এ সময় শিমলতার যৌবন বুঝি ফুলেফেঁপে ওঠা নদী। অমৃতা নিঃশ্চুপে বোনের পাশে সরে এসে বলল, তোর বুঝি মায়ের কথা মনে পড়ছে এখানে এসে। মনে পড়াটাই স্বাভাবিক। এত শান্ত নির্জন জায়গায় এলে স্মৃতির ঝাঁপি খুলে যেতে বাধ্য।

অলকা কোন কথা না বলে দিদির মুখের দিকে তাকাল। পাহাড়ে আসার পর থেকে তার দিদির মধ্যে আবেগের নদীটা কুলকুল করে বয়ে চলেছে হরদম। সে বুঝি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে নিজের মধ্যে। প্রায়ই অসংলগ্ন হয়ে যাচ্ছে তার কথাবার্তা। প্রীতমকে পেয়ে তার জীবন যে ধন্য একথা সে অলকাকে জানাতে ভুল করেনি। বিয়ের পর ওরা পুরী বেড়াতে গিয়েছিল। ঝড় জলে পুরীর আনন্দটাই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। সেই আক্ষেপের কথা অমৃতা ফলাও করে শোনায় অলকাকে। পুরীর পর এই নিসর্গ পাহাড়। এখানে ওরা দু-জনে এলেই বুঝি ভাল করত। মাঝখানে অলকার এসে যাওয়াটা বিসদৃশ। অমৃতার কথাবার্তায় এসব ধরা না পড়লেও প্রীতম দু-একবার বলেছে এমন অপ্রীতিকর কথা। অন্য কেউ হলে মনে কিছু করত না, কিন্তু অলকার যেহেতু উই-মাটির চেয়েও নরম মন সে তাই মনে করেছে অনেক কিছু। দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গ সে তাই এড়িয়ে চলেছে ইচ্ছাকৃতভাবে। কিন্তু অমৃতা তা হতে দেবে না। সে অলকার হাত ধরে বলল, দেখ, দূরের পাহাড়টা কত সুন্দর! এত সুন্দর পাহাড় এর আগে আমি কোনদিন দেখিনি। পাহাড়ের যা রূপ সুন্দর পুরুষের বুঝি সেই রূপ থাকে। তোর জামাইবাবুর মধ্যে জংলী পাহাড়ের কঠিন রূপটা লুকিয়ে আছে। ওকে সহজে বোঝা যায় না, বোঝা গেলে আর ছাড়া যায় না। তখন আমার মনে হয় পাহাড় জড়িয়ে বেঁচে থাকা ঐ লতাগুলোর মত আমি। আমাদের এই সম্পর্ক একদিনের নয়, জন্ম-জন্মান্তরের।

অলকা দিদির হাসি মুখ দেখে খুশি হয়, জীবনে যে ভালবাসা পায়নি, সে যদি হঠাৎ করে ভালবাসার সমুদ্রের সন্ধান পায় তার তো এমন হবারই কথা। অমৃতার কলেজ জীবনের প্রেম রিকেট রোগীর মত শুকিয়ে গিয়েছে মনের বাগানে। ব্যর্থ প্রেমের পরিণতি যে হতাশার জন্ম দেয়, তার থেকে শুরু হয় শরীরের ক্ষয়। অমৃতা ক্ষয়ে যাবার আগেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল প্রীতম। সব শুনে সে বলেছিল, মনের বাগানে ফুল ফোটে তা আবার ঝরে যায়। আমি আবার নতুন করে ফুল ফোটাব। তুমি তোমার মনটাকে পলি মাটির মত উর্বর করো।

বিয়ের পর থেকেই ওরা দুটিতে বকম বকম পায়রা। পাহাড়ে বেড়াতে এসেও ওরা ভুলে গিয়েছে অলকার উপস্থিতি। ডাকবাংলোটা পাহাড়ের চূড়ায়। লাল টালির উপর সকালের সোনালী আলো আদর করে যায়। প্রীতমও অমৃতাকে কোলপাঁজা করে শুইয়ে দেয় সাজান গোছান ঘরে। অমৃতা মৃদু বাধা দিয়ে বলে, ছেড়ে দাও। অলকা বাথরুমে আছে। ওসব শুনতে পাবে।

—শুনতে দাও, দেখতে দাও। আমি কাউকে লজ্জা পাই না। প্রীতমের বেপরোয়া প্রেমিক গলা। সে অমৃতার বুকের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে পাগলের মত ঘষতে থাকে। অমৃতা আদর খাওয়া চিতল হরিণী বুঝি, নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় ডাকবাংলোর সুসজ্জিত ঘরে নিজেকে মেলে দিয়ে শুয়ে থাকে। বাথরুমের দরজা খুলে অপ্রস্তুত অলকার চোখে পড়ে সব। তার শরীরেও রোমাঞ্চের ঢেউ ওঠে। ভরা শরীর দুলে ওঠে। লাল হয়ে ওঠে মুখমণ্ডল, কানের লতি। এক ছুটে সে অন্যঘরে চলে যায়, ঘনঘন শ্বাস ফেলে হাঁপাতে থাকে। আর মনে মনে ভাবতে থাকে, এখানে এসে সে ভুল করেছে। নির্জনতা, উদার প্রকৃতি, বন্য সৌন্দর্য মানুষকে যে এমন পাগল করে দেয় সে জনাত না। নিজেকে তার মনে হয় একটা দেওয়াল। দুটি সুখী জীবনের মাঝখানে কঠিন দেওয়াল থাকা উচিত নয়। সে কী করবে, সে কি ফিরে যাবে? ফিরে যাওয়া বললেই তো ফিরে যাওয়া যায় না। ফিরে যেতে গেলে নষ্ট হবে ছন্দ। প্রীতম রাগ করবে। অমৃতা ভুল বুঝবে। দাঁতে দাঁত টিপে অলকা দাঁড়িয়ে থাকল ঝাঁটি বেড়ার উপর লতিয়ে যাওয়া শিমডগা ধরে। নিজেকে তার খুব অসহায় মনে হল সে সময়। শিমলতারও ঝাঁটি বেড়া আছে এগিয়ে যাবার জন্য। তার কি আছে? কিছু নেই। সে এখনও একা। ভীষণ একা। তার যে একা থাকতেই ভালোলাগে। একাকীত্বের মধ্যে সে খুঁজে পায় জীবনের ছন্দ, ধর্ম।

অমৃতা তার ঘাড়ের উপর হাত রাখল সহসা। খুবই আহ্লাদী গলায় বলল, প্রীতম জিপ নিয়ে গিয়েছে নীচে। তিন মাইল নীচে একটা ছবির মত গ্রাম আছে। আজ সেখানে হাট বসবে। প্রীতম বলছিল, ওখানে নাকি বনমুরগীর মাংস কিনতে পাওয়া যায়। যদি ভাগ্যে থাকে তাহলে আজ আমরা বনমুরগীর মাংস খাবো।

—বনমুরগীর মাংস! খুব আশ্চর্য হচ্ছিল অলকা, তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না অমৃতার কথাগুলো।

ডাকবাংলোর পিছনে চৌকিদারের টালির ঘর। ঘরের সামনে ছোট উঠোন। উঠোনের একপাশে নয়নতারা ফুল ফুটে আছে। সাদা ফুলগুলো যেন আকাশকে বলছে, আমাকে দেখ। এই সবুজের মাঝখানে আমিও কম সুন্দর নই। কিন্তু আকাশ বুঝি তার কথা শুনছে না। হাওয়া এল হুড়মুড়িয়ে। দুলে উঠল ঝুমকো ফুলের ডাল। কোথা থেকে ভেসে এল বুনো ফুলের সুঘ্রাণ। অমৃতা নাক টেনে বলল, এই জায়গাটা বুঝি স্বর্গ। এত সুন্দর জায়গা আছে ধারে কাছে আমার জানা ছিল না। সে কিছুক্ষণের জন্য থামল, তার সিনথেটিক শাড়ি বুকের খাঁজ বেয়ে লুটিয়ে পড়েছে ঘাসে, একটা রঙিন ফড়িং তার শাড়ির আঁচলে বসেছে, ফড়িংয়ের পাতলা ডানার শব্দে আরও বেশি চমকিত হল অমৃতা, গলায় ফুটে উঠল আনন্দের রঙ, দ্যাখ, দ্যাখ কী সুন্দর ফড়িংটা! এখানকার ঘাসফুল থেকে শুরু করে পিঁপড়ে পর্যন্ত সব কিছুই সুন্দর। অ্যায় শোন, কাল কিন্তু আমরা ঝর্না

দেখতে যাব। এখান থেকে বেশি দূর নয়, মাত্র দশ কিলোমিটার। প্রীতম জিপ চালিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে। আমি ওকে মানা করেছি জিপ চালানোর সময় ড্রিংক না করতে। কী রে তুই কিছু বলছিস না যে—

অলকা চোখ মেলে তাকাল, অমৃতার আনন্দকে সেও ভাগ করে নিতে চাইল, হ্যাঁ যাবো। জংলী ঝর্না দেখতেই তো এতদূর আসা।

—সকালে কিন্তু স্নান করার দরকার নেই, আমরা ঝর্নার জলে স্নান করব। আমি সাবান শ্যাম্পু সব সঙ্গে নিয়ে নেব। অমৃতা বিকেলের রোদের চেয়েও সুন্দর হেসে উঠল, তার চোখের দৃষ্টি পাহাড়ী পথটার উপর বিছানো। এই পথ ধরে প্রীতম গিয়েছে হাটে। সে বনমুরগীর মাংস কিনে ফিরবে। বাংলোর পিওন রেঁধেবেড়ে দেবে সব। বুড়ো পিওনের নাম হরিহর। সে একা থাকে। তার মত বিনয়ী মানুষ হয় না। পাহাড়ের চূড়ায় সব কিছু আছে, শুধু নেই প্রাণের স্পন্দন। বুড়ো হরিহর ছাড়া এখানে বুঝি আর কেউ থাকে না। যেখানে মানুষজন কম সেখানে মন বসে না অলকার। তাই তো সে ছুটে এসেছে এই পুরনো টালির ঘরখানার সামনে। ঘরটাকে দেখে তার মনে হয়েছে এখানে কেউ থাকলেও থাকতে পারে। হরিহর বুড়োকে সে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেনি, আসলে জিজ্ঞেস করার মত পরিবেশ, পরিস্থিতি ছিল না। জিপের শব্দ এল ধুলো উড়িয়ে। বড় শিমুল গাছটার পাতার আড়াল থেকে উড়ে গেল সাদা বক। এত উপরে বক যখন আছে, তখন নিশ্চয়ই ধারে কাছে কোথাও জলাশয় আছে। জিপের শব্দ শুনে অমৃতা আঁচল উড়িয়ে হৈ-হৈ করে ছুটে গেল কাঁটা তারের বেড়ার কাছে। অলকার কথা সে ভুলে গেল। অলকা ইচ্ছা করলেই দিদির পিছু নিতে পারত, কিন্তু সে গেল না। ঝাঁটি বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। তাকে যেন আকর্ষিত করছে টালির ঐ রুগ্ণ ঘরখানা। শালবল্লীর গেট পেরিয়ে সে নির্ভয়ে ঢুকে গেল উঠোনে। উঠোন ভর্তি ঘাস, তবু অযত্নের কোন চিহ্ন নেই! টালির ঘরে টিনের দরজা। দরজার উপরে চক দিয়ে লেখা ওড়িয়া শব্দ। অলকা ওড়িয়া পড়তে পারে না, সে শুধু হাঁ করে দেখল। দূর থেকে ভেসে এল অমৃতার হাসির শব্দ। প্রীতম ওর কাঁধে লোমশ হাত রেখে পাশাপাশি হাঁটছে। পায়ে গামবুট। পরনে বারমুনডা, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। খুব যত্ন করে ছাটা গোঁফ। দূর থেকে প্রীতমকে অলকার মনে হয় কোন দক্ষ শিকারী। চোখ ফিরিয়ে নিল অলকা। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল আরো কয়েক পা। মনে মনে ভাবল, এখানে কি হরিহর থাকে? তা কেমন করে হবে?

হরিহরের ঘর তো ডাকবাংলোর পিছনে? এ ঘরখানায় তাহলে কে থাকে? কেউ থাকে নিশ্চয়ই। অলকা সাহস করে দরজায় টোকা মারতেই টিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল বার-তের বছরের এক শ্যামলী কিশোরী, তার চোখে মুখে বিস্ময়মাখা, সে কোন কথা না বলে শুধু দেখতে থাকল অলকাকে। অলকাও

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে শুধোল, তোমারা বুঝি এখানে থাকো? আমরা দু দিন হল এসেছি, কই তোমাকে তো একদিনও দেখিনি।

মেয়েটি ঢোক গিলে সহজ হতে চাইল অলকার কাছে, তার কথা বলা উচিত হবে কি না ভাবল কিছু সময়, তারপর ওড়িয়া-হিন্দি মিশিয়ে সে যা বলল তা শুনে রীতিমত অবাক হয়ে গেল অলকা। পাহাড়ের এই উচ্চ শিখরে, বনভূমির অমৃতছায়ায় ফুলের মত একটা মেয়ে তার বিধবা মাকে নিয়ে নির্বাসনে থাকতে পারে এটা তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

অলকা কাঁপা কাঁপা গলায় শুধোল, তোমার নাম কি?

আড়ষ্ট কিশোরী বলল, বনবালা রজক।

হ্যাঁ, বনবালাই বটে! বনেব ভেতর লুকিয়ে ফুটে থাকা ফুলের নাম তো বনবালা ছাড়া আর কি হতে পারে? অলকার স্থির চোখের দৃষ্টি কিশোরীর মুখের উপর নিবদ্ধ। এই নির্জনে প্রাণের স্পন্দনে তার বুকের ভেতরেও খুশির ঝর্না উথলে উঠছে। সে আর দূরের ঝর্না দেখতে যাবে না। সে এখানেই থাকবে। বনবালার সাথে কথা বলে সময় অতিবাহিত করবে সে। বনবালা তাকে সাদরে ঘরের ভেতরে ডাকল। তার পুরনো ছাপা ফ্রকের উপর ময়লা বসেছে কাঁঠালের মাছির মত। তবু তার মনে কোন দুঃখ নেই। এক পিঠ ছাড়া চুল তার পিঠের উপর বর্ষার ধূমল কালো মেঘকে বুঝি আশ্রয় দিয়েছে। কিশোরীর চোখ দুটি হরিণ-কালো। নয়নতারা ফুলের চেয়েও সাদা চোখের জমি। প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর নিটোল মুখখানার দিকে তাকিয়ে অলকা আর বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না, ঘরের পুরনো দড়ির খাটিয়াতে সে ঝুপ করে বসে পড়ে শুধোল, তুমি কি এ ঘরে একা থাকো?

ঘাড় নাড়ল বনবালা, মিষ্টি গলায় বলল, আমি আমার মায়ের সঙ্গে থাকি।

তোমার মা কোথায়, তাকে তো দেখছি না?

মা বনে গিয়েছে কাট ভাঙতে। এই এল বলে। বনবালা আগের তুলনায় অনেক বেশি সহজ। হাসি ফুটেছে তার ঠোঁটে। কথা বলার আনন্দে সেও যেন বিভোর। অলকাকে যে পছন্দ হয়েছে তা তার চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়। বনবালা অলকার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, যথাসম্ভব জড়তা সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে সে শুধোল, হরিহর জ্যাঠা কি ঘরে নেই? আমি কি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি?

অলকা হা-করে তাকাল বনবালার মুখের দিকে, লজ্জায় পড়ে যাওয়া গলা করে সে বলল, আমি তোমাদের এখানে কোন কাজে আসিনি, এমনি বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম। কত আর পাহাড় দেখব বলো তো, মানুষ না দেখলে আমার মন ভরে না। দূর থেকে তোমাদের ঘরখানা আমি অনেকবার দেখেছি। দেখে মনে হয়েছে এ ঘরে নিশ্চয়ই মানুষ থাকে। মানুষ না থাকলে শিমগাছ কেন বেড়ার উপরে লতিয়ে বাড়বে। তাই ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম। এসে দেখছি

ভালই করেছি। তোমার সাথে আলাপ হয়ে গেল। তা তোমাকে একটা প্রশ্ন শুধাই, তুমি কি কোনদিন ঘরের বাইরে বেরও না!

—বেরই। ডাকবাংলোয় কেউ না এলে বেরই। বনবালা দ্বিধা ভরা চোখে তাকাল, ঢোক গিলে বলল, এখানে কেউ এলে আমার মা ঘরের বাইরে বেরতে মানা করে। আমি তো বড় হচ্ছি, সেই জন্য।

—তুমি যে বড় হচ্ছো, একথা তোমাকে কে বলল?

প্রশ্ন শুনে বনবালা অপ্রস্তুত। নিজের শরীর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সে অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল, অলকা তাকে বলল, বড় হলে কাউকে বড় হওয়ার কথা বলতে নেই। গাছ বড় হলে আমরা তাকে দেখে বুঝতে পারি, গাছ কখনও বলে না সে বড় হয়েছে।

—তবে মা যে বলে আমি অনেক বড় হয়ে গেছি। বনবালা কথা শেষ করে বোকার মত তাকাল। অলকা জোরের সঙ্গে বলল, তোমার মা ভুল বলে। তার সাথে দেখা হলে আমি তার ভুল ভেঙে দেব।

এবার যেন জ্বলে উঠল বনবালা, জোরের সঙ্গে বলল, না আমার মা ভুল বলে না। আমি যে বড় হয়েছি তা আমি নিজে জানি। না হলে সেবার কেন একটা বাবুমানুষ গলা অব্দি মদ খেয়ে আমার হাত ধরে টানল? সেদিন থেকে ভয়ে মা আমাকে বাইরে বেরতে দেয় না। মা বলে, বেশিরভাগ শহুরে মানুষরা মানুষ নয়, ওরা বনের বাঘ-ভালুক।

টালির ঘরের মেঝেটা এবড়ো খেবড়ো, বয়সের ভারে সিমেন্টের মেঝে ফেটে চৌচির। বিকেলের শেষ আলো এসে পড়েছে মেঝেতে। ঘরজুড়ে কেমন গা-ছমছমান পরিবেশ। অলকা দড়ির খাটিয়ায় বসে ঘরের ভেতরটা দেখছিল। একটা দড়িতে টাঙান ছিল ভেজা শাড়ি। হাওয়ায় দুলছিল শাড়িটা। শাড়ির রঙ দেখে বনবালার মায়ের বয়স অনুমান করা যায় না, তবে সামাজিক অবস্থানটা সহজে অনুমেয়। কতগুলো বাসন-কোসন ঘরের কোনায় জড়ো করা। ঘরটাতে জগন্নাথের ছবি ছাড়া আর কোন ছবি নেই। বনবালা কী বলবে কথা হাতড়াচ্ছিল। অলকা বলল, আমাকে এক গ্লাস জল দিতে পার? খুব তেষ্টা পেয়েছে।

বনবালা কলসী থেকে জল গড়িয়ে দেওয়ার সময় বাইরে কাঠের বোঝা নামাবার শব্দ শুনতে পেল অলকা। জলের গ্লাসটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে ব্যস্ত বনবালা বলল, মা এসেছে। আপনি বসুন। আমি একটু আসছি।

বনবালা বাইরে বেরিয়ে গিয়ে তার মায়ের সাথে নীচু গলায় কী যেন বলল। কিছু পরে ওরা মা-মেয়েতে ঢুকে এল ঘরে। অলকা দেখল, মাঝবয়সী একজন মহিলা তার সামনে এসে মুখ নিচু করে দাঁড়াল। তার রুগ্‌ণ চেহারায় চটক আছে জংলীলতার। চোখের কোণে কালি নেই, আছে পরিশ্রমের ধকল। হাত জোড় করে মাঝবয়সী মহিলাটি বলল, আমার কী সৌভাগ্য, আমার ভাঙা ঘরে দিদিমণির পায়ের ধুলো পড়েছে। আলো-ছায়া অন্ধকারে অলকার তাকিয়ে

থাকতে ইচ্ছা করে। বনবালার মায়ের নাম নিরালা। ওর অভাবী মুখে হাসি লেগে আছে সর্বদা তবু সেই হাসির ভেতর চিকুর কাটা বিদ্যুৎরেখার মত খেলে যায় দুঃখস্রোত। বড় রহস্যজনক মনে হয় নিরালাকে। একদম প্রথম দর্শনে কারোর অন্তরের ভেতরে ঢুকে পড়া উচিত নয় ভেবে অলকা চুপ করে থাকল। শাড়ির আঁচলে মুখের ঘাম মুছে নিয়ে নিরালা শুধোল, তা দিদিমণির থাকা হবে ক দিন নিশ্চয়ই? তা থাকুন। এখানে তো কেউ আসে না। যারা আসে তারা সহজে যেতে চায় না। জায়গাটার মহত্ত্ব বুঝি এইখানে।

সন্ধে লাগার মুখে হরিহর ডাকতে এল অলকাকে, সে বেড়ার উল্টোপিঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় ডাকল, দিদিমণি, ও দিদিমণি। সাহাব আপনাকে ডাকচে।

অলকা উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। বনবালাকে বলল, তোমার কি কোন কাজ আছে? কাজ না থাকলে আমার সঙ্গে চলো। আমি তোমার সঙ্গে গল্প করব।

বনবালা কোন উত্তর না দিয়ে তার মায়ের দিকে তাকাল, নিরালা মেয়ের মনোভাব বুঝতে পেরে বলল, যা বেশি দেরি করবিনে। আসার সময় হরিহরদাকে বলবি এগিয়ে দিতে।

ওরা চলে যাবার পর একা হয়ে গেল নিরালা। টালির ছাদের নীচে খেলে বেড়াল জোনাকি। ঘরটা অনেক আগে থেকেই ভরে ছিল অন্ধকারে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিরালা লম্ফো ধরাল। ডাকবাংলোর ঝাড়বাতিগুলো ধরিয়ে দিয়েছে হরিহর। আলোর রশ্মি ঠিকরে পড়েছে এদিক-সেদিক। ডাকবাংলোয় কেউ না এলে আলো জ্বালায় না হরিহর, সে তখন বেড়া পেরিয়ে চলে আসে নিরালার ঘরে, দড়ির খাটিয়ায় বসে লাল চা খেয়ে গল্পগুজব করে চলে যায় নিজের ঘরে। পাহাড়ের উপর কেউ এলে হরিহর এমন ভান করে সে যেন নিরালাকে চেনে না। তার এই অদ্ভুত ব্যবহার নিরালাকে দুঃখ দেয়। পাহাড়ের উপরের এই নির্জন ডাকবাংলোর আউট হাউসে নিরালার যে কত বছর কেটে গেল তা সে নিজেও জানে না। নিজের জীবনের অভিশপ্ত ইতিহাস সে জানতেও চায় না। কী হবে জানিয়ে। গুণধর মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ার পরই তার সব সখ-আহ্লাদ, হাসি -ভালবাসা, স্বপ্ন দেখা শুকিয়ে গিয়েছে খরায় পোড়া অরণ্যের মত। এখন শুধু বেঁচে থাকা বনবালার মুখ চেয়ে। মেয়েটা না থাকলে তার আর কোন পিছুটান থাকত না, সেও ড্যাং ড্যাং করে চলে যেতে পারত মৃত্যুর নীলছায়া দেশে। লম্ফোর আলোয় টালির ঘর জেগে উঠেছে, ঘরের আনাচে কানাচে দৃশ্যমান হয় অভাব। এই অভাব নিরালার সর্বক্ষণের সঙ্গী, অনেকটা শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার মত মুহূর্তময় ঘটনা। বনবালা চলে গিয়েছে দিদিমণির সঙ্গে গল্প করতে, সাধারণত এরকম সে যায় না, অথচ আজ চলে গেল। গিয়ে হয়ত ভাল করেছে মেয়েটা। বাইরের জগত তার কাছে অদৃশ্যময় জগত, পাহাড়ের উপরে এই নির্জন ডাকবাংলোর আউট হাউসে বাইরের খোলামেলা জীবনেব প্রভাব থেকে

বিচ্ছিন্ন। বনবালা যে ভাবে গায়ে গতরে বাড়ছে তাতে আর দু'তিন বছরের মধ্যে ওকে পাত্রস্থ করার প্রয়োজন নাহলে ঘরে রাখা যাবে না তাকে।

চুলা ধরিয়ে কপালে হাত দিয়ে বসল নিরালা। দুটো চাল ফুটিয়ে নিতে হবে রাতের জন্য, আজ রাতে হরিহর আর গল্প করতে আসবে না। ডাকবাংলোয় কেউ এলে সে হয়ে যায় আস্ত একটা কেঁচো। কাঁচা কাঠের ধোঁয়ায় নিরালার চোখ ভরে জল আসে, চুলা ফুঁকায় ফুঁ দিতে দিতে এক সময় আগুনের হল্‌কায় ছ্যাঁকা খেয়ে সে দেখে আর একটু হলে তার চুলের ডগা পুড়ে যেত আগুনে, নিজেকে সামলে নেয় নিরালা। নিজেকে শক্ত করে সে।

রাত বাড়ে।

বনবালাকে ঘর অব্দি এগিয়ে দিয়ে যায় হরিহর। যাওয়ার সময় সে বলে, ঘরে গিয়ে খিল তুলে দে ভাল করে, যা ভালুকের উৎপাত, কখন কী হয় বলা যায় না। হরিহর চলে যাওয়ার পরও বনবালা দাঁড়িয়ে থাকে দুয়ার ধরে। আজকের দিনটা তার কাছে স্মরণীয় দিন। সবাই কেন দিদিমণির মত ভাল হয় না!

দুটো বনমুরগী ওজনে দু'কেজির উপরে।

প্রীতম নিজের হাতে বাহাদুরী দেখিয়ে মুরগী দুটোকে কাটতে চেয়েছিল, হরিহর নিষেধ করল. তা হয় না বাবু। যার কাজ তারই সাজে, অন্যের কাছে লাঠি বাজে। আমাকে মুরগী দুটো দিন। আমিই কেটে সাফ-সুতরো করে দিচ্ছি। ডাকবাংলোর সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা লন, কিছু দূরে রেলিং আছে লোহার, রেলিংয়ের নীচ থেকে শুরু হয়েছে হৃৎপিণ্ড চমকান খাদ। খাড়া নেমে গেছে এ পাহাড় সে পাহাড়ের গা ছুঁয়ে। রেলিং ধরে দাঁড়ালে রাতের আকাশের নীচে দূরের পাহাড়ী শহরটা দেখা যায়, আলোর নিশানাগুলো ঠিক যেন দূরাগত তারা।

বনমুরগী কাটতে গিয়ে হরিহরকে বেশি বেগ পেতে হয় না, খালপোষ করে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। প্রীতম কিং সাইজ সিগারেট ধরিয়ে ফোলডিং চেয়ারে গিয়ে বসেছে। অলকা বসেছে তার পাশে। ডাকবাংলোর ঝাড়বাতির আলো ঠিকরে পড়েছে ঘাসে। অলকার মুখোমুখি চেয়ার সরিয়ে বসে প্রীতম বলল, কাল আমরা ফলস্ দেখতে যাবো। তুমি সকালে রেডি হয়ে নিও।

অলকা নিরুদ্বিগ্ন চোখে তাকাল। প্রীতম বলল, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে শরীর খারাপ। কী হয়েছে তোমার?

ফ্যাকাসে হাসল অলকা. কই কিছু না তো?

অমৃতা চায়ের কাপ নিয়ে এল তখন, ধূমায়িত চায়ের কাপ ওদের দুজনের হাতে তুলে দিয়ে বলল, বনমুরগীর মাংস আমি নিজে রাঁধব। হরিহরের আজ বিশ্রাম।

—তুমি পারবে এত ধকল সইতে? চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রহস্যভরা চোখে তাকাল প্রীতম, তার হাবভাব বলে দিচ্ছিল সে যেন ক্ষুধার্ত, শুধু বনমুরগীর মাংস নয়, সে যেন আরো অনেক কিছু চায়।

অলকার নজর এড়াল না, এসব আদিখ্যেতা তার একদম পছন্দ নয়। জংগলে এলে যে মানুষকে জংলী হতে হবে—এটা তো কেউ মাথার দিব্যি দিয়ে বসে নেই। প্রীতম বাঁ হাত উদ্দেশ্যপূর্ণভাবেই অমৃতার হাতের উপর রাখল, ওকে আদর করে বলল, দূরের আলোগুলো দেখ কী ফাইন লাগছে! দূর থেকে সব কিছু এত ভাল লাগে! কাছে গেলে আকর্ষণ অনেক কমে যায়। তবে তোমার বেলায় তা আলাদা। তোমার যত কাছে থাকি, আমার মনে হয় আরো কাছে যাই, আরো কাছে। প্রীতমের কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এল আবেশে। অমৃতা তার হাতটা সরিয়ে দিতে পারল না। অলকার উপস্থিতি কাঁটার মত বিঁধল তার চোখে। এ সময় তৃতীয় মানুষের উপস্থিতি শোভন নয়। সে অলকার দিকে তাকাতেই লজ্জায় কুঁকড়ে গেল তার চোখ। কোন কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকল সে।

প্রীতমের অবাধ্য হাত খেলা করে অমৃতার শরীরে। আলো-আঁধারীতে সব কিছু দেখতে পায় অলকা। নিজেকে বাঁচাতে সে উঠে পড়ে। প্রীতমকে বলে,আমি ঘরে যাচ্ছি জামাইবাবু। মাথাটা ধরেছে মনে হচ্ছে। একটু ঘুমাব। খাওয়ার সময় ডাকবেন। একটু রেস্ট নিলে মনে হয় শরীরটা ঠিক হয়ে যাবে।

বনমুরগীর মাংস সুস্বাদু। খেতে বসে প্রীতম বলল, হরিহর মাংসটা ফার্স্ট ক্লাস বানিয়েছে। এ জিনিস শহরে পাওয়া যাবে না!

অলকা বনমুরগীর হাড় চুষছিল। কথাটা কানে যেতেই সে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল।

প্রীতম রসিকতা করে বলল, মুরগীর চেয়ে বনমুরগীর টেস্ট আলাদা। মাঝে মাঝে টেস্ট বদলানোর দরকার।

—তার মানে? অমৃতা সন্দেহঘন চোখে তাকাল।

প্রীতম হাসতে হাসতে বলল, টাকার চেয়ে সুদ মিষ্টি! বউয়ের চেয়ে শালী মিষ্টি। কি আমি ঠিক বলিনি?

অলকার শরীর জুড়ে ঝড় শুরু হল. পুরো মাংস খেতে পারল না সে। ডান হাতে মুখ চেপে সে চলে গেল বেসিনের কাছে। পেট হালকা করে বমি হল তার। ফিরে এসে প্রীতমের সঙ্গে একটা কথাও বলল না।

বিছানায় অমৃতার অভিমানভরা মুখ দেখে প্রীতম শুধালো, তোমার আবার কী হল? অমন মুখ ফুলিয়ে আছ যে—। বেড়াতে এসে এত গম্ভীর হয়ে গেলে আমার ভাল লাগে না।

এবার ফুঁসে উঠল অমৃতা। বিছানায় দু-হাতের ভর দিয়ে উঠে বসল সে, আলো নিভিয়ে বলল, মেয়েরা তোমার কাছে মুরগী এটা জানতাম না। অলকাকে নিয়ে তুমি যা ইঙ্গিত করেছ তা রীতিমতন অপমানজনক। আমার বোন কি বাজারের মেয়েছেলে? তুমি তাকে নিয়ে এমন অসভ্য কথা বলবে না। ও তোমার কথায় দুঃখ পেয়েছে।

—তুমি পাও নি?

—আমি তো তোমাকে চিনি।

—ওয়েল, তাহলে ভাল মেয়ের মত শুয়ে পড়। কাল ভোরে উঠতে হবে। প্রীতম আড়ামোড়া ভেঙে শরীর এলিয়ে দিল বিছানায়। এক ঘুমে রাত ভোর হয়ে যেত কিন্তু অলকার জন্য তা হল না। রাতে বার তিনেক বমি করল অলকা। মলিন চাঁদের দিকে তাকিয়ে তার চোখ ভরে জল এল। কেন যে তার চোখে জল এল তা সে জানে না। তার শুধু মনে হল, প্রীতম মানুষ নয়, নরখাদক। ওর সঙ্গে আর কোথাও বেড়াতে যাওয়া নয়। শহুরে সভ্যতায় প্রীতমের মন একেবারে কলুষিত। ওর ছায়া মাড়ানো পাপ। ওরা যায় যাক, সে যাবে না। সে এখানেই থাকবে একা। খুব খারাপ লাগবে না, বনবালাকে সে ডেকে নেবে গল্প করার জন্য। ওর মধ্যে এখনও পাপ ঢোকেনি। ও নিষ্পাপ। নয়নতারা ফুলের চেয়েও নিষ্পাপ সুন্দর।

ভোরবেলায় প্রীতম জিপ চালিয়ে চলে গেল, অলকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। ক'বার বমি করে তার শরীর আর চলছিল না। চোখের কোল বসে গিয়েছে। শুকিয়ে গিয়েছে মুখের লাবণ্য।

নিরালা তার করুণ অবস্থা দেখে বলল, দিদিমণি, আপনি বিশ্রাম করুন। এ শরীর নিয়ে আপনি ঝর্না দেখতে না গিয়ে ভালই করেছেন। অতটা রাস্তা কখন কী হয়ে যায় বলা যায় না তো।

নিরালার আন্তরিক কথায় মুগ্ধ হল অলকা। দাঁড়িয়ে থাকা হরিহরকে বলল, তুমি যাও, দরকার হলে আমি তোমাকে ডাকব।

হরিহর চলে গেল কিন্তু নিরালা গেল না। সে শুরু করল তার দুঃখের পাঁচালী। গুণধর এই ডাকবাংলোর পিওন ছিল। অসময়ে সে চলে গেল। বনবালাকে নিয়ে কোনমতে দিন কাটে নিরালার। এই ছন্দহীন জীবনের কোন মূল্য নেই তার কাছে। তবু সে বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে। বনবালার মুখ চেয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে। সরকারি টাকা সে এখনও পায়নি। হরিহর বলেছে, সব ব্যবস্থা করে দেবে। বিনিময়ে সে যা চায় তা কি কোনদিন দিতে পারবে নিরালা?

বৃদ্ধ হরিহর তার কাছে প্রেম চায়। সে নতুন সংসার পাততে চায়। সবুজের মাঝখানে সে এখনও সবুজ, তরতাজা। বার্ধক্যের গ্লানি তাকে এখনও স্পর্শ করেনি।

অলকা সব শুনে বলল, তুমি কী ভেবেছ নিরালা? হরিহরকে আবার জীবনসাথী করে নেবে?

নিরালা চুপ করে থাকল। অনেক ক্ষেত্রে মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ।

তাহলে কি পুরো নারী জাতটাই এভাবে বিকিয়ে যাবে? হারিয়ে ফেলবে আত্মসম্মানবোধ? প্রীতমরা কি তাহলে শুধু শহরে নয়, এই নির্জন অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ে চতুর ভালুকের মত ঘোরাফেরা করে? ওদের বিষদাঁত কে ভেঙে দেবে?

অলকার আবার মাথাটা ভার হয়ে আসছিল। নিরালা বলল, দিদিমণি, মাথাটা টিপে দিই?

—না, থাক। মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। অন্তর্মুখী অলকা বারবার নিজেকে প্রশ্ন করল, শরীর কি মনের ভাষা বোঝে না, শরীর কি হারিয়ে দেয় মনকে? কেন?

নিরালা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হরিহরের ইশারায়। বাসি বনমুরগীর মাংসগুলো সে নিরালার জন্য রেখে দিয়েছে। আউট হাউসের মেঝেতে বসে মন দিয়ে মাংস খাচ্ছিল নিরালা। হরিহর দেখছিল এক মনে। ওর চোখে ব্যাকুলতা। ক্ষুধা আর তৃষ্ণা।

বনবালার সহ্য হয় না এদৃশ্য। তার শরীর মোচড় দেওয়া বমি পায়। বাবা বেঁচে থাকলে তাকে কি এমন দৃশ্য দেখতে হোত?

হরিহর বা নিরালার কানে বমির শব্দ পৌঁছায় না। মাংস খেতে খেতে নিরালা বলে, পাথরে পাথর ঘষলে আগুন বেরয়। তুমি কবে পাথরের মত জ্বলে উঠবে?

হরিহর হা করে তাকায়। সবুজ অরণ্য ভূমিতে তার শূন্য দৃষ্টি মিশে যায়।

হাওয়া আসে। হাওয়ায় ভেসে আসে বমির শব্দ।

মাংস খেয়ে মুখ মুছে নিরালা বলে, আমি যাই। দিদিমণি মনে হয় বমি করছেন। পড়া-লেখা শেখা মেয়েমানুষরা এত যে কেন বমি করে বুঝি না।

নিরালা ডাকবাংলোর কাছাকাছি এসে দেখল, অলকা নয়—বমি করছে বনবালা। বমি শেষ করে সে ক্ষোভের সঙ্গে শুধোল, মাগো, বাসি মাংস তুমি খেতে পারলে? তোমার ঘেন্না লাগল না? ছিঃ ছিঃ, এ আমি কার পেটে পৃথিবীতে এলাম! আমার যে গা গুলিয়ে বমি আসছে।

শুকনো পাতার পৃথিবীতে কচি পাতাও ছটফট করে হাওয়ায়। নিরালা কোন কথা না বলে মুখ নীচু করে দাঁড়ায়। তার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। গা গুলোয়। বমি পায়। হাত মুখে চেপে সে বসে পড়ে ঘাসে। কোনমতে বলে, আমি আর কোনদিন বনমুরগী হব না। তুই বমি থামা, বমি থামা। আমাকে বাঁচা। তুই ক্ষমা না করলে আমি যে বাঁচব না।

সবুজের মাঝে সবুজ হাসি ছড়িয়ে বনবালা যেন সকালের রোদ। নিরালার অন্ধকার মুছে যেতে থাকে নরম রোদের ছোঁয়ায়।

# তালগাছ

কতদিন পরে চেনা মাটিতে পা দিয়ে বুকের গভীরে অদ্ভুত একটা শব্দ শুনতে পেলেন সুধাময়ী, এই শব্দধ্বনিটা তাঁর খুবই চেনা, অত্যন্ত সুখের মুহূর্তে এই শব্দগুলোই তাঁকে নদীতে ভেসে যাওয়া ফুলের মত স্বপ্নরাজ্যে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আঃ, কতদিন পরে চেনা চৌহদ্দিতে পা রাখল, এই মাটি-পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা এমন কী নীল আকাশটা তাঁর কত চেনা। বাস থেকে নেমেই সুধাময়ীর পা চলছিল না আর, টানা তিন ঘণ্টা বাসে বসে হাত-পায়ের গিঁটগুলোয় যেন খিল ধরে গিয়েছিল। বাইরের মুক্ত আলো-হাওয়ায় সুধাময়ীর অন্তর যেন বলে উঠল, আমার মত পোড়া কপাল আর কার আছে, নইলে শ্বশুরভিটে ছেড়ে কি কাউকে বিদেশ-বিভুঁইয়ে থাকতে হয়।

বাস থেকে নেমেই শাড়ি ঠিক করে সুধাময়ী গদাধরের দিকে তাকালেন, গদাধর কিছু বলার আগেই অস্ফুটে তিনি বলেন, দেখ, কত কি পাল্টে গিয়েছে! মাত্র এক বছর আসিনি, তাতেই দেখ কত কি পরিবর্তন!

গদাধর স্ত্রীর কথায় ঘোলাটে চোখ তুলে চারিদিকে তাকালেন, দু-একটা বড় সাইনবোর্ড ছাড়া তাঁর চোখে তেমন কিছুই আর ঠেকল না। পাকা রাস্তার বাঁ-দিকে বড় হাই-ইস্কুল, তার মাত্র বিশ হাত দূরেই জোয়ার-ভাঁটার খাল—এখন চড়া পড়ে শীর্ণ গ্রামীণ বৃদ্ধার মত। বছব পাঁচেক আগেও এই নোনা খাল দিয়ে খড় বোঝাই নৌকা যেত সারি সারি, জেলেরা জোয়ারের সময় জাল বিছাত মাছের লোভে, চুনোচাঁদা মাছের লোভে উড়ত কাক-চিল আর মাছরাঙা। তখন খালপাড়টা কত জমজমাট ছিল, মানুষের হাঁক-ডাকে ফুটে উঠত ব্যস্ততা। মরাখালের দিকে তাকিয়ে গদাধরের বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল যন্ত্রণায়, চশমার কাছ মুছে তিনি আরো স্পষ্ট করে দেখতে চাইলেন খাল ধারের দৈন্যদশা। কাঁটার মত চোখে বিঁধে গেল সব। ক্ষীণ জলধারায় তিনি আর আগের স্রোত, ঢেউয়ের শব্দ, জোয়ারের হিস্‌হাস ধ্বনি কোন কিছুই শুনতে পেলেন না। সময়কে পিছনে ফেলে এই জায়গাটার অনেক কিছু উন্নতি হলেও—সেই উন্নতির কোন কিছুই গদাধরের চোখে পড়ল না। মরা খালটার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হল—অনাদর, অবহেলায় রুগ্‌ণ পীড়িত মাকে দেখার আর কেউ নেই এ অঞ্চলে, তাঁর যোগ্যমান ছেলেরা যে যার মত আলাদা হয়ে ভুলে গিয়েছে অশীতিপর মাকে. নাহলে এত প্রাচীন খালটার সংস্কার হয়নি কেন? গদাধরের সমস্ত শরীর চিড়বিড়িয়ে উঠল রাগে উত্তেজনায়। সুধাময়ী গদাধরের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললেন, রাস্তার ধারে যাত্রী প্রতীক্ষালয়টা ভারি সুন্দর বানিয়েছে! তুমি দেখেছ ওটা?

গম্ভীর শ্বাস ছেড়ে গদাধর সুধাময়ীর দিকে তাকালেন তারপর কাঁচা-পাকা চুলগুলোয় আলতো হাত বুলিয়ে বললেন, সব দেখেছি কিন্তু বুড়ো বটগাছটাকে কেন যে কেটে ফেলল তা আমার মাথায় ঢুকছে না। ছোটবেলায় ঐ বটের ছায়ায় আমরা বসে থাকতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এমন শীতল ছায়া তো তোমার ঐ প্রতীক্ষালয়ে পাওয়া যাবে না।

সুধাময়ী করুণ গলায় বললেন, বটগাছটা বুড়ো হয়েছিল, হয়ত সেইজন্যই ওটাকে গ্রামের লোকে কেটে ফেলেছে। তাছাড়া অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল গাছটা, তাই হয়ত কেটে দিয়েছে। যুক্তিটা গদাধর মানতে চাইলেন না কিছুতেই, বুড়ো হলেই তাকে কি মেরে ফেলতে হবে? বলেই নিজের দিকে জড়তা ভরা চোখে তাকালেন।

সুধাময়ী কোন কিছু না বলে হেঁটে এলেন রিকশা-স্ট্যান্ড অব্দি। তাঁদের গ্রাম এখান থেকে তিন মাইলের মধ্যে। এই চড়া রোদে বুড়ো-বুড়ি হাঁটতে পারবেন না আগে থেকেই জানতেন। ভাইপো অমরের রিকশা স্ট্যান্ডে থাকার কথা। সেই মত চিঠিও দিয়েছিলেন। ফাঁকা রিকশা স্ট্যান্ডে একটা ঘেয়ো কুকুর হাঁ-করে তাকিয়ে আছে, অচেনা মানুষকে দেখার জন্য আতঙ্ক ভরা দৃষ্টিযুগল। গদাধর ভাল করে চারপাশটা দেখে নিয়ে বললেন, অমর মনে হয় আসতে পারেনি। না আসতে পারাটাই তো স্বাভাবিক। এত বড় একটা পুজোর দায়িত্ব ওর ঘাড়ে। ও যেদিকে না যাবে সেদিকটাই তো অন্ধকার।

সুধাময়ী এবারও কিছু বললেন না, শুধু দূরের দিকে তাকালেন। মোরাম ফেলা পথটা খালের সমান্তরাল চলে গেছের গ্রামের ভেতর। ভ্যান রিকশ আর অটো চলে এখন। তবে দুপুরের দিকটা বড় বেশি শান্ত। শুধু বাজারের কুকুরগুলো এদিক-সেদিক হাঁটছে খাবারের সন্ধানে। মাছের বাজারে দোচালার নীচে বসে জুয়া খেলছে ক'জন মানুষ। ওদের খালি গা, কোমরে জড়ানো গামছা, পায়ে সোলক্ষয়া কমা চপ্পল। চেহারাগুলো চোয়াড়ে টাইপের, দেখে মনে হয়—মাথায় ওরা চিরুনি দেয় না কতদিন। অমর আসেনি বলেই সুধাময়ীকে চিন্তিত দেখাল কিছুটা। তিনি ভেবেছিলেন—অমর আসবে। এতটা পথ তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। চিঠিতে তেমনই তো লিখেছিল সে। কেন এল না অমর? সুধাময়ীর কপালে চিন্তার রেখাগুলো দু'মুখো সাপের মত নড়ে উঠল ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আবার ভাবলেন—এতটা পথ তাঁরা তো অমর ছাড়াই এসেছেন। আড়াইশো কিলোমিটার পথ যখন তিনি আসতে পেরেছেন তখন তিন মাইল পথ কোন সমস্যা নয়। তবু তিনি এত কেন ভাবছেন? এই চড়া রোদে অমর না এসেই ভাল করেছে। ওরও তো বিশেষ কোনো কাজ থাকতে পারে। গদাধর খালি ভ্যান রিকশর উপর ব্যাগটা নামিয়ে তাস খেলায় মত্ত খালি গায়ের লোকগুলোর দিকে তাকালেন। যাদের দিকে তাকালেন তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই, অগত্যা মনোযোগ আকর্ষণের জন্য

হর্ন বাজালেন তিনি, সেই শব্দে ছুটে এল নিতাই, লজ্জিত চোখে সে বলল, জ্যাঠাবাবু এই এলেন বুঝি?

নিতাই তাঁদের গ্রামেরই ছেলে, প্রাইমারি ইস্কুলের বিদ্যা নিয়ে সে কোন চাকরি পায়নি বলে নিরুপায় হয়ে ভ্যান রিকশ চালায়। তাকে দেখে গদাধর মনে একটু বল পেলেন; নিতাইকে বললেন, তোমার রিকশ কোন্‌টা? যাবে তো?

—যাবার জন্যেই তো বসে আছি। নিতাই বলল, দুপুরে খেতেও যাইনি। ভাবলাম রোদ পড়লে একেবারে যাবো। আপনারা এসেছেন ভালই হল। ভ্যানে গিয়ে বসুন—আমি একটা পান নিয়ে আসি।

নিতাই চলে যাবার পর সুধাময়ী বললেন, দু'বছর আগেও তো ভ্যান ছিল না। তখন পায়ে হেঁটেই আসতে হোত আমাদের। এখনকার বউদের কোন কষ্ট নেই। ভ্যানে বসলেই তো পৌঁছে যাবে আরামে।

গদাধর ভ্যানের সামনের কাঠে পা ঝুলিয়ে বসেছেন, সুধাময়ী ঠিক তাঁর পাশে। নিতাই এল ঠিক আধঘণ্টা পরে, মুখে তিনশ জর্দার পান। জিভ কেটে বলল, একটু দেরি হয়ে গেল! কী করব, খালি পেটে তো ভ্যান টানা যায় না—তাই একটু...

নিতাইয়ের মুখ দিয়ে দেশী মদের গন্ধ বেরচ্ছিল ভকভকিয়ে, গদাধর নাকে হাত দিয়ে ওর দিকে রুষ্ট চোখে তাকালেন। নিতাই ভ্রূক্ষেপহীন। প্যাডেলে চাপ দিয়ে সে বলল, আপনারা বাইরে গিয়ে ভালই করেছেন। গ্রামের অবস্থা এখন খুবই খারাপ! শুধু পার্টি-পলিটিক্স। গ্রামে এখন মানুষ মরলে শ্মশানে নিয়ে যাবার লোক পাওয়া যায় না। আগে খোঁজ নেওয়া হয়—যে মরেছে সে কোন্‌ পার্টির। ভিন পার্টি হলে কেউ তাকে ছোঁবেই না।

ভ্যান গড়াচ্ছিল দ্রুতগতিতে। এত খাওয়ার পরেও নিতাই তোয়াক্কাহীন শক্ত হাতে ধরেছে ভ্যান-রিকশার হ্যান্ডেল। গদাধর ওর রকম-সকম দেখে ভয় পেয়ে বললেন, আস্তে চালাও নিতাই। রাস্তা বেশি চওড়া নয়। বেসামাল হলে খালে নেমে যাবে রিকশা।

—আপনি ঘাবড়াবেন না, জ্যাঠাবাবু। নিতাই বেহেড মাতাল হলেও ওর জ্ঞানের নাড়ি টনটনে। দেখুন না, আধঘণ্টাতেই পৌঁছে দেব আপনাদের।

ভয়ে জড়োসড়ো গদাধর। মুখে কথা নেই। শুধু বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড়। কোনরকমে আঁকড়ে ধরেছেন লোহার রড।

নিতাই পিছন ফিরে বলল, ভয় পাবেন না। আমার ভ্যান রকেটের মত চলে। শুধু একবার পুকুরে পড়ে গিয়েছিল ভ্যানটা, এছাড়া আমার নামে কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। কথা শেষ করে নিতাই জোর গলায় হাসল। গদাধর উৎকণ্ঠিত চোখে দেখলেন, খালধারের ইটভাটায় কাজ হচ্ছে। আশেপাশের জমিগুলোয় বোরো চাষ হচ্ছে, শ্যালো মেসিনের ভটভট আওয়াজ দুপুরের নিস্তব্ধতাকে পরাজিত করে কানে বিঁধছে তীরের ফলার মত। আগে যেমন পাখি

ডাকত খালধারের বাব্‌লা গাছের ডালে বসে, এখন তা আগের মত আর শুনতে পান না গদাধর। নিতাই বেহুঁশের ঢঙে রিকশা চালাচ্ছে, মাঝে মাঝে পিছলে যাচ্ছে প্যাডেল, তাতে সে মোটেও শঙ্কিত নয়।

রিকশা এসে থামল খালধারের কেঠোপোলের কাছে। সুধাময়ীর দুটো পা-ই ঝিনঝিন্‌ করছিল, রিকশা থেকে নেমে তিনি অনেকক্ষণ হাঁটতে পারলেন না, নিতাই একটা দুর্বাঘাস ছিঁড়ে এনে বলল, এটা পায়ে জড়িয়ে নিন, দেখবেন ঝিনঝিনানী কমে যাবে।

সুধাময়ী মিষ্টি করে হাসলেন। নিতাইয়ের হাত থেকে দুর্বাঘাসের লতাটা নিয়ে উঁচু হয়ে বসে জড়িয়ে নিলেন পায়ের বুড়ো আঙুলে। ছোটবেলায় এমনই তো করতেন তিনি। গদাধর সুধাময়ীব কাণ্ড দেখে হাসলেন, মনে মনে মজাও পেলেন, নিতাইকে ভাড়া দিয়ে তিনি সুধাময়ীকে বললেন, চলো, এবার হাঁটা যাক।

সামনে ধান মাঠ। বোরো ধানে সবুজ হয়ে আছে মাঠ, জায়গায়-জায়গায় শ্যালোঘর, ইলেকট্রিকের থাম। পনের বছর আগেও এমনটা আশা করা ছিল মূর্খের স্বর্গে বাস করা। কত কী বদলে গেছে দ্রুত। সভ্যতার রথ ধানক্ষেতে চাকার দাগ বসিয়ে চলে গেছে আদি অনন্ত পথপরিক্রমায়। গদাধর স্বপ্ন দেখতেন গ্রামের প্রতিটা মানুষ স্বাবলম্বী হবে, হাসিখুশিতে ভরে উঠবে ওদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা। দুঃখ থাকবে না, হতাশাও ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রতিটি ঘর থেকে ভেসে আসবে ধোঁয়া ওঠা ভাতের গন্ধ, স্বাচ্ছন্দ্যের ঢেকুর। বোরো জমির আলে দাঁড়িয়ে সুধাময়ী অবাক কণ্ঠে বললেন, দেখ, এত গরমেও কেমন সবুজ হয়ে আছে মাঠগুলো। আমাদের সময়ে চাষের এমন সুযোগ-সুবিধা ছিল না. তখন এক ফসলেই মাঠ জিরোত বছরভর। এখন দেখ, কতগুলো চাষ হয় একটা জমিতে।

সুধাময়ীর বক্তব্যকে সমর্থন করলেন গদাধর. তখন সেচের এমন ঢালাও ব্যবস্থা ছিল না। এখন পাতাল ছেঁচে জল তুলছে চাষীরা। ইলেকট্রিকও এসে গিয়েছে মাঠে। সুইচ্‌ টিপলেই জল উঠছে মাটির নীচ থেকে।

—এদিকের জমির তাহলে অনেক দাম? সুধাময়ীর প্রশ্নে গদাধর অন্যমনস্ক চোখে তাকালেন, শুধু 'হ্যাঁ' সূচক ঘাড় নেড়ে উত্তর দিতে চাইলেন তিনি, সুধাময়ী আলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গদাধরের চোখের দিকে তাকালেন, তারপর সামান্য ঝাঁঝাল সুরে বললেন, এই পশ্চিম মাঠে আমাদেরও তো বিঘে কয়েক জমি ছিল. সেগুলো কি অমর সব কিনে নিয়েছে?

—হ্যাঁ। সে তো অনেক দিনের কথা। তোমাকে তো বলেই ছিলাম। গদাধর নীরস গলায় বোঝাতে চাইলেন, জমিগুলো বিক্রি করে ভালই করেছি। ফসলের ভাগ পেতাম না, শুধু শুধু মাটি ফেলে রেখে কী হোত? প্রতি বছরই তো অমর বলত, ধান ভাল হয়নি, এবার পোকায় সব খেয়ে নিল। কোনবার বলত—ধানে সব চিটে ধরে গেছে।

—অমর মিথ্যে কথা বলত। সুধাময়ীর গলা রুক্ষ হয়ে উঠল, ও আমাদের বছরের পর বছর ঠকিয়েছে। আমরা ওকে বিশ্বাস করে ঠকেছি।

—পুরনো কথা ভুলে যাও। গদাধর আপোষের গলায় বললেন, আজকাল জমি বাঁচানো খুবই কঠিন। অমর ছিল বলে জমিগুলো আমার রক্ষা পেয়েছে, না হলে কবে ভাগ-রেকর্ড হয়ে যেত।

—ভাগ-রেকর্ড হয়ে গেলেই বুঝি ভাল হোত।

—তুমি একথা বলছ কেন?

—বড্ড দুঃখে বলছি। নিজেদের লোক ঠকালে দুঃখ হয় কি না বলো? আমরা ভিটে ছাড়া হয়েছি পেটের দায়ে। তোমার যদি অতদূরে চাকরি না হোত তাহলে আমরা কি গ্রাম ছেড়ে যেতাম? কোন দিনও যেতাম না। সুধাময়ী সর্বস্ব হারানোর চোখে তাকালেন, সামান্য যা জমি ছিল অমর তা ভয় দেখিয়ে জলের দামে কিনে নিল। অথচ এখন এসব জমির কত দাম—শুনলে মাথা ঘুরে যাবে। গদাধর চুপ করে শুনলেন সব কথা, প্রতিবাদ করার ভাষা তার নেই। অমর নিজের রক্তের লোক হয়েও তাঁকে ঠকিয়েছে। চরম অর্থক্ষতি হয়েছে তাঁর। কিন্তু কীই বা করার আছে। দূরে থেকে জমি রক্ষা করা যাবে না। যুগ পাল্টেছে। পাল্টে গেছে মানুষ। অতি আপনজন আততায়ী হচ্ছে হরদম। এসবের খোঁজখবর রাখেন গদাধর। যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকুতে সুখী না হলে বিরোধ বাড়বে। বিরোধের পথে যেতে চান না তিনি। পুজোটা ভালোয় ভালোয় চুকে গেলে তিনি আবার শহরে ফিরে যাবেন। দুদিনের জন্যে এসে অশান্তি করা শোভনীয় নয়। এ গ্রামের সবাই অমরের পক্ষ নিয়ে কথা বলবে। অমরকে তারা ভয় করে। অমর যা বলবে তাই হবে। পুজো মিটে যাওয়ার পর সুধাময়ী হাঁপিয়ে উঠেছিলেন গ্রামে। অমরের স্ত্রী বিজয়া জোরাজুরি করে বলল, আর ক'দিন থেকে যাও জেঠিমা। তোমরা তো আসই না। এসেছ যখন তখন আর কটা দিন থাকতেই হবে। বিজয়ার কথায় আন্তরিকতার ছোঁয়া। মেয়েটা অমরের মত চালাক নয়। সরল-সাদাসিধে, দয়া-মায়া আছে শরীরে।

বিজয়ার অনুরোধে সুধাময়ী থেকে গেলেন আর ক'টা দিন। অমর পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরল; বড় গলায় বলল, জেঠিমা মাছগুলো তোমাদের পুকুর থেকেই ধরে আনলাম।

—আমাদের পুকুরের মাছ, কই দেখি! উৎসাহ ভরে মাছ দেখতে ঝুঁকে পড়লেন সুধাময়ী। বেশ বড় বড় কই, মাগুরমাছ খালুইয়ের ভেতর নড়ছিল। সুধাময়ী বললেন, পুকুরটায় আগে কত মাছ হোত। মাঠের মাছ সব এসে যেত পুকুরে। এখন কি তেমন মাছ আসে না?

অমর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এখন ধান মাঠে আগের মত মাছ হয় না। খাল শুকিয়ে যাচ্ছে। আগে তো খালের মাছ ধানমাঠ হয়ে পুকুরে ঢুকত।

—ওঃ। সুধাময়ী আবার ঢোক গিললেন। অমরের যুক্তি মনঃপুত হল না

তার। পাড়া-প্রতিবেশীরা তাকে অনেক কথাই বলেছে। কিছুদিন আগে অমর নাকি পুকুরের মাছ বিক্রি করে দিয়েছে। অথচ একবারও জানানোর প্রয়োজন মনে করল না। টাকাটা সুধাময়ী চাইতেন না। ভগবানের আশীর্বাদে তাঁর এখন টাকার প্রয়োজন নেই। অমরকে তিনি পুরো টাকাটাই দিয়ে দিতেন। কিন্তু এ কী করল অমর? খেতে বসে বিজয়া বলল, জেঠিমা, কাল তো চলে যাবে। চলো, আজ তোমার বসত বাড়িটা দেখে আসবে। কতদিন যাওনি বল তো!

সুধাময়ী অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়ে গেলেন যাবার জন্য। গদাধর চাকরি পাওয়ার পর সেই কবে গৃহছাড়া হয়েছেন, তারপর সময়ে-অসময়ে এসেছেন কয়েকবার। বন্যার পরে মাটির ঘরখানা মাটিতে মিশে গেল। বাঁশ-কাঠ খুলে নিয়ে গেল পাড়ার লোকে। খড় পচে সার হল মাটিতে। অমর চিঠি লিখেছিল, জেঠিমা, ঘরটাকে আর রক্ষা করা গেল না! তোমরা যখন বসবাস করবে না তখন ভাঙাঘরের পেছনে হাজার কয়েক টাকা খরচ করে কোন লাভ নেই।

অমর ঠিকই বলেছিল, মাটির ঘরে লোকজন না থাকলে ভিটেতে ঘাস গজাতে বাধ্য। এখন ঘর নেই, শুধু উঁচু হয়ে আছে ভিটেটা। ঘাস-আগাছায় ভর্তি। সন্ধ্যার পরে ওদিকে যেতে কেউ সাহস করে না। আগাছাগুলো মানুষের প্রশ্রয় পেয়ে ছাড়িয়ে গেছে মানুষকে। সুধাময়ী গত বছর মুনিষ করে আগাছা কাটিয়েছিলেন নিজে দাঁড়িয়ে। গদাধর তাঁর উৎসাহ দেখে সহাস্যে বলেছিলেন, তুমি কি আবার এখানে ফিরে আসতে চাও? তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলেছিলেন, তুমি ফিরে আসলেও ছেলে-মেয়েরা কেউ ফিরবে না। ওদের গায়ে শহরের হাওয়া লেগেছে। ওরা কি এই গ্রামে এসে থাকতে পারবে?

—কেউ থাকুক বা না থাকুক ভিটেবাড়ি পরিষ্কার রাখতে ক্ষতি কি?

এক বছর এদিকে পা রাখেননি সুধাময়ী।

বিজয়াকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যখন নিজের ভিটেয় এলেন তখন সদ্য শুরু হওয়া বিকেলের আলোয় চিনতে পারলেন না কোথায় ছিল তাঁদের মাটির ঘরখানা। আগাছারা বংশবিস্তার করেছে অপরাজেয় শক্তি নিয়ে। ঝোপঝাড় ঠেলে তবু এসে দাঁড়ালেন বুড়ো আমগাছটার তলায়। সেখান থেকে তিনি সোজা চলে এলেন পুকুরের উঁচু পাড়ে। ঘর লাগোয়া এই পুকুর কতকালের পুরানো। আগে এর জল ছিল আয়নার মত স্বচ্ছ। তীব্র খরায় জল শুকাত না পুকুরের। এত স্বচ্ছ, পরিষ্কার জল এ গ্রামের আর কোনো পুকুরে ছিল না। প্রতি বছর গদাধর মাছ ছাড়তেন। চারদিক থেকে আলো-বাতাস এসে পড়ত পুকুরের জলে। মাছ বাড়ত আশাতীত। এখন পুকুর আছে, কিন্তু কচুরিপানায় ভর্তি। নাব্যতা হারানোর ফলে আগাছারা চেপে ধরেছে জলাকে। ঘাটের কোনো চিহ্ন নেই। সবখানে পরিচর্যার অভাব। বিজয়া পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বলল, পুকুরটা যত্নের অভাবে শেষ হয়ে গেল। মানুষের মত পুকুরও মরে যায়—এ আমি জানতাম না! সুধাময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিজয়ার মুখের

দিকে তাকালেন, অমরকে বলেছিলাম, পুকুরটা কাটাতে—ও আর সময় পেল কই।

বিজয়া স্বামীর পক্ষ নিয়ে বলল, ওর সময়ের খুব অভাব। বাড়িতেই কম থাকে। পঞ্চায়েতের মেম্বার হওয়ার পর থেকে ওর খাওয়া-দাওয়ারও ঠিক নেই। একা মানুষ কত দিক আর সামলাবে।

—তা যা বলেছ! সুধাময়ী বিরক্তি চেপে রাখলেন বুকের গভীরে।

বিজয়া হয়ত বুঝতে পেরেছিল ক্ষোভটা, তাই যুক্তি খাড়া করে বলল, পুকুর কাটানোই দায় এখন। যা বড় বড় জোঁক আছে, লোকে নামতেই ভয় পায়।

—জোঁকগুলো আছে বলেই হয়ত এখনও কিছু মাছ বেঁচে আছে। না হলে কবে ধরে খেয়ে নিত।

বিজয়া বিপন্ন চোখে তাকাল। অমর বারবার করে নিষেধ করেছিল সুধাময়ীকে এখানে না আনার জন্য। নিজের ফাঁদে বিজয়া নিজেই জড়িয়ে পড়েছে। কিছু হয়ে গেল অসন্তুষ্ট অমর তাকে ছেড়ে কথা বলবে না।

সুধাময়ী আগাছা ঠেলে এগিয়ে গেলেন বাঁশঝাড়টার দিকে। বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে বাঁশঝাড়। কে বা কারা কেটে নিয়ে গেছে বাঁশ। বিজয়া চিন্তিত হয়ে বলল, গ্রামে চোরের উৎপাত বেড়েছে। বাঁশ তো প্রতি কাজে লাগে।

—তা বলে অমনভাবে কেটে নেবে? ওদের কি একটুও দয়া-মায়া নেই?

বিজয়া সুর মিলিয়ে বলল, দয়া-মায়া থাকলে কি এ কু'কাজ করে?

—অমর কি এদিকে একবারও আসে না?

—আসে তো, সময় পেলেই আসে।

—বাঁশগুলো চুরি হয়ে গেছে ও তো আমাদের জানায়নি। বিজয়া মুখে কুলুপ এঁটে সুধাময়ীর দিকে তাকাল। সে জানে—বাঁশগুলো অমরই বিক্রি করে দিয়েছে চড়া দামে। বাঁশ বিক্রির টাকায় বিজয়াকে কানের দুল কিনে দিয়েছে অমর। কিন্তু পুরো টাকা সে যে নিজেই আত্মসাৎ করেছে এটা বিজয়া জানত না। অমরের এই হীন মনোভাব, নীচতা বিজয়া মন থেকে মেনে নিতে পারল না। কিন্তু এই মুহূর্তে সুধাময়ীর সামনে তার কিছু বলারও নেই। স্বামীর নিন্দা করা স্ত্রীর শোভা পায় না।

বিজয়া মনে প্রাণে চাইল যত তাড়াতাড়ি সুধাময়ীকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে ততই তার পক্ষে মঙ্গল। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়লেই মুশকিল। সুধাময়ী ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর অতীতে। গদাধর যেদিন গ্রাম ছাড়লেন সেই দিনটার কথা বারবার মনে পড়ছিল তাঁর। গ্রামে হাজার অসুবিধা থাকলেও এখানেই তাঁর মনপ্রাণ পড়ে থাকে। স্বজন হারানোর ব্যথা অনুভব করেন তিনি। এখানে আসলে সেই পুরনো স্মৃতি বারংবার পীড়িত করে তাঁকে। মানসিক শান্তির জন্য এই মাটিই তো তাঁর গায়ে মাখা উচিত।

বিজয়া উশখুশিয়ে বলল, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। রাস্তাটা ভাল নয়। এবার আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত।

সুধাময়ী মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালেন, আলোর অস্বচ্ছতায় বিড়ম্বনা বোধ করলেন না তিনি। এখনও ভালমতন পথ ঘাট দেখা যায়। গাছের পাতায় অন্ধকারের কালচে আভা এসে লাগেনি। বিজয়া তবু অস্থির হয়ে বলল, চলো জেঠিমা, আর দেরি করা ঠিক হবে না।

সুধাময়ী নীরব চোখে তাকালেন।

ঘরের পিছনে তালগাছটাকে খুঁজছিলেন তিনি। ভাদ্র মাসে তাল পাকত, ঘরে শুয়ে তাল পড়ার শব্দ শুনতেন সুধাময়ী। এক ছুটে ঘরের বাইরে এসে তালটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার চলে আসতেন ঘরে। পাকা তালের গন্ধে ভরে থাকত ঘর। চাল বেটে পিঠে বানাতেন তিনি। কত রকমের পিঠে গদাধর তৃপ্তি সহকারে খেতেন।

দু-হাতের বেড়ে তালগাছটাকে ধরতে পারতেন না সুধাময়ী। এত মোটা ছিল তার গুঁড়ি। পাতাগুলো ছায়া দিত দশটা ছাতার মত। বাবুই পাখি বাসা বেঁধে দোল খেত হাওয়ায়। সুধাময়ী দেখতেন, সেই ছবি এখনও তাঁর চোখে আঁকা। গত বছর তালগাছটাকে কিনতে চেয়েছিল ডিঙা বানাবে বলে এক মহাজন। গদাধর বিক্রি করেননি। কত টাকাই বা পেতেন গাছটাকে বিক্রি করে। ভিটে বাড়ির প্রতিটা গাছেই জীবনের গল্প জড়িয়ে থাকে, অসময়ে যেখান থেকে সুগন্ধ বেরয়, আপ্লুত করে হৃদয়-মন। তালগাছটা দেখতে দেখতে আকাশের সীমানা ছুঁতে চায়, মিতালী পাতাতে চায় পাখ-পাখালির সঙ্গে। ঘরের পিছনে নাকি তালগাছ থাকা ভাল—এমনটা শুনেছিলেন গদাধর। আর সুধাময়ীরও বিশেষ দুর্বলতা ছিল গাছটার প্রতি।

গাছটাকে দেখতে না পেয়ে সুধাময়ী চিন্তিত চোখে তাকালেন। বিজয়া কাছে সরে এসে বলল, কি হয়েছে জেঠিমা?

—তালগাছটা ঘরের পিছনে ছিল, ওটা কই দেখছি না তো!

অমর সাইকেল নিয়ে খুঁজতে এসেছে ওদের। ওর হাতে তিন ব্যাটারীর টর্চ। সুধাময়ীকে ঝুঁকে পড়ে কিছু খুঁজতে দেখে সে অবাক গলায় শুধোল, কী হয়েছে জেঠিমা?

—তালগাছটাকে দেখছি না তো!

—তালগাছ! ও হো তালগাছটার কথা বলছো? ওটা তো গেল বর্ষায় মরে পচে গেছে!

—জলজ্যান্ত গাছটা মরে গেল!

—ওর মাথায় বাজ পড়েছিল। অমর অপ্রস্তুত গলায় বলল, গাছটা আর বাঁচল না। বর্ষায় পচে-গলে শেষ হয়ে গেল। সুধাময়ী নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না অমরের কথায়। ফাঁকিটা কানে বাজছিল ঝিঁঝি পোকার মত। অমরের চালাকি আর উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করলেন মনে মনে। রাগে লাল হয়ে উঠল তাঁর ফর্সা মুখমণ্ডল। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সামাল দিলেন তিনি। বিজয়া উদ্ভুত

পরিস্থিতিকে ঘোরাতে চাইছিল। সে অতি নিস্তেজ স্বরে বলল, জেঠিমা, চলো এবার ঘরে ফিরে যাই। জায়গাটায় সাপ-পোকা-মাকড়ের উৎপাত আছে। দুর্ঘটনা ঘটে যেতে কতক্ষণ।

একটা অলঙ্ঘনীয় জেদ সুধাময়ীর সমস্ত শরীর জুড়ে খেলা করছিল, তালগাছটার অকস্মাৎ মৃত্যু ভাবিয়ে তুলছিল তাঁকে। বাজ পড়ে অতবড় একটা তালগাছ মরে-পচে-গলে গেল এ সংবাদ তিনি পাড়ার কারোর মুখে শোনেননি, তাই প্রগাঢ় সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তিনি খুঁজতে থাকলেন তালগাছের সঠিক অবস্থানটা। জঙ্গলে সমাকীর্ণ ছিল চতুর্দিক। মাত্র ক'বছরের অযত্নে জায়গাটা একদিন বসবাসের যোগ্য ছিল বোঝাই যায় না। তবু হাতড়ে-হাতড়ে সুধাময়ী একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। পায়ে খোঁচা লাগতেই উবু হয়ে বসলেন ঝোপের মধ্যে। বিকেলের বিষণ্ণ আলোয় তাঁর বসে থাকার দুঃখী ভঙ্গিটা বড়ই মর্মান্তিক। বিজয়া এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল। আতঙ্কগ্রস্ত চোখ-মুখ তার। অমরও ভাষাহীন।

সুধাময়ী অনেকক্ষণ পরে বললেন, তালগাছের গোড়াটা আমি খুঁজে পেয়েছি! খড়কুটো দিয়ে ঢাকা ছিল গোড়াটা। আমার মনে হচ্ছে তালগাছটা মরেনি, কেউ ওটাকে কেটে নিয়ে গেছে।

অমর জোর গলায় বলল, তা হতেই পারে না।

সুধাময়ী এবার বিরক্তিভরা চোখে তাকালেন, দেখ তো বিজয়া, আমাব কথা সত্যি কী না? ভাল করে দেখো—মনে হচ্ছে তালগাছটাকে কেউ করাত দিয়ে কেটে নিয়ে গেছে। বেশিদিন আগের কাটা নয়, মনে হচ্ছে মাসখানেক আগের!

বিজয়া নিচু হয়ে তন্নিষ্ঠ চোখে তাকাল, অপরাধীর মত মুখ করে বলল, তোমার অনুমানই সত্যি। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব। বাজপড়া তালগাছটাকে কে কেটে নিয়ে যেতে পারে?

অমর ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে পাংশু চোখে তাকাল; সুধময়ীকে বলল, একটা তালগাছ নিয়ে অত ভাবলে চলে না জেঠিমা। এখন পার্টির যা উৎপাত যে কোনদিন তোমার ভিটেয় না ক্লাব করে বসে পাড়ার ছেলেরা। শুধু আমি আছি বলেই ওরা আমার মুখ চেয়ে কিছু বলে না।

সুধাময়ী অতি কষ্টে ঢোক গিললেন, অমরের দিকে অগ্নি নিক্ষিপ্ত চোখে তাকালেন, অমর তুই হয়তো জানিস না, ঐ তালগাছটার বয়স আর তোর বয়স প্রায় এক। যে বছর তোর জন্ম হয় সেই বছরই তালগাছটা ফুঁড়ে উঠল ঘরের পেছনে। তখন তোর মা বেঁচে ছিল। চারা তালগাছটা দেখে তারও খুশি ধরে না। আমাকে বলেছিল, দিদি. এই গাছটা দেখো অনেক বড় হবে। আমার অমরও অনেক বড় হবে!

—এসব কথা আমাকে শুনিয়ে কী হবে? তেতে উঠল অমর, তোমরা দু-দিনের জন্য ঘরে এসে অনেক কিছুই তদন্ত করে যাও। আমি যে কী কষ্টে

তোমাদের জমি-জমা সামলে রেখেছি তা আমি জানি। মাটি-গাছপালার উপর যদি এত মায়া থাকে তাহলে এখানে এসে ঘরে থাকো, কেউ তোমার একটা তুলসী পাতাও ছিঁড়বে না।

—তুই কি আমাদের পর? তোর ভরসায় তো সব কিছু ছেড়ে গেছি। এখন তুই যদি বলিস দেখতে পারব না তাহলে আলাদা কথা। অমর মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেও তার ভেতরে বিতৃষ্ণা জন্মাচ্ছে ধীরে ধীরে। বিজয়ার উপরেও তার কম রাগ নেই। বিজয়ার ছেলেমানুষীর জন্য আজ মুখোশ খুলে যেতে বসেছে। সামান্য একটা তালগাছ নিয়ে সুধাময়ী যা বাড়াবাড়ি করছেন তা ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেয় তার। সামান্য একটা তালগাছের জন্য সুধাময়ী যে নাটক করছেন তা গায়ে জ্বালা ধরায় অমরের। সুধাময়ীর যেন সদ্য সন্তানবিয়োগ ঘটেছে এমন অসহায় কান্নাসিক্ত কণ্ঠে বললেন, অমর, তোর যদি এতই টাকার দরকার ছিল তুই আমাকে জানাতে পারতিস। তালগাছটা না বেচলেও তোর সংসার ঠিক চলে যেত। কাজটা তুই ভাল করিসনি অমর। এর চেয়ে কুড়ুলটা যদি আমার বুকে মারতিস, এত কষ্ট পেতাম না। কথা শেষ হল না, হু-হু কান্নায় ভেঙে পড়লেন সুধাময়ী।

বিজয়া অবুঝের মত শুধোল, একটা তালগাছের জন্য তুমি কাঁদছ কেন জেঠিমা?

—হ্যাঁ কাঁদছি। না কেঁদে যে থাকতে পারছি না। সুধাময়ী ঘন ঘন চোখের জল মুছছিলেন, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছিলেন, তুমি তো এখনও মা হওনি, মা-হলে বুঝতে সন্তানের কত জ্বালা!

অমরের কালো মুখে মিশে যাচ্ছিল সন্ধ্যার ভুসো কালি। পালিয়ে বাঁচতে চাইছিল সে। কিন্তু কোথায় পালাবে? এই ঘাস-মাটি, লতায়-পাতায় কারোর কান্না মিশে আছে। এত কান্না কি মাড়িয়ে যাবার শক্তি আছে তার। মানুষ এক জীবনে একবিন্দু অশ্রুর ঋণ পরিশোধ করতে পারে না।

# গণা ঠাকুরের জীবনবৃত্তান্ত

বাস স্ট্যান্ডের ধারে গ্রহরাজ শনিদেবতার মন্দির। গণা ঠাকুর হল সেখানকার পুরোহিত এবং চৌকিদার, বলতে গেলে হোল-টাইমার। চাঁদা তুলে বাঁশের বাতা দিয়ে মন্দিরের চারপাশ ঘেরা। মাথার ওপর ভারি ত্রিপল, সেও চাঁদা তুলে কেনা। বাস মালিকরা বলেছেন, আসছে সাল শনি ঠাকুরের মন্দিরটা পাকা করে দেবেন তাঁরা। সেই থেকে আশায় আছে গণা ঠাকুর। মন্দিরটা শক্তপোক্ত হলে তারও একটা গতি হয়। বিশেষ করে শীত-বর্ষায় গণা ঠাকুরের কষ্ট হয় প্রচুর। বাঁশের বাতায় শীত আটকায় না, জল ঢুকে যায় হরদম। জলের ছাঁটে ভিজে যায় শনি ঠাকুরের দেহ, শীতের হিমবাতাস স্যাঁতসেঁতে করে দেয় গ্রহরাজের মুখ। তখন গণা ঠাকুর হাতজোড় করে আকাশের দিকে তাকায়, বিড় বিড় করে বলে, হে দয়াময় ঠাকুর, এবার তুমি নিজেকে নিজে বাঁচাও।

ঠাকুরের দয়ায় গণা ঠাকুরের বেঁচে থাকা। মাধ্যমিক পাস করার দশ বছর পরেও সে বেকার, তার নিজের দাদা লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা ফেঁদে দোতলা বাড়ি তুলল। গণাকে বলল, নিজেরটা নিজে করে খা। এ যুগে কে কার পেট পুষতে পারে বল্?

সেই থেকে দাদার ওপর তীব্র অভিমান গণার, প্রতিজ্ঞা করেছে মরে গেলেও সে আর দাদার বাড়ি যাবে না। জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনি গণা। উচ্চকূলে জন্ম হলেও ঠিকাদারের ইট বয়েছে সে। ক'মাস ধূপ বেচেছে বাসস্ট্যান্ডে। ডিটারজেন্ট পাউডার থেকে শুরু করে ফলের ব্যবসা—কোনোটাই তার ভাগ্য খোলার চাবিকাঠি হল না। আজকাল বিনা পুঁজিতে লাভের জল দাঁড়ায় না, অভাবের খরায় সেই জল শুকিয়ে হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়ে। গণার ভাগ্য ভুসোকালি দিয়ে লেখা, সোনা মুঠো করে ধরলে ছাই হয়ে যায় এমন তার কপাল। কতদিন আর টো-টো করে বাসস্ট্যান্ডে, অলিতে-গলিতে ঘুরবে? সন্ধ্যা-সকালে ভরা পেট ভাত না থাকলে শরীর চলে না। ক'দিন আর উপোস দেবে এই যুবক বয়সে? সাগর-ফেরত একজন সাধু আশ্রয় নিয়েছিল যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে। গণা শরণাপন্ন হয়েছিল তাঁর। দুঃখ-দুর্দশার কথা বলেছিল সবিস্তারে। তার ইচ্ছা ছিল সাধুবাবাজীর সঙ্গে হিমালয়ে চলে যাবে। সাধু তার চেহারার গড়ন দেখে বললেন, এই টিংটিংয়ে শরীর নিয়ে কি হিমালয়ে তপস্যা করতে যাওয়া যায় বাবা? তার চেয়ে তুমি দেশভূমিতেই থাক। এখানেই বেঁচে থাকার চেষ্টা কর।

গণা তাকে সবিনয়ে প্রশ্ন করেছিল, বাবাজী, এখানে থাকলে যে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে আমাকে। লেখাপড়া শিখেছি, চাকরি-বাকরি পাইনি, তা

বলে তো বাসস্ট্যান্ডে ভিক্ষা করতে পারব না। বাসের হেল্পারি করেছি বছর খানিক। সেই চাকরিটাও পেটের রোগের জন্য ছেড়ে দিতে হল। আমার যা শরীরের অবস্থা, হেভি কাজ আমার দ্বারা হবে না। পিতৃদত্ত প্রাণটা তাহলে কোনদিন বেঘোরে বেরিয়ে যাবে।

গাঁজার কলকের আগুন উড়িয়ে সাধুবাবাজী কপাল কুঁচকে বলেছিলেন, বেঁচে থাকার জন্য মানুষ চুরি ছাড়া যে কোনো কাজই কবতে পারে! তুমি তো ব্রাহ্মণের ছেলে। তুমি একটা কাজ কর। এই এত বড় বাসস্ট্যান্ডে শনি দেবতার মন্দির নেই। তুমি একটা শনিমন্দির স্থাপন কর। একটা মন্দির অবশ্যই একটা ক্ষুদ্র পেট চালিয়ে নিতে পারবে।

সেই প্রথম জীবিকার গুরুমন্ত্র কানে ঢুকিয়ে দিয়ে গেলেন সাধুবাবাজী, সেদিন থেকে গণাকে আর বসে থাকতে হয়নি। চাঁদা তুলে বাসস্ট্যান্ডের একধারে মন্দির স্থাপন করল সে। বাসের হেল্পার থেকে ড্রাইভার সবাই সাহায্য করল তাকে। দোকানদাররা দশ-বিশ টাকা চাঁদা দিল বিগ্রহ বানাতে। ওপরওলার দয়ায় সবকিছু হয়ে গেল ঠিক ঠিক। গণা চক্রবর্তী সেইদিন থেকে হয়ে গেল গণা ঠাকুর। শুধু পদবি নয়, বেশভূষা, চালচলন সবকিছুই বদলে ফেলল সে। টেরিকটের প্যান্ট ছেড়ে ফেলে সে পরল কোরা ধুতি। জামার বদলে গায়ে চাপাল ঢিলেঢালা ফতুয়া। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে সিঁদুরের তিলক। সারাক্ষণ অভ্যাস করল খালি পায়ে থাকার। বেশি কথা বলে না, সর্বক্ষণ আধ্যাত্মিক চিন্তা। প্রতি শনিবারে সে মাইক লাগিয়ে দেয় মন্দিরের সামনে. চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে শনির পাঁচালী। সন্ধের পরে বাস স্ট্যান্ডে থিকথিক করে ভিড়, তখন বাতাসা ছুড়ে দিয়ে সে ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে চেঁচায়, জয় বাবা শনি ঠাকুরের জয়! বাতাসা কুড়োবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায় সন্ধেবেলায়। প্রণামী বাক্সে প্রণামী দেয় ভক্তবৃন্দ। তারা জোড়হাতে শনি ঠাকুরের কাছে মানত করে। মনোবাসনা পূর্ণ হলে আবার ফিরে আসে পুজো দিতে। গণা ঠাকুর দর্শনার্থীদের মাথায় ঠাকুরের ফুল-বেলপাতা ঠেকায়। আদায় করে নেয় সম্ভ্রম. ভক্তি-শ্রদ্ধা। সেইসঙ্গে অল্প কিছু প্রণামী।

বাবা শনি ঠাকুরের দয়ায় তার চলছিল ভালোই. কিন্তু বাদ সাধল শরীব। সারাদিন মন্দিরে পড়ে থেকে শরীর একটুও বিশ্রাম পায় না। শুধু রাত ছাড়া তার বিশ্রাম নেবার ফুরসৎ নেই। যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে দিনের বেলায় ঘুমালে প্যাসেঞ্জাররা উঠিয়ে দেয়, গালিগালাজ করে। রাত দশটার পরে লোক যাতায়াত কমে যায় বাসস্ট্যান্ডে। তখন বিছানা বগলদাবা করে গণা ঠাকুর যায় ঘুমোতে। কতক্ষণ আর ঘুম হয়? ভোর চারটেয় ফার্স্ট কার ছাড়ে। সেই সময়ে ভুঁড়িওলা পুলিসটা এসে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। গালি দিয়ে বলে, তুমি পুরোহিত মানুষ. তোমার কি এত ঘুমালে চলে? যাও, ঘুরে ঘুরে ভোরবেলায় ঠাকুরের জন্য ফুল তোল। ঠাকুরের নামগান কর।

রাগে গা চিড়বিড় করলেও গণা ঠাকুরের প্রতিবাদ করার কোনো মুখ নেই। পুলিসের সাথে লড়াই-বিবাদ করে কেউ কি পেরেছে কোনোদিন? এই তো মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে থানার জিপ এসে বাতাগুলো উপড়ে ফেলে দিল বাসস্ট্যান্ডের মাঠে। হুমকি দিয়ে বলে গেল, খবরদার এখানে যেন মন্দির না ওঠে। পাবলিক প্লেসে কোনোরকম দখলবাজি আমরা পছন্দ করব না।

গণা ভেবেছিল তার ভাগ্য আবার ভাঙল, মাথায় হাত দিয়ে সে ছুটে গিয়েছিল বাসকর্মচারী ইউনিয়নের এক দাদার কাছে। সব শুনে ইউনিয়নের নেতা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, মন্দির ভাঙা চলবে না। পাবলিক প্লেসে মন্দির থাকবে না তো কি বেশ্যাখানা থাকবে? চল তো দেখি কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে গুনে আসি।

হুড-খোলা জিপে সেই প্রথম চেপেছিল গণা ঠাকুর। বুকের ভেতর ভয়ের পাখিটা লাফাচ্ছিল হরদম। থানার ওসির রুলের বাড়ি এর আগে সে দু'বার খেয়েছে। দাগ মেলাতে সময় নিয়েছিল পাক্কা সাত দিন। আজ তার ভয় করলেও রুলের বাড়ি খাওয়ার ভয় নেই। সে তো এখন গণা চক্রবর্তী নয়, বাসস্ট্যান্ডের শনি মন্দিরের প্রাণকর্তা গণা ঠাকুর।

চাপের মুখে থানার ওসি নিমরাজি হয়ে বললেন, ঠিক আছে, আপনারা যখন সাপোর্ট করছেন তখন পাবলিক প্লেসে মন্দির হলে আমারও কোনো আপত্তি নেই। তবে আপনাদের কথা দিতে হবে—মন্দিরের পেছনে রাতের অন্ধকারে চোলাই-গাঁজার কারবার চলবে না। যদি কোনোদিন আমার নজরে পড়ে তাহলে সবার আগে আমি এই ছোকরা পুরুতকে অ্যারেস্ট করব। আমার কাছে ল অ্যান্ড অর্ডার সবার আগে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে সবার আগে গণা চলে যায় চোখ-মুখ ধুতে কলে। সেখানে থেকে সোজা চলে যায় পাবলিক পায়খানায়। ওখান থেকে ফিরে স্নানপর্ব। তারপর ফুল তোলা, মন্দির ঝাঁট দেওয়া, বাসি ফুলের ডাঁই নর্দমায় ফেলে আসা। এসব করতে গিয়ে ন'টা বেজে যায় তার। অফিস টাইমে সদাসতর্ক থাকতে হয় প্রণামীর পয়সা কুড়োবার জন্য। শনিবার দিন সকাল থেকেই তার নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না। সেদিন সাধারণ মানুষের মধ্যেও ভক্তিরস উথলে ওঠে। ওই বিশেষ দিনটাতে কেউ আর দূর থেকে প্রণাম ছুড়ে দিয়ে চলে যায় না। শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ ভক্তিভরে দাঁড়িয়ে পড়ে মন্দিরের সামনে। হাত কপালে ঠেকিয়ে দীর্ঘ সময় বিড়বিড় করে তারা। তখন গণা লক্ষ্য করে দেখেছে তাদের চোখ-মুখ কত করুণ। নানাবিধ সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা আর্জি জানায় গ্রহরাজের কাছে। শনিবারে গ্রহরাজের সেবার জন্য দশ-বিশ পয়সার খুচরো খুব কম পড়ে, বেশির ভাগ মানুষই সিকি-আধুলির কমে দান করে না। কেউ কেউ মনের আবেগে দু-পাঁচ টাকাও দিয়ে দেয়। শনিবার দিন দুপুরবেলায় গণা মাছ-ভাত খায় হোটেলে। রবিবারে খায় মাংস।

মন আর শরীর ভালো থাকলে সে প্রতি সপ্তাহে দুটো সিনেমা দেখবেই। সিনেমা দেখলে তার মন চাঙ্গা থাকে, তখন শরীরের অসুখবিসুখগুলো কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয় সে নিজেও জানে না। বয়সের তাপ-উত্তাপ তাকেও গ্রাস করে। মেয়েরা পুজো দিতে এলে গণা ঠাকুরের চোখ চলে যাবে মেয়েদের মুখের ওপর। ভেতর থেকে তখন অন্য একটা 'গণা' বলে উঠবে—ছিঃ ছিঃ, এ তুমি কি করছ? তুমি না শনিঠাকুরের পুরোহিত? তোমার চোখ যদি নদীর ঢেউয়ের মতো উতলা হয় তাহলে কীভাবে চলবে? নিজেকে সামলাও নাহলে বিপদ তোমার ঘনিয়ে আসছে।

গণা ঠাকুরের ভীতু স্বভাব, মুহূর্তে চোখ নামিয়ে নিয়ে নাক-কান মুলে হাতজোড় করে বলেবে—হে বাবা শনিঠাকুর, আমার অপরাধ নিয়ো না। আমি কি দেখতে চেয়েছি, চোখ আমাকে দেখাচ্ছে। তুমি আমার চোখকে বশে রাখ ঠাকুর। আমার যৌবনকালের টগবগে ফুটন্ত রক্তকে তুমি সংযম শোখাও।

শনিমন্দিরের বয়স হল দেড় বছর। এব মধ্যেই ঘুণ ধরেছে বাঁশের বাতায়। রাতের বেলায় ঘুণপোকাগুলো উগলে দেয় বাঁশের ধুলো। গরমকালে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে শুতে যায় না গণাঠাকুর। মন্দিরের সামনে বিছানা পেতে শুয়ে থাকে। ঠিক রাত দশটার সময়ে সুরভি ঘরে ফেরে মন্দিরের সামনের পথটা দিয়ে। ফেরার সময়ে ও প্রণাম করতে ভুল করে না। সে যায় রোজ দুপুরে। তখন মন্দিরের আশেপাশে কেউ থাকে না। হোটেল থেকে ভাত খেয়ে এসে গণা ঠাকুর শনিঠাকুরের সামনে এসে ঝিমোয়। সুরভি প্রণাম করে পয়সা ছুড়ে দিলে রোজই টং করে শব্দ হয় অ্যালুমিনিয়ামের থালায়। ভাতঘুমের ঘোরটা ভেঙে যায় তখন। চোখ ডলে নিয়ে গণা ঠাকুর দেখে, একটা রোগা টিংটিংয়ে মেয়ে চোখ বন্ধ করে হাত বুকের কাছে রেখে খুবই ভক্তি সহযোগে কী যেন বলছে। প্রায় মিনিট খানেক মেয়েটো প্রার্থনা জানাবে রোজ। রাতে ফেবার সময়েও সেই একই দৃশ্য।

ওই রোগা মেয়েটার নাম হল সুরভি। সে রোজ যায় প্লাস্টিক কারখানায় কাজ করতে। তার বেশির ভাগ দিনই ইভিনিং-শিফ্‌ট্‌। রাত করে তাই ঘরে ফেরে।

গণা ঠাকুর মেয়েটার সঙ্গে যেচে আলাপ করেছিল একদিন। ওই রোগা মেয়েটাই পাতলা ঠোঁট নাড়িয়ে আধো গলায় বলেছিল, আমার নাম সুরভি। আমি থাকি বাস-স্ট্যান্ডের পেছনের বস্তিটায়। বাবা বুড়ো হয়েছে, কাজ করতে পারে না। আমার মা নেই, ভাই বোনও কেউ নেই। বাবাই আমার সব। প্লাস্টিক কারখানায় আমাকে ছ'শো টাকা বেতন দেয়, তাতে আমাদের সংসার কোনোমতে টেনে-টুনে চলে যায়।

সুরভি কথা বলা শেষ করলে গণা ঠাকুর মেয়েটার শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে কল্পনার জাল বোনে। জ্ঞান হবার পর থেকে তার অভাব-অনটনের সঙ্গে

আত্মীয়তা। বাবা-মা এক বছরের মধ্যে পরপারে চলে গেলেন। চালাকচতুর বড়দা ব্যবসায় নামল বাবার জমানো সামান্য সঞ্চয় নিয়ে। সে দিনরাত ব্যবসা নিয়ে থাকত, গণার দিকে নজর দেবার তার সময় ছিল না। দিন চলে গেল, সাত ঘাটের জল খেয়ে গণা এখন শনি ঠাকুরের পাহারাদার, তার এখন মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতে ওই মন্দির।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুরভি শুধোল, আপনার দাদা তো বড়লোক, আপনি কেন দাদার কাছে থাকেন না?

কষ্টের হাসি হেসে গণা ঠাকুর বলল, টাকা যার দাদা তার আমার টাকা নেই, দাদা তাই পর হয়েছে। দাদা সম্পর্ক রাখতে চায় না আমার সঙ্গে। তার এখন মহাজনদের সঙ্গে ওঠা বসা। আমি দীনজন, কে আমার খোঁজ রাখবে!

—মাঝে মাঝে যাওয়া-আসার পথে আমি আপনার খোঁজ নিয়ে যাব।

সুরভি মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল কথাটা। গণা ঠাকুর সেই নিষ্প্রভ, করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তাহলে খুব ভালো হয়। এক দুঃখীই তো আর এক দুঃখীর মন বোঝে।

সুরভি খোঁজখবর নিত প্রায়দিন। রবিবার তার কারখানা বন্ধ। সেদিন সে আসত না। ওই একটা দিন সুরভিকে না দেখলে দম বন্ধ হয়ে যেত গণা ঠাকুরের, শনি মন্দিরের ঝাঁপ বন্ধ করে সে চলে যেত পাশের বস্তিটায়। হাঁ করে তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে থাকত সে। যদি একবার সুরভির সাথে দেখা হয়ে যায় তাহলে ভাববে সে লটারি পেয়েছে। কোনদিনই সুরভির সঙ্গে দেখা হয়নি তার। হ্যাংলার মতো সেও বেশক্ষিণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। সে শনিমন্দিরের পুরোহিত, তার পক্ষে এমন আচরণ কি শোভা পায়? ফলে মন খারাপ করে ফিরে আসত সে। মনে মনে ভাবত, এবার সুরভির ঠিকানাটা জেনে নেবে। দায়ে-আদায়ে কাজে লাগবে।

সুরভি রোগা হলেও তার চোখ দুটো ছিল টানাটানা, মুখের হাসিটাও ছিল নয়নকাড়া। মাথাভর্তি চুল ছিল তার। এই চুল নিয়ে তার গর্বও কম ছিল না। সে রোজই ক্ষোভের সঙ্গে বলত, ভগবান চুল দিয়েছে একমাথা, কিন্তু চুলের যত্ন নেবার সামর্থ্য দিল না।

গণা ঠাকুর সুযোগ পেয়ে বলত, এই টাকা কটা রাখ, একটা সুগন্ধি তেল কিনে নিয়ো।

—আপনারা টাকা আমি কেন নিতে যাব, আপনি আমার কে হন?

—ভাব, আমি তোমার পরিচিত। গণা ঠাকুর ঢোক গিলে সুরভির ঘেমে ওঠা বিব্রত মুখখানার দিকে তাকাত, তোমার কষ্টের কথা আমি বুঝি। শনিঠাকুরকে ডাক, বাবা গ্রহরাজ তোমার সব কষ্ট দূর করে দেবে।

—সেইজন্যেই তো রোজ আমি এই পথ দিয়ে যাই। সুরভি চটপট বলত, গ্রহরাজের মুখ দর্শন করে গেলে কারখানায় আমি বকা খাই না।

গণা ঠাকুর প্রণামীর পয়সাগুলো জমিয়ে রাখত টিনের কৌটোয়। নিজের ভাঙাচোরা মুখখানার দিকে তাকিয়ে যৌবন চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেত। পাড় ভেঙে পড়ার শব্দের চেয়েও মারাত্মক সেই শব্দ। এই বয়সে অনেকেই ঘরসংসার স্ত্রী পুত্রের অধিকারী হয়। সবাই যা পায়, সে কেন পাবে না? গ্রহরাজ সুরভিকে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সুরভি সবদিক থেকে তার মনের মতো। সামনের রবিবারে সে সুরভিকে নিয়ে সিনেমায় যাবে। পাশাপাশি বসে সুরভির হাতটা ছুঁয়ে দেখবে। নিশ্চয়ই হাতটা সরিয়ে নেবে না সে। যদি না নেয় তাহলে শো ভাঙার পর গঙ্গার ধারের রেস্টুরেন্টটায় গিয়ে মশলা ধোসা খাবে। তারপর গঙ্গার পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে একসময়ে সে বলে দেবে তার মনের কথা– সুরভি, চল আমরা ঘর বাঁধি আরো দশ-পাঁচ জনের মতো। এত বড় জীবন, একা থাকতে ভালো লাগে না।

গণা ঠাকুর তার মনের কথা বলতে পারেনি সুরভিকে। তার আগেই পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় সে ধড়-ছেঁড়া মোরগের মতো ছটফট করে শনিমন্দিরের সামনের মাঠটায়। চেনা-জানা বাস কর্মচারীরা তাকে পৌঁছে দেয় হাসপাতালে। পরের দিন তাকে শোওয়ানো হয় অপারেশন টেবিলে। জ্ঞান ফেরে তার একদিন পরে। আরো তিন মাস হাসপাতালে থেকে সে একদিন ছাড়া পেল। ফিরে এসে দেখল, তার প্রতিষ্ঠিত শনিমন্দির চলে গিয়েছে অন্যের দখলে। বাস-স্ট্যান্ডের এক দোকানদারের ভাই অজয় হয়েছে শনিমন্দিরের মালিক।

গণা ঠাকুর আবার দ্বারস্থ হল বাসকর্মচারী ইউনিয়নের কর্ণধারের। পেটের কাটা দাগটা দেখিয়ে সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—পল্টুদা, এই অবস্থা নিয়ে আমি এখন কোথায় দাঁড়াব? ভারি কাজ করার আমার ক্ষমতা নেই। আমি সাচ্চা গ্রহরাজের ভক্ত, আমাকে গ্রহরাজের সেবা করার চান্স না দিলে বাসের নিচে গলা দিতে হবে আমাকে।

পল্টুবাবু শনিঠাকুরের ভক্ত। তিনি সুবিচার করে বললেন, ঠিক আছে তোমরা দুজনেই থাক। মন্দির থেকে যা আয় হবে তোমরা ভাগাভাগি করে নিও। ফারদার আমি আর কোনো কমপ্লেন শুনতে চাই না। ঝগড়া অশান্তি হলে আমি দু'জনকেই ঘাড় ধরে বের করে দেব।

অজয় আর গণা ঠাকুর শনি ঠাকুরের দু'দিকে বিছানা পেতে শুয়ে থাকে খোলা আকাশের নিচে। প্রায় দিনই প্রণামীর পয়সা নিয়ে ওদের খিটিমিটি লাগে। এসব সংবাদ পল্টুবাবুর কান অবধি পৌঁছোয় না।

গণা ঠাকুর মনে মনে ভেবেছে, সে মন্দিরের হক ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে. কিন্তু যেতে পারছে না শুধু সুরভির জন্য। হাসপাতাল থেকে ফেরার পরও সুরভির সঙ্গে দেখা হল না। অনেকদিন হল সুরভি এ পথ দিয়ে যাতায়াত করে না। কেন যায় না সুরভি এর সঠিক কারণ গণা ঠাকুর জানে না। তার মনে শুধু একটাই চিন্তা, মেয়েটা ভালো আছে তো! অজয় একদিন প্রণামীর

পয়সায় ভরপেট চোলাই মেরে এসে শুধোল—গণাদা, তুমি সর্বক্ষণ কী ভাব বল তো?

গণা ঠাকুর চুপ করে থাকল।

অজয় মুখোমুখি বসে বলল, সত্যি করে বল তো গণাদা, কে তোমার মন হরণ করেছে?

গণা ঠাকুর অজয়ের মুখের দিকে তাকাল—ভয়ে ভয়ে বলল, পল্টুবাবুকে বলবি না তো? আমার লাইফ হিস্ট্রি মাইরি প্যাথেটিক। সুরভি রোজ যেত শনি মন্দিরের পথ দিয়ে। আমার সাথে ভাব হয়েছিল মেয়েটার। ভেবেছিলাম তাকে নিয়ে আমি একদিন সিনেমায় যাব। কিন্তু ব্যাড লাক। তার আগেই আমার পেটের পেনটা শুরু হয়ে গেল। পেট কেটে ফিরে এসে দেখলাম ভো কাট্টা।

—ঘাবড়িয়ো না, ঠাকুরের কাছে মানত কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

এতদিন যা করেনি গণা ঠাকুর, শনিবারের বারবেলায় গ্রহরাজের সামনে দাঁড়িয়ে জোড়হাতে সে তা-ই করল। বলল, হে শনি ঠাকুর, আমার সুরভিকে ফিরিয়ে দাও। পাঁচ টাকার বাতাসা দেব তোমাকে। তোমার সেই বাতাসা পুরো বাসস্ট্যান্ডের লোককে আমি খাওয়াব।

এক শনিবারে মানত, অন্য শনিবারে ফিরে এল সুরভি। গণা হাঁ-মুগ্ধ চোখে দেখল, সুরভির কপালে সিঁদুরের গোল্লা আঁকা, ঠাস-ঘন চুলের সিঁথিতে সিঁদুরের আলপথ। দু'হাতের সাদা শাঁখা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বাস স্ট্যান্ডের আলোয়।

সুরভির পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল গণার মতোই রোগা খিটখিটে একজন যুবক। ঠাকুরের ফুল হাতে নিয়ে গণা আর এগিয়ে যেতে পারল না তাদের দিকে। শরীর-চোঁয়ানো ঘামে ভিজে যাচ্ছিল সে। নদীর পাড় ভেঙে পড়ার শব্দ উঠে আসছিল তার শীর্ণ বুক থেকে।

ওরা চলে যাবার পর গণা অজয়কে বলল—যাই, পাঁচ টাকার বাতাসা কিনে আনি। পেটের ব্যথাটা যদি আজ রাতে বাড়ে তাহলে আর শনিঠাকুরের পুজো দিতে পারব না।

রাতের আকাশে মলিন চাঁদ খেলে বেড়ায়, গণা ঠাকুর ঘুমহীন চোখে দেখে গ্রহরাজের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়া ফুলগুলো। নৈবেদ্যের ফুল তবু সুরভি ছড়াতে কৃপণতা করে না। সারারাত ফুলের গন্ধ নাকে পুরে নিয়ে একসময়ে গণা ঠাকুর ঘুমিয়ে পড়ে আর একটা লড়াই-মুখর নতুন দিনের আশায়।

# প্রহ্লাদ কথা

ঘরের সামনে মোরাম ফেলা দশ ফুটের রাস্তা। রাস্তার বাঁ দিকে বিশাল অশ্বত্থ গাছে একটু হাওয়া লাগলেই ঝড়ের শব্দ হয়, জানলার শিক ধরে মন্মথ তাকিয়ে থাকে ঢেউ খেলান তেল চকচকে লম্বা বোঁটাযুক্ত পাতাগুলোর দিকে। রমা মারা যাওয়ার পর থেকে এই দু'কামরার ঘর তার কাছে জেলখানা। চার ছেলে বিয়ে করে আলাদা হয়ে গিয়েছে অনেক আগে, তাদের কেউই আর এখন খোঁজখবর নেয় না। মন্মথ প্রাতঃভ্রমণ সেরে নিজের হাতে জলখাবার বানায়, দুধ চা খেলে বুক জ্বালা পোড়া করে, তাই র-চা বানিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বাইরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। রমা থাকলে সময়টা তার অন্যভাবে কাটত। অন্তত কথা বলে তার সঙ্গে সময় কাটাতে পারত। রমা যে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে মন্মথ স্বপ্নেও তা ভাবেনি। সে চলে যাওয়ার পরে তার বুক ফাঁকা হয়ে গেল। এখন অশ্বত্থ গাছটার দিকে তাকিয়ে তার সময় কাটে, হাওয়ায় কাঁপা মসৃণ পাতাগুলো তার মনে ভয়ের চামর দুলিয়ে দেয়। কাল দুপুরে এই অশ্বত্থ গাছে একটা ঢোঁড়াসাপ উঠেছিল পাখির ডিম খেতে, কাকের দল কীভাবে টের পেয়ে যেতেই হৈ-হুল্লোড় বাঁধল। অগুনতি কাক উড়ে এল আকাশে চক্কর কেটে, কালো ডানার ছায়ায় সবুজ ঢেকে যাবার উপক্রম হল। শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াসাপের সঙ্গে কাকের দল লড়াই করে জিতে গেল। বেচারি ঢোঁড়াসাপ সুড়সুড় করে নেমে ঢুকে গেল পাশের ঝোপে। এরকম কিছু না কিছু কাণ্ড ঐ বড় গাছটাকে ঘিরে সর্বক্ষণ ঘটে চলেছে, তার সিকি ভাগ অংশ মন্মথর নজরে পড়ে। রান্নাবান্নার ঝামেলা অনেক, তাতে কিছু সময় ব্যয় হয়। রমা বেঁচে থাকাকালীন কয়লা ভেঙে আঁচ ধরাত, ধোঁয়ায় ভরে যেত ঘর, আঁচ না উঠলে পাখার বাতাস করত একনাগাড়ে। শিককাঠি দিয়ে বানান উনুনটা রান্নাঘরে পড়ে আছে অনাদরে, মন্মথ আঁচ ধরাতে জানে না। সে একটা জনতা স্টোভ কিনে এনেছে। দুবেলা স্টোভ ধরিয়ে সে রান্না করে। ইচ্ছে করলে সে একটা রান্নার লোক রাখতে পারত। কিন্তু মন সায় দিল না। বাইরের লোকের সংস্রব সে এড়িয়ে চলতে চায়। কারোর সঙ্গে বেশি মাখামাখি মেলামেশা সে পছন্দ করে না। মানুষের সঙ্গে মিশে সে অনেক আঘাত পেয়েছে। তখন অবশ্য আঘাত সহ্য করার বয়স ছিল। এখন সে বয়স আর নেই। এখন একা থাকলে তার মন খারাপ করে না বরং একটা প্রতিরোধের ক্ষমতা গড়ে ওঠে। রমা চলে গেছে তিন বছর হয়ে গেল। চাকরি থেকে সে অবসর নিয়েছে দশ বছর। তখন চার ছেলে তার সঙ্গে থাকত। সবাই ভেবে ছিল, চাকরির টাকা মন্মথ ওদের হাতে তুলে দেবে। মোটামুটি ভাল পদে চাকরি করত সে। নগদ আড়াই লাখ টাকা এককালীন হাতে পেল। এছাড়াও

আছে মাসে মাসে পেনশন। মন্মথ ভেবেছিল চার ছেলেকে সমান ভাগে ভাগ করে দেবে টাকাগুলো। তার টাকা, স্থাবর-অস্থাবর সব কিছুই তো ছেলেদেরই প্রাপ্য। সে তার মনোভাব বদলাতে বাধ্য হল পি-এফ সেকসানের বৃন্দাবনবাবুর শোচনীয় হাল দেখে। অবসর নেওয়ার পরেও বৃন্দাবনবাবু কাজে অকাজে অফিসে আসতেন, কথাবার্তা গল্পগুজব করে আবার চলে যেতেন। একদিন তাকে দেখে বাস্তবিক দুঃখ পেল মন্মথ। বৃন্দাবনবাবু তার কাছে পাঁচ টাকা ধার চাইলেন। সারাদিন কিছু খাননি। ছেলে-বউ যুক্তি করে তাড়িয়ে দিয়েছে ঘর থেকে। বলেছে, ঘরে আসলে মেরে ঠ্যাং ভেঙে শুইয়ে রাখবো। ভয়ে তিনি আর ঘরে ফিরতে পারছেন না। তাঁর একমাত্র ছেলে নাকি টাকা পয়সা সব হাতিয়ে নিয়ে লেজে খেলাচ্ছে তাঁকে। পাঁচ টাকা বৃন্দাবনবাবুর হাতে দিয়েছিল মন্মথ, তাঁর দুঃস্থ বিপর্যস্ত চেহারা দেখে জোর করে হোটেলে নিয়ে গিয়ে ভাত খাওয়াল। খাওয়ার পরে বৃন্দাবনবাবু একটা বিড়ি ধরিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন, আপনার তো রিটায়ারমেন্টের দু-মাস বাকি। আপনাকে একটা কথা বলি, অন্যভাবে নেবেন না। রিটায়ারমেন্টের সময় যে টাকাগুলো পাবেন সেগুলো নিজের নামে রাখবেন। ভুল করেও ক্যাশ টাকা ছেলেদের হাতে দেবেন না। যদি দেন তাহলে আমার মত অবস্থা হবে বলে দিচ্ছি। দু-দিন খাতির যত্ন করে ছেলে আমার সব টাকা নিয়ে নিল ব্যবসা করবে বলে। এখন মুখে মুখ ঠেকে গেলেও সে আমাকে চেনে না। শুধু তাই নয়, সে চায় আমি যেন এঘর ছেড়ে পালাই। এই শেষ বয়সে আমি কোথায় যাই বলুন তো? তাই তো পাগলের মত ঘুরছি যদি কোথাও একটা আশ্রয় পাই।

বৃন্দাবনবাবুর সঙ্গে এ ঘটনার মাস দুয়েক পরে দেখা হয়েছিল রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। তাঁর সেই আগের নাদুস-নুদুস গোলগাল চেহারা আর নেই। মাত্র ক'দিনেই বয়স বেড়ে গেছে দশ বছর। মন্মথকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে তিনি হাত ধরলেন, পাঁচটা টাকা পকেট থেকে বের করে বললেন, আপনার টাকাটা আর ফেরত দেওয়া হয়নি। আমি অনেক দিন অফিসের দিকে যাইনি। দেখা হয়ে ভালই হল। টাকাটা রাখুন।

মন্মথবাবু টাকাটা নিতে রাজি না হওয়ায় বৃন্দাবনবাবু আর জোর করলেন না, হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন একটা সিমেন্টের বেঞ্চির কাছে। পাশাপাশি বসে বললেন, আমার আর কোন সমস্যা নেই। ছেলে তো টাকাগুলো নিয়ে আর দিল না। ও একটা রাজদূত মোটর সাইকেল কিনেছে। বুড়ো বয়সে আমি পায়ে হেঁটে ঘুরছি। ভাড়াবাড়িতে থাকি। কেননা আমার আদি বাড়িটা আমি ছেলের নামে লিখে দিয়েছিলাম।

—তাহলে ভাল আর কোথায় আছেন? আপনার সমস্যা তো থেকেই গিয়েছে? মন্মথর প্রশ্ন শুনে পানসে হেসে বৃন্দাবনবাবু আসল কথাটা বলেছিলেন, কী বলেন মশাই ভাল নেই? টাকা গিয়েছে জানি তবু এখন আমি

আমার নিজের স্বাধীনমত চলি। যা পেনসন পাই তাতে ঘরভাড়া দিয়ে, খাওয়া খরচ বাদ দিয়েও কিছু বাঁচে। এখন আর আমাকে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় না। বউমার মুখ ঝামটা শুনতে হয় না।

—তাহলে চেহারাটা অমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন?

—চেহারা শুকিয়ে যাচ্ছে টাকার শোকে। সারা জীবনের ইনকাম, নিজের ছেলে ফুঁসলিয়ে কেড়ে নিল। ঐ টাকাগুলো যদি ডাকাতি কিংবা ছিনতাই হয়ে যেত তাহলে আমি এত ভেঙে পড়তাম না। ছেলে যদি ডাকত হয়—ভাবব না বলুন?

অশ্বত্থগাছের দিকে তাকিয়ে বৃন্দাবনবাবুর কথাগুলোই মনে পড়ছিল মন্মথর। এ যুগে কাকে বিশ্বাস করবে সে। ছোট ছেলে রামকৃষ্ণ তাকে একটু আধটু দেখত। রমার শ্রাদ্ধের সময় সে এসে বলল, বাবা লাখখানেক টাকা দাও। আমি জেরক্স মেসিন বসাব। আমার কোম্পানিতে লক আউট চলছে। এখন খুব ট্রাবল।

রামকৃষ্ণকে টাকাটা দিয়ে দিত মন্মথ। কিন্তু মেজ ছেলে জয়কৃষ্ণ জানতে পেরে বলল, বাবা, তোমার টাকায় আমাদের চারজনের সমান ভাগ। টাকা তুমি নয়-ছয় করতে পারবে না। যদি দিতে হয় তো চারভাইকে সমান ভাগে ভাগ করে দাও। নাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে।

মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ছেলেরা যে টাকা নিয়ে এত নীচে নেমে যেতে পারে এটা ধারণার বাইরে ছিল মন্মথর। শেষ পর্যন্ত টাকা সে কাউকেই দিল না। ওরা রাগ করে মুখ ফুলিয়ে চলে গেল। গিয়ে ভালই হয়েছে। না গেলে জ্বলে পুড়ে মরতে হোত মন্মথকে। সে হয়ত পাগল হয়ে যেত ওদের অত্যাচারে। ওরা হয়ত মাথায় উঠে চুল ছিঁড়ত। মন্মথ সে সুযোগ তাদের দেয়নি। কোনদিন দেবে না। বৃন্দাবনবাবু তাকে আসল শিক্ষাটা দিয়ে গেছেন। নিজে ভিখারি হয়ে অন্যের ঝোলা ভরতে পারবে না। তার মৃত্যুর পরে যা টাকা আছে তা ওরা সমানভাবে পাবে। তখন দেখতে আসবে না। কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকবে, একটা ফুটোকড়িও সে ছেলেদের হাতে তুলে দেবে না।

অশ্বত্থগাছে আবার হাওয়া এসে আছড়ে পড়ল। আবার উৎফুল্লিত হয়ে উঠল গাছের পাতা। আবার কানে ভেসে এল ঝড়ের আওয়াজ। শক্ত হাতে জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকল মন্মথ। যত ঝড়ই আসুক সে ভেঙে পড়বে না। সামলাবে। কঠিন হাতে, পাকা বুদ্ধির জোরে সামলাবে। মনে যার এত সাহস সে কেন কুলকুল করে ঘামছে? কেন কপাল চুঁইয়ে ঘামের ধারা নেমে আসছে মুখের উপর? বুকের ভেতরটা কি খুব বেশি লাফাচ্ছে না। আজ প্রাতঃ ভ্রমণের সময় বিপদের গন্ধ সে পেয়েছে। রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হল ক্লাবের সামনে। ছেলেটা ঘ্যাঁচ করে সাইকেলের ব্রেক মেরে দাঁড়াল, আর একটু হলে

মন্মথর গায়ের উপর আছড়ে পড়ত। কিছুটা তফাত-এ সরে গিয়ে মন্মথ জিজ্ঞাসা করেছিল, সাইকেলটা কি আমার গায়ে চাপিয়ে দিবি নাকি?

রাগে গরগরিয়ে উঠেছিল রামকৃষ্ণ, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছিল, তুমি শুনলাম স্টেশনের ধারের জমিটা বিক্রি করে দিয়েছ?

একটু ভেবে নিয়ে মন্মথ বলেছিল, হ্যাঁ, তাতে তোর কী? আমার জমি আমি বিক্রির করলাম-কিংবা দান করলাম—এতে তোদের কী আসে যায়?

—আসে যায় বৈকি! দাদারা ব্যাপারটা জানতে পেরেছে। তারা এটাকে ভাল চোখে নেয়নি। সবাই তোমার উপর ভীষণ রেগে আছে। রামকৃষ্ণ গলা নরম করে বলেছিল, স্টেশন এরিয়ার জমি আরও চড়া দামে বিক্রি করা যেত। তুমি যদি আমাদের একটু খবর দিতে তাহলে তোমাকে আর ঠকতে হত না।

—আমি যা পেয়েছি তাতেই সন্তুষ্ট। মন্মথ পাশ কাটিয়ে চলে আসতে চাইল। রামকৃষ্ণ ভিখারী চোখে তাকাল, বাবা, আমার কেসটা একটু বিবেচনা করে দেখো। তোমার এত টাকা-পয়সা থাকতে আমি ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছি।

—তোদের আমি খেয়ে না খেয়ে মানুষ করেছি, আর আমি তোদের দেখব না। এবার যে যারটা করে খা।

রামকৃষ্ণ চালাক-চতুর, সে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, তোমার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হয়। মন করলে তুমি আমাদের কাছে এসে থাকতে পার। তোমার বউমা ঝগড়ুটে নয়। তার মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আছে। সে বড়ঘরের মেয়ে, তার মন অত ছোট নয়।

—সে আমি জানি বাবা। বড় ঘরের মেয়ে বলেই তো জ্বরের সময় আমাকে ভুল ওষুধ খাইয়ে মারতে চেয়েছিল। আমি তো ভাগ্যের জোরে বেঁচে গিয়েছি।

—ওটা একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তুমি ওটাকেই ধরে বসে থাকবে! রামকৃষ্ণের চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল, ছ'কাটা জমির দাম দেড় লাখ টাকা। এত টাকা তুমি কী করবে?

—টাকা দিয়ে আমি কী করব, সে হিসাব আমি তোদের দেব না। যা সরে যা। আমাকে যেতে দে। একরকম রামকৃষ্ণকে ঠেলা মেরে সরিয়ে মন্মথ উঠে এসেছিল রাস্তায়। ছোটছেলের চাহনিটা তার ভাল লাগেনি। অমন ডাকাতের মত লাল চোখ করে দেখার অর্থ? ভাবতে গেলেই আবার ঘাম ঝরে পড়ে কপাল বেয়ে। দিনে দিনে কত কী যে দেখতে হবে তাকে? বৃন্দাবনবাবুর কপালে যেমন সুখ নেই, তার কপালেও বুঝি সুখ লেখা নেই। নাহলে অত সুন্দর স্টেশনের পাশের জমিটা তাকে কেন বিক্রি করে দিতে হল? বহু কষ্ট করে ছ'কাঠা জমি কিনেছিল সে। ভেবেছিল চার ছেলেকে নিয়ে ওখানেই উঠে যাবে বাড়ি তৈরি করে। সেই স্বপ্ন তার পূরণ হয়নি। কুড়ি বছর আগে কেনা জমিটার বর্তমান দাম অনেক চড়া। মাত্র পঁচিশ হাজার টাকায় কেনা জমি সে বিক্রি করে দিল দেড় লাখ টাকায়। এত টাকা নিয়ে সে কী করবে? প্রথমেই তার মনে হল অশ্বত্থগাছটা

ভাল মতন সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দেবে। দুটো টিউবওয়েল বসাবে ক্লাবের সামনে। ওখানে বিকেলে বাচ্চারা খেলাধুলা করে হাঁপিয়ে ওঠে। জল খেতে গেলে ওদের অনেকটা দূরে যেতে হয়। আর যা টাকা থাকবে তা দিয়ে ছোট্ট মতন একটা পার্ক বানিয়ে দেবে ঘরের সামনের জমিটায়। সেই পার্কের নাম রাখবে 'রমা শিশু উদ্যান'। তার এত কষ্টের টাকা সে নয়ছয় হতে দেবে না। বড় ছেলে প্রতি সন্ধ্যায় মদের আড্ডায় গিয়ে বসে। জুয়া-তাস-মদ সব তাতেই সে সমান দক্ষ। ইদানীং পার্টি-পলিটিক্স করছে। সেজ ছেলের মাছের কারবার। দীঘা থেকে লরি ভরে মাছ এনে শহরতলির বাজারগুলোতে চড়া দামে বিক্রি করে। তার একটা নিজস্ব ট্রাক কেনার সখ। সেও বার কতক আসা-যাওয়া করেছে মন্মথর ঘরে। কিন্তু ঐ যাওয়া-আসাই সার। কাজের কাজ কেউ কিছু করতে পারেনি। চার ছেলের চার রকমের আব্দার। ওদের দাবি মেটাতে গেলে পথে বসতে হবে তাকে। জ্ঞানত পথে বসতে চায় না মন্মথ। সে তার আয়ের একটা পয়সাও ছেলেদের স্ফূর্তি করার জন্য দিয়ে যাবে না। সমাজকল্যাণমূলক কাজে তার পয়সা ব্যয় হোক তার মৃত্যু পরে। এই মর্মে সে একটি উইল তৈরি করেছে পাড়ার এক নামকরা উকিলের কাছে গিয়ে। এই সংবাদটাও জেনে গিয়েছে ওরা চারজন। সেই থেকে ওরা জ্বলছে তেলেবেগুনে। রামকৃষ্ণই জয়কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে বিজয়কৃষ্ণ আর হরিকৃষ্ণের বাড়ি থেকে ঘুরে এল। ওরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করল। শেষে এই সিদ্ধান্তে এল যে বাবা পাগল হয়ে গিয়েছে। পাগলকে বেঁধে না রাখলে, উপযুক্ত শাস্তি না দিলে যে কোন দিন সব লণ্ডভণ্ড করে দেবে। ওরা ঠিক করল সবাই মিলে যাবে বাবার কাছে। প্রথমে তারা বোঝাবে। তাতে ফল না হলে গায়ের জোরে টাকা কেড়ে আনবে। বাবার টাকা পয়সায় ছেলেদেরই অধিকার থাকে। পাড়ার লোকেরা কেউ কিছু বলারই সাহস পাবে না।

মন্মথর কানে গিয়েছে ওদের শলাপরামর্শ, সেই থেকে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে সে। সত্যি সত্যি ওরা যদি চলে আসে দল বেঁধে তাহলে এই বয়সে ওদের সঙ্গে সে কি পেরে উঠবে? ওরা চারজন. সে একা। সে তো এখন বৃদ্ধ। রাস্তার ওপিঠের অশ্বত্থগাছটার মত তার এবড়ো-খেবড়ো চেহারা। চার চারটে শক্ত ডাল শাখা-প্রশাখা বিছিয়ে উঠে গিয়েছে উপরে। ঐ ডাল চারটের শক্তি নিয়েই তো বৃদ্ধ গাছ বেঁচে আছে। গাছের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা তার নিজের জীবনের ক্ষেত্রে হল না কেন? চার ছেলেকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছিল সে। ওরা কেউই উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী ছিল না। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই ওরা কেমন বদলে গেল। কেউ চাইল তার চাকরি, কেউ চাইল তার টাকা-পয়সা। মানুষ হবার বদলে তারা এক-একটা অমানুষ হয়ে গেল। ওদের বিশ্বাস নেই। ওরা যে কোন মুহূর্তে স্বার্থে ঘা লাগলে জ্বলে উঠতে পারে। খেতে বসে ভয়ে ভালমত খেতে পারল না মন্মথ। বারবার চার ছেলের মুখ ভেসে উঠল। এই খরার দিনে

ওরাও তেতে আছে। যে কোন মুহূর্তে দরজায় কড়া নাড়তে পারে। মন্মথ ভাবল সামনের দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে সে পিছন দিক থেকে ঢুকে এসে ঘরে বসে থাকবে। পরক্ষণেই সে ভাবল এই ভীরুতার কাজ সে কোন করতে যাবে? সে তো কাউকে খুন করে পালিয়ে আসেনি? ছেলেরা যদি আসে তো আসুক। সে ওদের বোঝাবে। তেমন বুঝলে পাড়ার লোক ডেকে সুবিচার চাইবে। আশে পাশের সবাই জানে তার চার ছেলের কারবার। ওরা তাদের সমর্থন করবে না কিছুতেই।

শনিবারের বারবেলায় জমি বিক্রির টাকাটা দিয়ে গেল ঘরে এসে। এরকমই কথা হয়েছিল। একটা দিন টাকাটা ঘরে রেখে সোমবারে টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা করে দিত মন্মথ। এত টাকা এক সঙ্গে কোন দিন সে ঘরে রাখতে পারেনি। ছাপোষা কেরানির চাকরি করে শেষে বড়বাবুর প্রমোশন পেয়েছিল। মাস গেলে কত আর টাকা পেত! রমা বলত, বেতনের টাকা ঘরে একদিন রাখবে। তারপর যাকে যা দিতে হয় দেবে। তোমার বেতনের পুরো টাকা গুনতে আমার ভীষণ ভাল লাগে। মনে হয় আমিই বুঝি চাকরি করে নিয়ে এলাম।

মন্মথ রমাকে অবাক করে দিয়ে বলত, এই সামান্য কটা টাকা গুনে আর কী সুখ পাবে? রিটায়ারমেন্টের পুরো টাকা আমি তোমার হাতে দিয়ে দেব। তখন তুমি মনের সুখে গুনবে। তোমার সময় কেটে যাবে। রমা মুখ ভরিয়ে হাসত। সে স্বপ্ন তার আর পূরণ হয়নি। চেকে পেমেন্ট হয়েছিল মন্মথর। সেই ছাপান, সুদৃশ্য কাগজটা রমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে মন্মথ বলেছিল, এই নাও তোমার টাকা! বার বার করে পড়ো। দেখ কোন সুখ পাও কিনা!

রমাও রসিকতা করতে ছাড়ল না, এ তো কাগজ! কাগজ নিয়ে আমি কী করব? রমার শেষ ইচ্ছাপূরণ করতে পারেনি মন্মথ। জমি বিক্রির টাকাগুলো সে তাই এক দিনের জন্য রেখে দিতে চেয়েছিল রমার ফটোর উপর। মাত্র তো একটা দিনের কথা। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। অথচ এরই মধ্যে যত ঝামেলা, গণ্ডগোল। ওরা জেনে গেছে টাকার সংবাদ। তাহলে কি টাকারও অদৃশ্য ঘ্রাণশক্তি আছে, যা শুঁকে শুঁকে এগিয়ে আসে টাকা শিকারীর দল, চোর ছ্যাচড় পকেটমারেরা। টাকাটা ঘরে না রাখলে মন্মথর আর কোন চিন্তা ছিল না। টাকা ঘরে রেখে সে যেন ফ্যাসাদ ডেকে এনেছে। আবেগের বশে কাজটা সে ভাল করেনি বুঝতে পারল। গরম হাওয়া না এলেও জানলা-দরজা বন্ধ করে দিল সে। কারেন্ট নেই, গরমে হাঁপিয়ে উঠল। কষ্ট হল। কষ্ট হলেও শুধু একটা দিনের জন্য এই কষ্ট তাকে সহ্য করতে হবে। ছেলেরা যদি আসে, দূর থেকে জানলা-দরজা বন্ধ দেখে ফিরে যাবে। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ঘেমে নেয়ে একসা হল মন্মথ। বিকেল হতে এখনও অনেক দেরি। রোদ মরে গেলে ঘরে তালা চাবি লাগিয়ে সে বেরিয়ে পড়বে অবসরপ্রাপ্ত একদল মানুষের সঙ্গে ঘুরতে। রোজই যায়। ঐটুকু সময়ই যা তার ভাল কাটে। মানুষের সঙ্গ ছাড়া কি মানুষ বাঁচতে পারে?

ছেলেরা কেউ তার দায়-দায়িত্ব নিতে চাইল না। যারা নিতে চাইল তারা তো তাকে নয় টাকাকে ভালবেসে বলেছে ওসব। ঘেন্না ধরে যায় মনে। এসব ভাবলে তার চুলের গোড়াগুলো ব্যথায় টনটন করে ওঠে। কপালের বয়স্ক শিরাগুলো ফুলে ওঠে। মাথার ভেতরে দপদপানি শুরু হয়। এই নোংরা সম্পর্কের উপর তার কোন মোহ নেই। সে একা থাকবে। একাই চলে যাবে। তার কষ্টার্জিত অর্থ দশজনের সেবায় লাগলে তার আত্মা সুখী হবে। হঠাৎ দরজায় কিসের শব্দ হলো। মন্মথর বুক ধড়াস করে উঠল। ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে সে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। কান খাড়া করে শুনতে চাইল কথাবার্তা। না, হাওয়ার শব্দ ছাড়া বাইরে আর কোন শব্দ নেই। তাহলে হাওয়া তামাশা করে মানুষের সঙ্গে সময় বুঝে? মনে মনে হেসে উঠল মন্মথ। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য তার ভীষণ আফসোস হল। কাল সকাল হলেই তার প্রথম কাজ হবে টাকাগুলো ব্যাঙ্কে রেখে আসা। এতগুলো টাকা ঘরে রাখার ঝুঁকি না নিলেই বুঝি সে ভাল করত।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল তবু মন্মথর ইচ্ছা করল না বেড়াতে যাবার। দম বন্ধ হয়ে আসা ঘরে সে বুঝি আরাম পাচ্ছিল। টাকার উত্তাপে মানুষ বুঝি এরকমই কুঁড়ে হয়ে যায়। কোথাও না গেলে রমার সঙ্গে একান্তে কথা বলে মন্মথ।

—শুনছ! মন্মথর ঠোঁট নড়ে উঠল।

—কী বলছ? রমা বলল।

—তোমার ছেলেরা আমাকে আজ শাসিয়েছে।

—ওরা কি শুধু আমার ছেলে, তোমার নয়?

—না, তা বলছি না। মন্মথর ঠোঁটে কাঁপন শুরু হল, তুমি তো ওদের গর্ভে ধরে ছিলে। তোমার গর্ভজাত সন্তান কেন বিপথগামী হল?

রমা একইভাবে শুধোল, তোমার ঔরসজাত সন্তান কেন অমানুষ হল? আমার খুব কান্না পায়, সেইজন্য আমি দিনরাত কাঁদছি। তোমাকে একা ছেড়ে এসে আমার মন স্থিতু হতে পারছে না। তুমি কি আসবে?

ভয়ে দরদরিয়ে কেঁপে উঠল মন্মথ। আজকাল সে বড্ড কথায় কথায় ঘেমে ওঠে। একী বলছে রমা? এই পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ ছেড়ে সে কেন চলে যাবে? যেতে তো হবেই কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন?

মন্মথর চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। দরজায় কড়া নাড়ছে কারা? কারা ডাকছে, বাবা, দরজা খোল।

কাঁপা কাঁপা পায়ে এগিয়ে গেল মন্মথ। আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে চতুর্দিক জুড়ে। অশ্বত্থগাছের পাতায় দমকা হাওয়া আটকে গিয়ে শনশনানো ঝড়ের শব্দ হচ্ছে। এত হাওয়া তবু কেন ঘামছে সে? মন্মথর গলা শুকিয়ে গেল। কোনমতে জিজ্ঞাসা করল, তোরা এই সাঁঝবেলায়?

—তোমাকে দেখতে এলাম। অনেক দিন আসা হয়নি তো। বিজয়কৃষ্ণ বলল।

রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করল, বাবা তোমার শরীর ভাল আছে তো? দরজা খুলতে এত দেরি হল, কী করছিলে?

জয়কৃষ্ণ বলল, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলাম, আমাদের কি ভেতরে ঢুকতে দেবে না?

—আজ আমার শরীরটা ভাল নেই, তোরা ফিরে যা। কাল সন্ধেবেলায় আসিস। কাল তোদের সঙ্গে কথা বলব। মন্মথর কণ্ঠস্বর নিজের কানেই ভার শুনল। বিজয়কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে বলল, তোমার যখন শরীর খারাপ তখন তোমাকে একা ছেড়ে তো যেতে পারি না। সেটা খারাপ দেখায়। আজ আমরা তোমার কাছে থাকব। মন্মথকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিয়ে বিজয়কৃষ্ণ ঘরের ভেতর ঢুকে এল। আর একটু হলে দেওয়ালে মাথা ঠুকে যেত মন্মথর. কোনমতে সামলে নিয়ে সে বলল, তোরা কিসের জন্য এসেছিস তাড়াতাড়ি বলে ফেল। আমাকে একটু বেরতে হবে। থানার ওসির কোয়ার্টারে নেমতন্ন আছে। আজ তার ছেলেব বিয়ে। আমার যেতে দেরি হলে তিনি জিপ নিয়ে চলে আসবেন।

—আসতে দাও। আমরা কি তাকে ভয় পাই? জয়কৃষ্ণ ঠোঁটের ফাঁকে হেসে উঠল, আমরা বেশিক্ষণ তোমার সময় নষ্ট করব না। তাড়াতাড়ি চলে যাব যদি তাড়াতাড়ি তুমি আমাদের দিয়ে দাও। মন্মথর রক্ত চলকে উঠল সহসা, গলা শুকিয়ে এলেও থুতু দিয়ে সে গলাটা ভিজিয়ে নিল, কী দেব তোদের? ফ্যালফ্যাল করে সে তাকাল। বারবার ঢোক গিললেন। রামকৃষ্ণ ফুঁসে উঠল তার ভনিতা দেখে, ন্যাকা চৈতন্য। কিছু জান না বুঝি? আমরা তোমার কাছে টাকার জন্য এসেছি। জমি বিক্রির টাকাগুলো তুমি আমাদের দিয়ে দাও।

—সে টাকা তো আমি ব্যাঙ্কে রেখে এসেছি। মন্মথ নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল।

বিজয়কৃষ্ণ রক্তচক্ষু দেখিয়ে ধমকে উঠল, গুরুজন হয়ে মিথ্যা কথা বলছ তোমার লজ্জা লাগছে না? টাকাটা ভালোয় ভালোয় দিয়ে দাও। আমরা চলে যাব।

—বললাম তো টাকাটা আমি ব্যাঙ্কে রেখে এসেছি। মন্মথ জোর দিয়ে বোঝাতে চাইল, এত টাকা কেউ কি বোকার মত ঘরে রেখে দেয়? আমি কি পাগল?

—শনিবারের সন্ধ্যায় ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল। টাকাটা তুমি ব্যাঙ্কে রাখতে পারনি। আমরা সব খোঁজ নিয়েই এসেছি, হরিকৃষ্ণ সবাইকে সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, আমাদেব কাছে চালাকি কবতে যেও না তাহলে জানে মারা পড়বে। আমরা চাই না রক্তপাত ঘটুক। হাজার হোক তুমি আমাদের বাবা। গায়ে হাত তুলে আমরা তোমাকে অপমান করতে চাই না।

—অপমানের আর বাকি কী থাকল? মন্মথ একটা কাঠের চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিয়ে বসে পড়ল। তার মাথায় আর কোন বুদ্ধির উদয় হল না। বিজয়কৃষ্ণ তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, আলমারির চাবিটা দাও। কষ্ট করে তুমি যদি টাকাটা না দিতে পার তাহলে আমরাই বের করে নিচ্ছি।

—আলমারির চাবি আমি দেব না। প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল মন্মথ, আমার অত কষ্টের টাকা, আমি কোন তোদের দিতে যাব?

—না দিলে টাকাও যাবে, প্রাণও যাবে। রামকৃষ্ণ সক্রোধে চুলের মুঠি চেপে ধরল, তুমি যা হারামি লোক, সোজা কথায় মাল ছাড়বে না দেখছি। অ্যায় সেজদা, আয় তো ব্যাটাকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেল। ওরা তৈরি হয়েই এসেছিল। ব্যাগ থেকে দড়ি বের করে আষ্টেপৃষ্ঠে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধল মন্মথকে। বাধা দিতে গিয়েও ব্যর্থ হল সে। চিৎকার করে উঠল প্রতিবাদ জানিয়ে। তখনি তার মুখে গামছা গুঁজে দিল বিজয়কৃষ্ণ। গোঙানির শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল। বিজয়কৃষ্ণ তার লোমশ হাত দিয়ে সজোরে টিপে ধরল মন্মথর গলা, ঘড়ঘড় আওয়াজে ঘর ভরে ওঠার আগেই নেতিয়ে গেল মাথা। মৃদু একবার ঝাঁকুনি দিয়ে উড়ে গেল প্রাণপাখি। বিজয়কৃষ্ণের চোখে-মুখে ভয়ের সর বিছিয়ে গেল। মুখের গামছাটা খুলে নিয়ে বিজয়কৃষ্ণ খুবই ঘাবড়ে যাওয়া গলায় বলল, কাজ ফিনিশ। এবার লাশটাকে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া যাক। লোকে ভাববে বাবা মনের দুঃখে আত্মহত্যা করেছে। কেউ আমাদের সন্দেহই করতে পারবে না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর আলমারির চাবিটা খুঁজে পেল রামকৃষ্ণ। চাবি ঘুরিয়ে আলমারি খুলল সে দক্ষ হাতে। মায়ের কাচ বাঁধান ফটোটা আলমারিতে সযত্নে রাখা ছিল। রমার বুকের উপর টাকার পুঁটলিটা দেখে খুবই অবাক হল সে। ফিসফিসিয়ে ডাকল সবাইকে। তিনজন এল। টাকার পুঁটলিটা দেখে লোভে চকচকিয়ে উঠল চোখ। ভাগ-বাটোয়ারা শেষ হতেই ওরা চলে গেল যে যার ঘরে।

বিজয়কৃষ্ণের বড় ছেলে চিৎকার করে পড়ছিল, মরে পুত্র জনকের পাপে। কথাটা কানে খটকা লাগল বিজয়কৃষ্ণের। মনে মনে সে ভাবল, মরে জনক পুত্রের পাপে। গা শিউরে উঠল তার। ছেলেটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে, পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাহি পরম তপঃ। মানেটা বুঝতে পারছিল না ক্লাস নাইনের ছেলেটা।

বিজয়কৃষ্ণকে বলল, বাবা এর মানেটা বুঝিয়ে দাও তো?

বিজয়কৃষ্ণ কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, বাবা আমাদের ধর্ম, বাবা আমাদের কাছে স্বর্গ সমান। বাবাকে সর্বদা ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে পুজো করতে হয়।

ছেলেটা কেমন অবাক চোখে প্রশ্ন ঝুলিয়ে তাকাল, তুমি তোমার বাবাকে তো ভালবাস না? সব সময় তো দাদুকে গাল-মন্দ করো। কেন করো বাবা? দাদু তো কোন দোষ করেনি?

ঠাস করে ছেলের গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিল বিজয়কৃষ্ণ। তারপর খুবই বিব্রত হয়ে বলল, বড়দের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় ইস্কুলে শেখায়নি বুঝি।

ছেলেটি মুখ কালো করে বইয়ের পড়ায় ডুবে গেল।

অনেক রাতে বিজয়কৃষ্ণের যখন ঘুম আসছিল না তখন তার স্ত্রী ইরা বলল, শেষ পর্যন্ত টাকার জন্য তোমরা চার ভাইয়ে মিলে বাবাকে খুন করে ফেললে? তোমার পাশে শুতে আমার ভয় করছে। টাকার জন্য যারা নির্দ্বিধায় মানুষ খুন করতে পারে তাদের আমি বিশ্বাস করব কীভাবে।

বিছানায় কথা কাটাকাটি হল ওদের। ছেলেটা বিছানার এক পাশে শুয়ে ঘুম ভাঙা চোখে শুনল সব। তার দাদু যে এ পৃথিবীতে নেই এই ভেবে তার কিশোর হৃদয় ডুকরে উঠল। ইরা মাদুর নিয়ে আলাদা বিছানা পাতল মেঝেয়। বিজয়কৃষ্ণ তাকে বাধা দিতে গেলে ইরা ঘৃণার সঙ্গে বলল, একটা খুনির পাশে শুতে আমার ঘেন্না হয়। ছিঃ ছিঃ, মানুষ যে এত নীচে নামতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

—ইরা, তুমি বোঝার চেষ্টা করো। আমি যা কিছু করেছি সব তোমাদের মুখ চেয়ে। এ পাপ শুধু আমার একার নয়, আমাদের সকলের।

বিজয়কৃষ্ণের মুখের উপর ইরা জবাব দিল, তোমার পাপের ভাগীদার আমরা কেন হতে যাব? তোমার ঐ টাকা আমি ছুঁয়েও দেখব না। তোমার টাকা নিয়ে তুমি সুখে থাক। কালই আমি বাপের বাড়ি চলে যাব।

ভোর হওয়ার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল বিজয়কৃষ্ণের একমাত্র ছেলে চয়ন। চপ্পলটা পায়ে গলিয়ে সে ছুটতে ছুটতে চলে গেল থানায়। সারা রাত সে ভেবেছে পাঠ্যপুস্তকের লেখা কখনও ভুল হতে পারে না। অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তৃণ সমদহে। এই ভাব-সম্প্রসারণটা সে বারবার করে পড়েছে। বইয়ের পড়া কখনো ভুল হতে পারে না। থানার জিপে চড়ে চয়ন যখন তাদের বাড়ির সামনে এল তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি বিজয়কৃষ্ণ। দারোগাবাবুর ডাকে সে বিছানা ছাড়ল ধড়ফড়িয়ে। এ ঘটনার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না বিজয়কৃষ্ণ। চয়নের দিকে সে রুষ্ট চোখে তাকাল। বিজয়কৃষ্ণের হাতে হ্যান্ডকাপ পরালেন দারোগাবাবু, ধমক দিয়ে বললেন, গাড়িতে উঠুন! আপনারা যে নৃশংস কাজ করেছেন তা সারা বিশ্বের পিতা-পুত্রের মধুর সম্পর্কটাকে বিষিয়ে দেবে। ভবিষ্যৎ-এ যাতে এমন ঘটনা না ঘটে তার জন্য আপনাদের চার ভাইয়ের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার। তিনি জিপে ওঠার আগে চয়নের কাঁধে স্নেহের হাতখানা রাখলেন, মৃদু চাপ দিয়ে বললেন, তোমার মত ছেলেরা আছে বলেই আমরা এখনও নিজেদের মানুষ হিসেবে গর্ববোধ করতে পারি। তুমি হলে দৈত্যকুলে জন্ম নেওয়া প্রহ্লাদ। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তোমার এই মনোভাব যেন হারিয়ে না যায়।

থানার জিপটা চলে যেতেই ইরা আর দশ-পাঁচটা বউয়ের মত কাঁদল না, সগর্বে ছেলেকে টেনে নিল বুকের ভেতর। গর্বিত গলায় বলল, তুই আমার মুখ রেখেছিস চয়ন। আজ এই বিপদের দিনে আমি তোর মুখ চেয়ে বাঁচব।

# মরা চাঁদ

হাত ফসকে কাচের গ্লাসটা ভেঙে যেতেই সরসী কাচুমাচু মুখে ভাঙা কাচের টুকরোগুলোর দিকে তাকাল। জল ভরে এল চোখে। হাত-পা এমন কী বুকের চারপাশ কেঁপে উঠল থরথরিয়ে। কোনমতে সে প্রহ্লাদের দিকে ভয় ভরা চোখে তাকাল। প্রহ্লাদের রাগ দুনিয়া কাঁপান। রেগে গেলে তার জ্ঞানগম্যি থাকে না। রক্ত উঠে আসে মাথার তালুতে। সেই রক্তের ছাপ ফুটে ওঠে চোখে। কালচে মুখটা নিমেষে হয়ে ওঠে ভেজিয়াল মাগুর মাছ। চোখের নিচের মাংসগুলো কাঁপতে থাকে থরথরিয়ে। চায়ের কাপটা নামিয়ে প্রহ্লাদ আগুন উগরান চোখে সরসীর দিকে তাকাল। রাগে তার মুখ দিয়ে কথা বেরল না, শুধু গরগর একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। সরসী আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টায় গেল না, উবু হয়ে বসে কাচের টুকরোগুলো কুড়াতে থাকল আনমনে। প্রহ্লাদ একটা বিড়ি ধরিয়ে সেই একই ভঙ্গিতে সরসীর দিকে তাকাল, গলা খেকারি দিয়ে বলল, তোর দেখছি হাতে-পায়ে লক্ষ্মী। দিলি তো অত সুন্দর গ্লাসটা ভেঙে! জানিস গ্লাসটা আমাকে বাংলোবাবু দিয়েছিল।

গ্লাসটার উপর প্রহ্লাদের যে মায়া জড়ানো ছিল এটা সরসী জানত। আর জানত বলেই তার বুকের কাঁপন তখন ট্রেন চলে যাওয়া অসহায় অবলা লোহার পাতের মত। দোষ করলে সরসী বোবা মেয়ে। এত বছর এক সঙ্গে ঘর করেও সেও কি মানুষটাকে চিনতে পেরেছে। তার স্বামী বলে নয়, প্রহ্লাদকে চেনা বড় কঠিন। সে যখন কাজ থেকে ফেরে তখন তার মেজাজ থাকে অন্যরকম, বজ্র বিদ্যুৎ ভর্তি আকাশের মত মনে হয় মানুষটাকে। স্ক্রুড্রাইভার আর হাতুড়ি ধরা কড়া পড়া হাত। ঐ চওড়া হাতের চড়-চাপড় কতদিন সরসী সয়েছে মুখ বুজে। একটু এদিক ওদিক হলে আর রক্ষে নেই। প্রহ্লাদ অসুর হয়ে যায় তখন। ওর ক্ষমাহীন চোখে তখন আর প্রেম-ভালবাসার বুজকুড়ি থাকে না, থাকে শুধু বিষফোঁড়ার জ্বলন। সেই জ্বালায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায় সরসীর হৃদয়। চোখ ফেটে জল এলেও তাকে কেউ সান্ত্বনা দেবার নেই এ বস্তিতে। সবাই কাঁঠালগাছের ছায়ায় বসে মজা দেখে, নখ বাজায়, টীকা-টিপ্পনী কাটে। প্রহ্লাদকে তাতিয়ে দিতে পারলে তাদের হিন্দি সিনেমা দেখার সুখ মেলে।

বিষধর মানুষের বসবাস কাঁঠালতলার আশপাশে। কারোর ঘরের মাথায় খাপরা, কারোর আবার টালি। কেউ কেউ আবার রোদ জল ঢেকেছে মাথায় নীল-সবুজ পলিথিনের চার মুড়োয় গিঁট দিয়ে। ফি-ঘরে একটা দুটো দড়ির খাটিয়া। খাটিয়ায় শুয়ে দিনমজুর কুলি কামিন মানুষগুলো মৌজ করে সন্ধ্যা-রাতে। কারোর আবার বুকের উপর বাজে পুরনো রেডিও। এ বস্তিতে কারোর

ঘরে টিভির অ্যানটেনা নেই। শুধু সরসীর ঘরে আছে রেডিও ছাড়া টেপ। প্রহ্লাদ সখ করে কিনেছিল এক বাবুর কাছ থেকে। খুব সস্তায় পেয়েছিল জিনিসটা। সেদিন সরসীকে খুব বড় মুখ করে বলেছিল, রেডিও শুনে শুনে কান হজে গেল! টেপটা নিয়ে এলাম বাবুর কাছ থেকে। দাম বেশি নয়, তিন মাসে দিলে চলবে। ওয়ার্কশপের বাবুটা আমাকে খুব বিশ্বাস করে। দেখ তো, জিনিসটা কেমন হয়েছে। কথাগুলো বলেই গর্বিত ঢঙে টেপটা ধরিয়ে দিয়েছিল সরসীর হাতে সরসী টেপ চালাতে জানে না, বোকার মত টেপটা ধরে দাঁড়িয়েছিল কোনমতে সারা শরীরে আড়ষ্টতা, জড়তা। প্রহ্লাদ একটা চারমিনার ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে হাসতে হাসতে বলেছিল, তুই আর মানুষ হবি নে। বোকা-ই থেকে যাবি চিরকাল। আয়, সরে আয়। আমি তোকে টেপ চালানো শিখিয়ে দিচ্ছি। বলেই ক্যাসেট ভরে টেপের নবটা দাবিয়ে দিয়েছিল নিচের দিকে। নতুন ব্যাটারিতে টেপ বেজে উঠেছিল গ্যাকগেকিয়ে। কী সুন্দর গান! মাইকে, পূজা প্যান্ডেলে কতবার গানটা শুনেছিল সরসী। নিজের ঘরে সেই গান শুনতেই তার বুকের ভেতরে ফুটে উঠেছিল সুখের পদ্ম। ঐ ভর দুপুরে মানুষটার জন্য লাল চা করে দিয়েছিল সে। সঙ্গে দিয়েছিল লুকিয়ে রাখা দুটো কটকটে বিস্কুট।

টেপ এখনও বাজে সুখের মুহূর্তে। তবে আগের সেই জোর আওয়াজ নেই। ছোট ছেলে ট্যাংরা ফেলে দিয়েছিল হাত থেকে। সেদিন প্রহ্লাদ আদরের ছেলেকে ছেড়ে কথা বলেনি। চুলের মুঠি ধরে পকেটকাটা লোকগুলোর চেয়ে বেশি মারল। তাকে থামাতে পারেনি সরসী। দু-চার ঘা সেদিন তার গায়েও পড়েছিল ছেলেকে উদ্ধার করতে গিয়ে।

প্রহ্লাদের সখের জিনিস ভেঙে ফেলে সরসীর মুখে কোন কথা নেই। সকালে এমন বিপদ লাফিয়ে পড়বে সে স্বপ্নেও ভাবেনি। ছটার আগেই জলের নল খুলে যায় রাস্তায়। টাইম কলের জল টাইমে না ভরলে ভোঁ-ফক্কা। তখন কপাল চাপড়ালেও এক ফোঁটা জল মিলবে না। আর জল না হলে জীবন অচল। তাই সূর্যের মুখ দেখার আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় জল সংগ্রহের যুদ্ধ। প্রতিদিনই কারো না কারোর সাথে খিটিমিটি বাধে জল ভরতে গিয়ে। একটা কল, দাবিদার অনেক। খিটিমিটি, শালিকপাখির ঝগড়া তো রোজ লেগেই আছে। আজও বাসন্তীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল এক চোট। বাসন্তীর স্বভাব হল সবাইকে টপকে আগে জল নেবার। সবার বালতি-হাঁড়ি ঠেলে ঠুলে তার আগে জল চাই। অথচ তার সংসারে সে ছাড়া আর কেউ নেই। ওর বর পাগল হয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে বহুদিন আগে। বাসন্তীর বর ফিরে আসবে এমন আশা কেউ করে না। বাসন্তী এখন বস্তির ছাড়া তিতলি। দিনভর উড়ে-উড়ে বেড়ায়। এরই ফাঁকে দু-ঘরে কাজ করে সে। সময় পেলে রেল লাইনের ধারে চলে যায় কয়লা কুড়াতে। সেখানেও তার ঢলানীর শেষ নেই। বুক থেকে আঁচল খসিয়ে দিয়ে সে পুরুষমানুষের সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসে। এসব ছলাকলা না করেও

তার উপায় নেই। দশরথ পাগল হয়ে গেল ওর জ্বালায়। বস্তির লোকে বলে, বাসন্তীর খাই অনেক। তার খাই মেটাতে গিয়েই মানুষটাই খাক হয়ে গেল।

সরসী যে বাসন্তীকে দু-চোখে দেখতে পারে না তার অনেক কারণ আছে। ওর গায়েপড়া স্বভাব একেবারে না-পছন্দ সরসীর। একা থেকে থেকে ও হয়ে উঠেছে একটা বিষগাছ। প্রায়ই ওর ঘরে নিত্য নতুন পুরুষের আনাগোনা। তখন বাসন্তীর চোখে-মুখে আলাদা উত্তেজনা। শরীরে বাড়তি একটা চমক আসে। ওর চোখ দুটো তখন কথা বলে। নিজেকে জাহির করবার জন্য সে তখন উঠে পড়ে লাগে। এসব আদিখ্যেতা সরসীর দু'চোখের বিষ। হাজার দিন সে তাকে মানা করেছে। বাসন্তী তার কথা উড়িয়ে দিয়েছে তুড়ি মেরে। গাল মন্দ করে বলেছে, আমি পচা নালীর পোকা নই, আমি হলাম গিয়ে গাছের ফুল। আমাকে নজর দিলেও আমি পচব না। বস্তিতে আছি বলে ভেব না আমার কোন দাম নেই। সোনা যেখানেই থাকুক, সে সোনা।

অত যদি তোর ক্ষমতা তাহলে ভাতারটাকে খেদালি কেন? সরসীর আগুন ধরানো কথায় বাসন্তী খিলখিলিয়ে হাসে. নিজের ভরাট শরীরের দিকে তাকিয়ে সে বলে, পাখি পুষতে গেলে খাঁচা আর দানা চাই। ও দুটোর কোন কিছুই ঐ ঢ্যামনাটার ছিল না। দিনরাত সে খালি মদ গিলত। রাতে আমাকে চটকাত। শরীরের আগুন আর কতদিন থাকে। আগুন ছাই হতেই যে যার রাস্তা দেখেছে। আমি তো তাকে খেদাই নি। হাওয়ায় ছাই হয়ে উড়ে গিয়েছে সে। বাসন্তীর কাট কাট কথাগুলো সরসীর মনে শান্তির জল ছিঁটে দেয় না। সে জানে—বাসন্তী উইপোকা। তার সুখের সংসারের দিকে হা-পিত্তেশ নজর, ঐ কূট নজর সে আঙুল ঢুকিয়ে গেলে দেবে। যদি সে একদিন বাগে পায় বাসন্তীকে তাহলে ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার করে দেবে।

আজ কলতলায় বাসন্তী হাই তুলতে তুলতে বালতিটা বসিয়ে দিয়েছিল জোর করে। খাটা পায়খানায় তখন লাইন লেগে গিয়েছে। বাসন্তীর আর তর সইছিল না। সারারাত গরমে তার ভাল ঘুম হয়নি। কাঁঠালতলায় সে খাটিয়া পেতে শুতে পারত কিন্তু ঘুমালে তার কাপড়-চোপড়ের ঠিক থাকে না। তাছাড়া শোওয়ার সময় গায়ে অত কাপড় সে কোনকালেই রাখতে পারে না। গায়ে জামা রাখলে সারারাত তার ঘুম হবে না। ফলে সারারাত খালি গায়ে সে কাঁঠালতলায় ঘুমাবে কীভাবে। বস্তিতে সে তো একা নয়। হাজারটা চোখ তার ওদলা গতর গিলতে থাকে। বস্তির মানুষগুলো তাকে নিয়ে গল্প ফাঁদে। বস্তিবুড়ি গালমন্দ করে। সতর্ক করে বলে, মেয়েমানুষের লাজ শরম হারিয়ে গেলে আর কিছু থাকে না। নারকেলের শাঁস কুরে নিলে শক্ত মালাইয়ের দিকে কেউ আর ফিরে তাকায় না। তোর গতর আছে বলেই কি বালিয়াড়ির মত সবাইকে দেখাবি? ছিঃ, এবার থেকে মনে একটু ঘেন্না ধরে রাখ। ঘেন্না-পিত্তি না থাকলে মানুষ মাছের চেয়েও তাড়াতাড়ি পচে যায়।

শুধু বস্তিবুড়ি নয়, আরো অনেকেই সতর্ক করে বাসন্তীকে। তবু সে ভ্রূক্ষেপহীন। সে বলে, জীবন আর ক'দিনের! ফুল ফুটলে ঝরবে তো একদিন। আমার এত রাখ-ঢাক নেই। আমি হলাম গিয়ে খোলা আসমান। আমি না খেতে পেলে কেউ কি আমাকে খেতে দেবে?

কলতলায় চুলোচুলি হতে হতে বেঁচে গেল। বস্তিবুড়ি সে সময় হাজির না হলে সরসী তাকে ছেড়ে দিত না। এমনিতে তার মন পুড়ছে সব সময়। বাসন্তী তার নিদ কেড়ে নিয়েছে। প্রহ্লাদের নজর গিয়েছে বাসন্তীর উপর। প্রায়ই সে হাঁ-করে বাসন্তীর ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাসন্তী ঘরে থাকলে প্রহ্লাদের আর ঘরে মন ধরে না। ছুতোনাতায় সে বাইরে এসে বাসন্তীকে দেখার চেষ্টা করে। আর বাসন্তীও উঁকিঝুঁকি মারতে ছাড়ে না। ছ'মাসের উপর হল এসব দেখে সরসীর বুকের ভেতরে একটা খোদলের সৃষ্টি হয়েছে। সে যেন নিজেই তলিয়ে যেতে থাকে। নিজেকে সে বারবার করে দেখে ভাঙা আয়নায়। বয়সকালে সেও কী কম ছিল বাসন্তীর চেয়ে। এখন সে চার সন্তানের মা। গতর ধসেছে বারবার প্রসব হতে গিয়ে। এখন চোখের নিচে কালি জমেছে। তার মতন কটা বউ সংসারের ঘানিতে পিষে খোল হয়েছে? মুখে মেচেতার দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠছে দিনে দিনে। বুক দুটোও আগের মত টান টান শক্তি ধরতে পারে না। এক ধরনের বিবশ শীতলতা সরসীকে পেয়ে বসেছে। তবু সে চেষ্টা করে নিজেকে হাসিখুশি রাখার। কিন্তু বাসন্তীর কাছে সে পেরে ওঠে না। বাসন্তী কাঁটানটের গাছ, সতেজ ফণিমনসা। তার সাথে সরসী পেরে ওঠে না। প্রতিদিন হেরে যাবার জ্বালা অনেক।

আজও কলতলায় বাসন্তী তাকে হারিয়ে দিল, সবার সামনে ঠেলা মেরে সে তার বালতি সরিয়ে দিয়ে জল নিয়ে চলে গেল গর্বিত ময়ূরের ঢঙে। বস্তিবুড়ি তার অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ছেড়ে দে মা। ও হলো গিয়ে জাত সাপ। তুই ওর সাথে পারবি কেন?

তখনকার মত চুপ করে গেলেও সরসীর রক্তের ভেতর থেকে অপমানের বুদবুদগুলো মেলাল না। মনের ভেতরে চাপা অসন্তোষ পুরে নিয়ে সে সংসারের কাজ করছিল। প্রহ্লাদ তখনও কাঁঠালতলায় শুয়ে। রোদ ওর গায়ে কামড় না মারলে কোনদিনও ওর ঘুম ভাঙে না। পদ্ম, টগর আর জুঁই যে যার কাজে ব্যস্ত ছিল। তারাও সরসীর মনের বিক্ষোভ-জ্বালাযন্ত্রণাকে আঁচ করতে পারেনি। সরসী কী করে মেয়েদের কাছে তার গোপন জ্বালা-যন্ত্রণাকে উজাড় করে দেবে। পদ্ম-টগর বড় হয়েছে, ওরা বুঝতে শিখেছে। ওদের সামনে মা হয়ে সে কী করে বলবে এসব নোংরা কথা। সে অত ছোট হতে পারবে না।

প্রহ্লাদ ঘুম থেকে উঠেই ডাব্বায় জল ভরে চলে গিয়েছিল খাটা পায়খানায়। ফিরে এসেই তার অস্থির চোখ দুটো খুঁজছিল বাসন্তীকে। দাঁত মাজার অজুহাতে সে হাঁ করে তাকিয়েছিল বাসন্তীর ঘরের দিকে। আর তখনই একগাদা এঁটো

বাসন-কোশন নিয়ে বাসন্তী বাইরে এসে বসল প্রতিদিনের মত। বাসন্তী যতক্ষণ বাসন মাজবে ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁত মাজবে প্রহ্লাদ। ঘেরা বারান্দা থেকে রোজই এসব দেখে সরসী। তার বুক জ্বলে-পুড়ে গেলেও মুখে কোন ভাষা নেই। প্রহ্লাদের সামনে সে কেঁচো। বড় মুখ করে কিছু বলতে গেলেই মুখ ভেঙে থেঁতো করে দেবে। লোকজন মানবে না। চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে ঘরের বাইরে বার করে এনে কাঁঠালতলায় আছড়ে ফেলে দেবে। এসব দেখে দশ লোক হাসবে। বেশি করে হাসবে বাসন্তী।

সেই থেকে সরসী ভাবছিল, কী ভাবে বাসন্তীকে হাতে না মেরে ভাতে মারা যায়। তার সমস্ত বুদ্ধি জড়িয়ে যাচ্ছিল। সাত সকালে ঘেমে উঠছিল সে। বাসন্তীকে ঠেকাতে না পারলে তার কপাল পুড়বে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখবে তার সংসার জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। ছাড়া গোরু বাগান মুড়িয়ে খেয়ে নিলে বেড়া দেওয়া দরকার। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সরসী ভাবছিল এসব। কাল রাতে প্রহ্লাদ চোলাই কিনে এনেছিল ঘরে। বাংলোবাবুর দেওয়া পাতলা ফিনফিনে কাচ গেলাসটায় ঢেলে খাচ্ছিল চোলাই। সরসী কাঁচা পেঁয়াজ আর ছাগলের ভুঁড়ি চচ্চড়ি দিয়েছিল বাটিতে। সাইকেল দোকানে কামাই ভাল হলে প্রহলাদ ঘরে বাংলা কিংবা চোলাই এনে খায়। ভাঙা নড়বড়ে টেপটা চালিয়ে দেয় হুক করা লাইনে। টেপ চললে গানের তালে হাঁটু দোলায় প্রহ্লাদ। ভুঁড়ির উপর গেঞ্জিটা আটকে থাকে ঘামে। পদ্ম কিংবা টগর হাওয়া দেয় তালপাখায়। ছোট ছেলে ট্যাংরা হাঁ করে তাকিয়ে মজা দেখে বাবার। তখন তার চোখে প্রহ্লাদ হল রাজা।

ঘরে চানাচুর ছিল না। ভাল চানাচুর না থাকলে মাল খেয়ে মন ভরে না প্রহ্লাদের। সরসীকে তাই বলেছিল, চানাচুর নেই? পরশু যে এনেছিলাম—

—ও তোমার ছেলে-মেয়েরা খেয়ে নিয়েছে।

—খেয়ে নিয়েছে! ভাল করেছে। যা বাসন্তীর ঘর থেকে দু-মুঠো এনে দে। চোলাইয়ের সাথে ঝাল চাট না হলে মজা পাইনে। প্রহ্লাদের চোখ জোড়া চকচক করিছল লোভে।

মুখের ঘাম হাতের চেটোয় মুছে নিয়ে সরসী ঝাঁঝালো গলায় বলেছিল, কাঁচা পিঁয়াজ-মিরচা দিয়েছি। কষা করে ভুঁরি চচ্চড়ি রেঁধেছি, এতেও তোমার মন ভরে না?

—মন ভরলে কী চাইতাম? প্রহ্লাদ কালো ছোপ ধরা দাঁত দেখিয়ে হেসে উঠেছিল।

—তাহলে পয়সা দাও। ট্যাংরাকে পাঠাচ্ছি দোকানে। আমি কারোর দোরে ভিখ মাঙতে যেতে পারব না।

—তুই না পারলে আমি যাচ্ছি। প্রহ্লাদ নিজেই উঠে গিয়েছিল বাসন্তীর উঠোনে। স্টিলের বাটিতে চানাচুর নিয়ে ফিরে এসেছিল কিছু সময় পরে।

সরসী পদে-পদে এমন অপমান আর কত সইবে? এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। সে আর বাসন্তীর কাছে হেরে যেতে চায় না। এভাবে গায়ে গা লাগিয়ে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর।

চা জুড়িয়ে জল হয়ে যাচ্ছিল। বড় মেয়ে পদ্ম বলল, মা, চা খাবা না? চা খেয়ে বাবার জন্য রুটি করে দাও। আমি পুঁইশাক আর কুমড়ো কেটে দিচ্ছি। বাবার দোকান খুলতে দেরি হলে রাগারাগি করবে।

সকালে ব্যস্ততার শেষ থাকে না সরসীর। চা-পর্ব শেষ হলেই রুটি বানাবার তাড়া পড়ে যায়। রোজ সকালে সে যেন দম দেওয়া কলের পুতুল। একটু দম নেবার ফুরসৎ নেই।

খোলা আকাশের নিচে প্রহ্লাদের সাইকেল দোকান। নীল পলিথিন বাঁধা থাকে খুঁটির চারমাথায়। সন্ধ্যা লাগার মুখেই ওটা খুলে নিয়ে ঘরে আসে সে। যন্ত্রপাতি সব কিছু ভরা থাকে কাঠের বাক্‌সে। পদ্ম টগর কিংবা ট্যাংরা গিয়ে বয়ে আনে। ভাঁজ করা পলিথিন আবার টাঙানো হয় সকালবেলায়। সকালে টুল-বকস্ নিয়ে ট্যাংরা যায় তার বাপের সাথে। সাইকেল মেরামতির কাজটা সে তার বাপের কাছ থেকেই শিখছে। পাক রাস্তার ধারে সে ফুটপাথিয়া দোকান করবে না। কাজ শিখে সে একটা গুমটি দোকান করবে। রোজ দোকান ভেঙে দোকান গড়া ঝকমারি কাজ। এতে হ্যাপা কম নয়। একটু চেষ্টা করলে প্রহ্লাদও গুমটি দোকানের মালিক হতে পারত। কিন্তু সংসারী হওয়া তার ধাতে নেই। খাইখরচা আর মালপানির দাম উঠে গেলেই তার মন চলে যায় ভাটিখানায়। গ্রাহক ফিরিয়ে দেয় অজুহাতে। ট্যাংরা নিজের চোখে এসব দেখে। বড় হয়ে সে বাপের মত হবে না। গ্রাহক সে ফেরাবে না, গ্রাহক হল লক্ষ্মী। সরসী প্রহ্লাদকে বোঝাবার চেষ্টা করেও পারেনি, প্রহ্লাদ হাসতে হাসতে বলে, আমার ফুটপাথিয়া দোকানই ভাল। ওয়ার্কসপের বাবুগুলো আমার এই ফুটপাথ ছাড়া চেনে না। আমি যে দামে লিক সারব, বাজারের কেউ তা পারবে না। যতক্ষণ দিনের আলো, ততক্ষণ আমার দোকান। আঁধার ঘনালে আমার মন আর আমার ভেতর থাকে না। তোরা আমাকে বোঝাতে আসিস নে। আমাকে আমার মত থাকতে দে।

—মাথার ওপর তোমার তিনটে মেয়ে, তুমি তাদের কথা ভাববে না? সরসীর উদ্বেগ চিন্তাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেয় প্রহ্লাদ, ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে আয়েসী স্বরে বলে, আমার মেয়েগুলো তো অশৌচ হাঁড়ি নয়। ওরা ডানাকাটা পরী না হলেও দেখতে সুন্দর। ওরা ঠিক পার পেয়ে যাবে, আমি ওদের বিয়ে নিয়ে ভাবি না।

ভাবনা যত সরসীর। তার মাথার উপর ধারাল খাঁড়ার মত আছড়ে পড়ছে বাসন্তীর কালনিঃশ্বাস। দুটো সোমত্ত মেয়ে চোখের সামনে ধেই-ধেই করে ঘোরে। বস্তির হাল চাল খারাপ। এই তো সেদিন পেট নামিয়ে এল পার্বতীর বড়

মেয়ে পারুল। ছ'দিন মেয়েটা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না, মরমর দশা। রেল কারখানার ছেলেটা ওকে ধোকা দিল। পেট বাঁধিয়ে দিয়ে কেটে পড়ল।

সরসীর কড়া নজর তাই পদ্ম আর টগরের উপর। বেচাল দেখলেই তার ক্ষুর মুখ চলে নির্মমভাবে। আলগা শাসন তার ধাতে নেই। মুখরা হিসাবে বস্তিতে তার যথেষ্ট বদনাম আছে। কিন্তু বাসন্তীর বেলায় সে একটা হিমপাথর।

উঠোনের সামনে দিয়ে বাসন্তী যখন চলে গেল কোমর দুলিয়ে তখনই সারা শরীরে কাঁপুনি উঠেছিল সরসীর। হাতে ধরা গ্লাসটাও রক্ষা পেল না। হাত কাটত, কোন মতে রক্তারক্তি বিপদ থেকে বাঁচাতে পেরেছে সে নিজেকে। এতদিনের না বলা ক্ষোভ যেন গ্লাসের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। এই গ্লাসে সে একদিন বাসন্তীকে জল খেতে দিয়েছিল। জল খেয়ে গ্লাসটা নেড়ে চেড়ে বাসন্তী বলেছিল, বড় ফাস্ কেলাস গেলাস! তা দাদাকে বল না, অমনধারা একটা কাচগ্লাস আমাকে এনে দিবে। বিনে পয়সায় চাইছি নে, যা দাম লাগে দেব।

তার ঔদ্ধত্য দেখে সরসী সহসা সেদিন কথা বলতে পারে নি, কদিন পরে সে দেখেছিল ঐ রকম একটা কাচগ্লাস বাসন্তীর ঘরে। —কোথা থেকে পেলে? সরসী শুধাতেই বাসন্তী একমুখ গর্বের হাসি হেসে বলেছিল. টাকা থাকলে বাঘের দুধও পাওয়া যায় দিদি। এমন ধারা ফিনফিনে গ্লাস তোমার কটা চাই বল? গোলবাজার থেকে আমি এনে দেব কথা দিচ্ছি।

গ্লাসটা বাসন্তীর নিজের পয়সায় কেনা নয়, এটা সরসী ভাল মতন জানে। প্রহ্লাদই গ্লাসটা বাসন্তীর আব্দার মেটাতে এনে দিয়েছে। সেদিন দোকান বন্ধ করে প্রহ্লাদ গোলবাজারে টো-টো করে ঘুরেছে। সঙ্গে বাসন্তী ছিল—এ খবর সে শুনেছে ট্যাংরার মুখ থেকে। ট্যাংরা ভাত খেতে এসে বলেছিল, মা, আজ দুপুরে বাবা খেতে আসবে নি। গোলবাজার চলে গেল সাইকেল নিয়ে।

ভরদুপুরে দোকান ফেলে গোলবাজার ঘুরতে যাওয়ার অর্থ সন্ধেবেলায় নিজের চোখে দেখেছিল সরসী। বাসন্তীর হাতে ফিনফিনে কাচ-গেলাসটা দেখে—এত দিনের বিশ্বাসটা ভেঙে গিয়েছিল তার। প্রহ্লাদকে মনে হয়েছিল জহ্লাদ। পর পর তিন দিন সে কথা বলেনি ঘরের মানুষটার সঙ্গে। তার এই অভিমান বড়ই এক তরফা। প্রহ্লাদ সব বুঝতে পেরে বলেছিল, আমার যা মন চায় তা আমি করব। আমাকে বাধা দিস নে, তাহলে মরবি।

মরতে চায় না সরসী, সংসার আগলে সুখে-দুঃখে বাঁচতে চায়। প্রহ্লাদের হাব ভাব অসহ্য লাগলেও কাঁটা গেলার মত হজম করার চেষ্টায় আছে সে। বাসন্তীকে মানিয়ে নেওয়া আর বিষ খেয়ে শুয়ে থাকা—তার কাছে একই একথা।

সখের গেলাসটা ভেঙে ফেলাতেও প্রহ্লাদ চুলের মুঠি ধরল না, লাল চোখ দেখিয়ে দু-চার কথা বলে ঝিমিয়ে গেল। সাত সকালে চুলোচুলি করতে তারও মন চায় না। সরসীকে পিটলে পাড়া মাথায় তুলে আজকাল সে কাঁদে। এই

ঘ্যানঘেনানি কান্না প্রহ্লাদের একেবারে অসহ্য। শুধু সরসীর কান্না নয়, এ মরা সংসারও তার কাছে অসহ্য। দশটা না বাজতেই রোজ পদ্ম বাজারের ব্যাগ, সরষের তেলের শিশি নিয়ে গিয়ে হাজির হয় তার কাছে। বলে, বাবা, আজ দুটো টাকা বেশি দিও। আজ এক পাতা উকুন মারার শ্যাম্পু কিনব। মার মাথাতেও উকুন হয়েছে, সবাই মিলে মিশে মাখব।

পিচ রাস্তার ধারে খোলা আকাশের নিচে প্রহ্লাদের সাইকেল দোকান। ঢাল নেই তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দারের মত দশা। ওয়ার্কশপের লোকগুলো না থাকলে এ দোকান চলত না। রেলবাবুরাই বাঁচিয়ে রেখেছে তার সংসার। ঘর খরচার টাকা দিয়ে দিলে পদ্ম চলে যায় হেলে দুলে। বড় হওয়ার পর থেকে ওর হাঁটার ধরন পাল্টেছে। অনাবশ্যক কোমর দুলিয়ে হাঁটে মেয়েটা। কাপড় পরারও ছিরিছাঁদ নেই। চুল কেটেছে কাঁচি দিয়ে। সে শুধু নিজের চুলই কাটেনি, টগরের চুলটাও কেটেছে; হাতে দুটো টাকা জমলেই সিনেমায় ছোটে বাবা মাকে না জানিয়ে। প্রহ্লাদ সব জেনেও চোখ বুজে আছে। মাঝে মধ্যে তার মনে হয়, প্রথম সন্তান মেয়ে না হয়ে ছেলে হলেই ভাল হোত। পদ্মার বয়েসী ছেলেগুলো লোহা চোরাতে যায় রেল-ইয়ার্ডে। দিন গেলে তারা বিশ-ত্রিশ টাকা কামিয়ে নেয় হাসতে হাসতে। তার ছেলে লোহাচোর না হলে নিদেন-পক্ষে সাইকেল দোকানে প্যালা দিত। এখন তিন তিনটে মেয়ে ঘাড়ের উপর চাম এঁটুলির মত সেঁটে বসছে দিনকে দিন। ওরা পার্বতীর মেয়ে পারুলের মত অত বোকা নয়। মিশবে কিন্তু ধর্ম দেবে না। তিনটে মেয়ের জন্য মনে গর্ব হল প্রহ্লাদের। যুগের সাথে মেয়েগুলো খাপ খাইয়ে নেবে হাসতে-হাসতে, এ যুগে মুখশ্রী ভাল হলে মেয়েরা পার পেয়ে যায়।

একটা লজঝড় সাইকেল ওয়েলডিং করতে দিয়ে যায় পান-দোকানী। বিকালের পরে নেবে। ওয়েলডিং-এর কাজ থাকলে অন্য কাজে ঢিলে ছেড়ে দেয় প্রহ্লাদ। লিক সারা, টুকটাক কাজ করে ট্যাংরা। ওর আর বয়স কত, গায়ের জোর দুবলা ফিঙে পাখির চাইতে একটু বেশি। তবু কায়দা করে টায়ার খুলতে পারে সে। নিখুঁত ভাবে লিক সারে। চাকায় হাওয়া ভরে দিলে চাকা পিছু চার আনা করে সে দক্ষিণা নেয়। হাওয়া ভরা পয়সা ট্যাংরা প্রহ্লাদকে কোন দিন দেয় না। আর প্রহ্লাদও জোর করে না। ছেলেটা ঐ পয়সা দিয়ে গুপচুপ কিনে খায় স্টেশন বাজারে। কখনও তার মায়ের জন্য গরম চপ কিনে নিয়ে যায় সন্ধ্যাবেলায়।

সারাদিন দোকান চালিয়ে যা লাভ হয় তাতে ভালমত সংসার চলে যাবার কথা। সরসী মাঝে মধ্যে এসে খোঁজ নিয়ে যায় প্রহ্লাদের। মাটির কুঁজোটায় জল না থাকলে জল ভরে দিয়ে যায় চাপাকল থেকে। যাওয়ার সময় সে পান খাওয়ার পয়সা চেয়ে নেয়।

ক'মাস হল সরসী রাগে-ঘেন্নায় দোকানে আসা ছেড়েছে। প্রহ্লাদই তাকে

আসতে মানা করেছে। আসলে বউ আসলে বাসন্তী আসতে পারে না যখন তখন। এক আকাশে দুটো চাঁদ উঠুক—প্রহ্লাদের তা অপছন্দ। ঘরের বউ ঘরে থাকবে, সে কেন ধিঙ্গি মেয়ের মত হাটে-বাটে-দোকানে ঘুরে বেড়াবে? সরসীর পান খাওয়ার পয়সাটা এখন বাসন্তীর হাতে তুলে দেয় প্রহ্লাদ। চোখের ইশারা করে বলে, সাঁঝের বেলায় এসো, ধোসা খাওয়াতে নিয়ে যাব অন্ধ্র হোটেলে। কী যাবে তো?

বাসন্তী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেই প্রহ্লাদের খাটা গতরে সাপলা ফুল ফুটে ওঠে। এই বয়সেও তার শরীর এখন অন্য নেশায় বিভোর। চোখ খুঁজে বেড়ায় সুখের পরশমণি। বাসন্তীর হাসি মুখ দেখলেই প্রহ্লাদের ঘাম জুড়িয়ে সারা শরীরে অদ্ভুত একটা প্রসন্নতা বিচরণ করে। সে জানে বাসন্তীকে ছাড়া তার এখন বেঁচে থাকতে কষ্ট হবে।

আশেপাশের দোকানীগুলো প্রহ্লাদকে ভাল চোখে দেখে না। বাসন্তীর ঘন ঘন যাতায়াত তাদের চোখে বালি ছিটিয়ে দেয়। প্রহ্লাদকে বোঝাবার চেষ্টা করে তারা। প্রহ্লাদ অবজ্ঞা ভরে বলে, আমাকে আর জ্ঞান দিও না। আমি তো আর কাঁচা খোকা নই। তাছাড়া, তোমার যা ভাবছ—বাসন্তীর সঙ্গে আমার তেমন কোন সম্পর্ক নেই। ও আমার কাছে আসে দুঃখ সুখের কথা বলতে। বস্তিতে আমার সময় হয় না, তাই দোকানে আসে। এতে পাপ কোথায়?

—পাপ-পুণ্যের কথা নয় ভাই, তুমি ছেলে-পুলের বাবা বলে তোমাকে সতর্ক করছি। বাসন্তীকে তো আমরা চিনি, ও তোমার মত মানুষের মাথা বিগড়ে দিতে পারে চোখের নিমেষে।

—আমার মাথা তো সাইকেলের বল-বিয়ারিং নয় যে ঘোরালেই ঘুরবে। প্রহ্লাদ হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইল প্রতিপক্ষের যুক্তি, তারপর সে ডুবে যেতে চাইল নিজের কাজে।

চারখানা পান বিড়ির দোকান পাশাপাশি, তার পাশে মাথায় ত্রিপল টাঙানো চায়ের দোকান। সারাদিনের পরিশ্রমে শরীর এলে গেলে নিমাইয়ের এক কাপ চা কড়া মদের আমেজ আনে মনে। তেল কালি ধুয়ে ফেলে প্রহ্লাদ তার খাকী প্যান্ট-জামা পরে নেয়। বাসন্তীকে অন্ধ্র হোটেলে ধোসা খাওয়াবে কথা দিয়েছে। সে সেজে গুজে লেবেল ক্রশিংয়ের গেটের সামনে অপেক্ষা করবে। এই ফাঁকে সরসীর কাছে একবার মুখ দেখিয়ে আসবে সে। দোকান বন্ধ করে একবার ঘরে না গেলে রাতভর অশান্তি হবে। রাতে গা-হাত-পা দাবিয়ে দেবে না সরসী, মুখ ঝামটা দিয়ে বলবে, যাও না, আমার কাছে আর কী মধু আছে? তুমি তো এখন অন্য ফুলের মধু চেখে বেড়াচ্ছো। কেন মরতে আমার কাছে আসো। আমি তো এখন তোমার মন জুগাতে পারি না। এক জনার কাছে মন বাঁধা দিয়ে অন্যের কাছে এসেছ জ্বালা জুড়াতে। আমি কী অতই বোকা, ভাবো যে কিছু বুঝি না!

—তোর কথাগুলো আজকাল কেমন ধারা, আমি সুখ পাইনে।

—সুখ তুমি জীবনে কোথাও পাবে না। কাউকে কাঁদিয়ে কি সুখ পাওয়া যায় গো? খাটিয়ার এক পাশে বসে অন্ধকারে চোখ মুছে নেয় সরসী, তুমি যেখানে খুশি চলে যাও, আমি তোমাকে বাধা দেব না। আমি বাধা দেবার কে, আর আমি বাধা দিলে তুমি আমার কথা শুনবে কেন?

অন্ধ্র হোটেলে বাসন্তীর পাশে বসে মশলা ধোসা খাচ্ছিল প্রহ্লাদ। আজ সে খাকী প্যান্টের সাথে সাদা রঙের জামা পরেছে। ধোসায় কামড় দিয়ে বাসন্তী হাওয়ায় দোল দেওয়া কচি পাতার চোখে তাকাল, পদ্মর বাবা, আজ তোমাকে একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন।

নড়েচড়ে বসল প্রহ্লাদ, বাসন্তী চোখ নাচিয়ে কপট গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলল মুখে, এভাবে আর মেলামেশা করা যায় না। ডুবে ডুবে জল আর কতদিন খাবো আমরা। দিদি সব জেনে ফেলেছে। ওর চোখের দিকে তাকালে আমার চোখ দুটো বুজে আসে। বিশ্বেস কর পদ্মর বাবা, আমার খুব ভয় করে। কারোর হক ছিনিয়ে আমি কি সুখী হতে পারব?

—সুখী না হবার কোন কারণ নেই। প্রহ্লাদ ঝাল কামড়ান চোখে তাকাল, বস্তির কাউকে আমি পাত্তা দিই নে। বেঁচে থাকুক আমার ফুটপাথিয়া দোকান। দোকান থাকলে আমি কারোর কাছে হাত পাতব না। তোমার হাত ধরে ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াব।

—তোমার ঘর-সংসারের কী হবে?

—ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছে। ওরা ওদের দানা ঠিক খুঁটে খাবে।

—দিদির কী হবে?

—সে যদি মানিয়ে নিতে পারে তো ভাল নাহলে নিজের রাস্তা দেখে চলে যাবে। আমি বিশ বছর তাকে পুষলাম, আর ক' বছর পুষব?

ধোসার মসলা গলায় আটকে গেল বাসন্তীর, কপালে ফুটে উঠল সাবুদানা ঘাম। রাস্তার বাতিগুলো প্যাটপেটিয়ে জ্বলছিল। আলোর মধ্যে হাঁটতে ভয় করছিল বাসন্তীর। সে এখন অন্ধকারের মানুষ, আলোর ঝলকানি তার চোখে বড্ড লাগে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বাসন্তী মোড়ের মাথায় এসে থমকে দাঁড়াল, হাওয়া এসে উড়িয়ে দিল তার চুল। হাত উঠিয়ে চুলগুলো সামলাতে গিয়ে ব্যর্থ হল সে। চোখের উপর আছড়ে পড়েছে চুল। আঙুল দিয়ে চুলগুলো সরাতে গিয়ে সে দেখতে পেল সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা পাগল। তাকে দেখে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে হাসছে লোকটা। তার চণ্ডাল চোখের তারায় অদ্ভুত নিরাসক্ত হাসি। ঐ বিক্ষিপ্ত হাসি কুঁকড়ে দিল বাসন্তীকে। ভয়ে সে ঘন হয়ে সরে এল প্রহ্লাদের কাছে। তাড়াতাড়ি শ্বাস ছেড়ে বলল, ঐ দেখ, পাগলটা কেমন দেখছে?

প্রহ্লাদ বাসন্তীর হাতটা আঁকড়ে ধরল, ওকে চিনতে পারলে না? ও হলো গিয়ে হারাধন। হাসপাতালের সামনের বস্তিটায় থাকে। বউ ছেড়ে যাবার পর

মানুষটা পাগল হয়ে গেল। এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। চেয়ে চিন্তে খায়। মাঝে মধ্যে আমার দোকানে এসে চার আনা আট আনা নিয়ে যায়।

বাসন্তীর মুখ ছাই ফ্যাকাসে হয়ে গেল কথা শুনে। দশরথের কথা মনে পড়ল তার। অমন ভাল মানুষ দুনিয়া ঘুরে আসলে দু'একটা পাওয়া যায়। স্বামীভাগ্য তার খারাপ ছিল না, তবু কোথা থেকে যে কী সব অঘটন ঘটে গেল। প্রহ্লাদ তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ছিল ভাটিখানায়। মানুষটা বেহেড মাতাল হয়ে ফিরল ঘরে। খাটিয়া নিয়ে শুয়ে থাকল খোলা আকাশের নিচে। বাসন্তীর কাছে মাঝরাতে এক গ্লাস জল চেয়েছিল। বাসন্তী জল দিয়েছিল। জলের সাথে মিশিয়ে দিয়ে ছিল প্রহ্লাদের দেওয়া শিকড় বাঁটা। ভোররাতে বাইরে এসে বাসন্তী আর দশরথকে দেখতে পায়নি। মরা চাঁদকে একলা রেখে কোথায় যে হারিয়ে গেল মানুষটা! বাসন্তী তার পথ চেয়ে থাকে, তার অনুমান দশরথ একদিন ফিরে আসবে তার ভাঙা ঘরে। সেদিন তার ছোট্ট ঘরে আছড়ে পড়বে জ্যোৎস্না, তাকে আর বস্তিচরা বেড়ালের মত ঘুরে বেড়াতে হবে না। যে দাগ তার গায়ে লেগেছে, তা ধুয়ে মুছে ফেলবে সে। ভুলের পায়শ্চিত্ত করবে জীবনভর।

প্রহ্লাদ হাত ধরে টানতেই চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল বাসন্তীর। আঁচলে মুখ মুছে নিয়ে সে বলল, চলো। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমার মাথাও খারাপ হয়ে যাবে।

প্রহ্লাদ তার কথা গুরুত্ব সহকারে শুনল না, সে ভাল সাইকেল সারতে পারলেও মেয়েদের মনের ক্ষত সারাবার ক্ষমতা নেই। আকাশ ভর্তি তারা; মাথায় হাজার গণ্ডা চিন্তা নিয়ে বাসন্তী পথ হাঁটছিল, সে জানে না এই সম্পর্কের শেষ কোথায়। অলকলতার যেমন মূল খুঁজে পাওয়া দায়, তেমনি বাঁধনহীন অবৈধ সম্পর্ক চেনা নদীর মত সহজ নয় কখনও।

অনেক রাতে সরসী যখন ঘুমে কাদা তখনও সেই মরা চাঁদটা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মলিন মুখ নিয়ে রাত জাগে। খাটিয়ায় শুয়ে দু-চোখের পাতা এক করতে পারছিল না প্রহ্লাদ সাইকেলওলা। বুকের ভেতর ফণা মেলে দাঁড়িয়েছিল একটা সাপ। তার চোখে-মুখে আক্রোশ। সাপটা এক সময় তার অস্তিত্ব হারিয়ে দশরথের কঠিন নিঃশ্বাস হয়ে ঝরে পড়ে তার বুকের উপর। যখন তার পেট চলত না, ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার ফুটো হয়ে যাওয়া নৌকা, তখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ঐ দশরথ। অভয় দিয়ে বলেছিল, দাদা, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। তোমার ছেলে-মেয়ে ভুখা থাকলে আমার কী ভাল লাগবে! চলো একসাথে সাইকেল দোকান খুলি। একই যন্ত্রপাতিতে দু-জনে মিলে কাজ করব। যে যেমন খাটবে তার তেমন পয়সা। তুমি দিনভর যা কামাই করবে—তাতে আমি ভাগ বসাব না।

দশরথের দয়ায় প্রহ্লাদ কুল পেয়েছিল সেদিন। সরসীকে সে বড় বৌদির চোখে দেখত। নিজের হাতে ঘর তুলে দিল বসবাস করার জন্য। দশরথ না

থাকলে এ বস্তিতে তাদের ঠাঁই হোত না। ঘরের পাশে আরেকটা ঘর উঠল। বাসন্তী তখন নতুন বউ। স্টেশন বাজারে সে তার মায়ের ঝুপড়িতে থাকত। দশরথই তাকে নিয়ে এল স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে। প্রথম দিন থেকে প্রহ্লাদের জোঁক নজর বাসন্তীর উপর। সে বড় রূপের কাঙাল। বাড়া ভাতে ছাই দিতে ওস্তাদ। দশরথকে সে মদ-জুয়া-সাট্টার আড্ডায় ভিড়িয়ে দিল। সেই পেছল পথ থেকে দশরথ আর সোজা হয়ে ফিরতে পারল না। তার তখন মাজা ভাঙা সাপের অবস্থা। সাইকেল দোকানে মন নেই। যন্ত্রপাতি বিক্রি করে দিল প্রহ্লাদের কাছে অর্ধেক দামে। তার এই অধঃপতনের জন্য দায়ী প্রহ্লাদ নিজে একা। বাসন্তী কি তার এই চালবাজি বুঝতে পারেনি? সাতঘাটে চরে বেড়ান মেয়ের বুদ্ধিকে খাটো করে দেখলে ভুল হবে। প্রহ্লাদ খাটিয়া আঁকড়ে উঠে বসল মাঝরাতে। চুপি চুপি পায়ে সে হেঁটে গেল বাসন্তীর ঘরে। গলা নিচু করে ডাকল, বসন্তী, দরজা খোল। আমি পদ্মর বাবা, দরজা খোল।

দরজার খিল খুলে দিল বাসন্তী। চাপা গলায় বলল, তুমি চলে যাও। আমার মন মেজাজ ভাল নেই। অন্য দিন এসো।

—আজ আমি ফেরার জন্য আসিনি। আজ আমাকে ফিরিয়ে দিলে আমি হয়ত দশরথের মত পাগল হয়ে যাব। প্রহ্লাদের গলা থেকে ঝরে পড়ল হতাশার অণু-কণিকা। বাসন্তী কী মনে করে হাত ধরে টানল প্রহ্লাদের. মশারীর দড়ি খুলে দিয়ে বলল, এত গরমে গায়ে আমি জামা রাখতে পারিনে। মানুষটা গিয়েছে কতদিন হল! শরীরটা আমার শুকনো কাঠের মত পুড়ছে...

—আর পুড়বে না। এবার থেকে আমি তোমাকে আগলাব।

—তা হয় না পদ্মর বাবা। দু-নৌকায় পা দিয়ে কোন মানুষটা সুখী হয়। তুমি একটু বসে চলে যাও। দিদি জানলে পুরো বস্তি জেনে যাবে। সবাই আমার মুখে থুতু দিক—এটা আমি চাইনে।

—তুমি যা চাও, তাই হবে। প্রহ্লাদ শক্ত হাতে চেপে ধরল বাসন্তীর হাত। সেই পাগল হাত চেখে বেড়াল বাসন্তীর শরীর। ফণা তোলা শরীরে তাপ জুড়িয়ে প্রহ্লাদ যখন নিস্তেজ তখন পায়ের শব্দে নড়ে চড়ে বসল বাসন্তী। ভয়ে ছোট হয়ে এল চোখ। গায়ের ঘাম আঁচলে মোছার শক্তিটুকু হারিয়ে ফেলল সে। তবু কোন মতে উঠে এল দরজার কাছে। ভেজান দরজা খুলে সে দেখল ধীর পায়ে তার ঘরের দাওয়া থেকে নেমে উঠোন পেরিয়ে চলে যাচ্ছে সরসী। মরা চাঁদের মত চেহারা তার। হাওয়ায় উড়ছিল খোপাভাঙা চুল। পিছন থেকে তাকে মনে হল বিসর্জনের প্রতিমা। ভয়ে গলা বুজে আসার আগেই বাসন্তী চিৎকার করে উঠল, দিদি, ও দিদি, শুনে যাও।

হাওয়ায় ভেসে গেল কথা। কাঁঠালগাছের পাতার আড়ালে ডেকে উঠল ভীতু কবুতোর। অস্পষ্ট আঁধারে ক্ষিপ্র পায়ে বাড়ির আঙিনা পেরিয়ে সরসী চলে গেল কাঁটা তারের বেড়ার কাছে। সেখান থেকে একবারের জন্যও সে পিছন ফিরে

তাকাল না। পড়ে থাকল সংসার, ঘর-দুয়ার। কাঁঠালগাছের চেনা ছায়া ছাড়িয়ে সে এসে দাঁড়াল পিচ রাস্তায়। বাসন্তীর হাঁক-ডাক তার কানে গেল না।

বছর ঘুরে গিয়েছে সরসীর কোন খোঁজ নেই। লালবাংলোর বাবুটা সাইকেল সারতে এসে প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করল, অনেক দিন হল, সরসী কেন কাজে আসে না?

প্রহ্লাদ কাচুমাচু মুখে বলল, বাবু, সে তো বছরের উপর বস্তি ছাড়া। কোথায় যে গেল বউটা, আমি তার কোন খোঁজখবর পাইনি! থানায় ডাইরি করেছি, নিজেও ঘুরেছি এদিক-সেদিক। সে তার অভিমান নিয়ে কোথাও চলে গেছে।

—যেখানেই থাক, দেখা তার সঙ্গে একবার হবেই হবে। সেদিন তুমি সরসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও। লালবাংলোর বাবুটা বলল, সরসীকে আমি অনেকদিন ধরে দেখছি, ওর ভেতরে কোন ছল-চাতুরীর বেড়া নেই। ওকে চেনা যায়, বোঝা যায়। আমার বাড়িতে কাজ করত বলেই বলছি—সরসীর মত সৎ মেয়েমানুষ এযুগে খুব কম পাওয়া যাবে।

প্রহ্লাদ চুপ করে শুনল কথাগুলো, তারপর মাথা চুলকে বলল, আমি ওকে খেদিয়ে দিই নি বাবু, ও স্বেচ্ছায় চলে গেল। আসলে ওর মধ্যে সন্দেহের পোকা ঢুকে ছিল। সেই বিষাক্ত পোকাই ওর মনটাকে নষ্ট করে দিল। আমি কত বুঝিয়েছি, ও আমার কথা শুনল না।

—না শোনাই স্বাভাবিক। তুমি যে ওকে ঠিকঠাক দেখতে না। বস্তির সবাই বলছে, তোমার দোষে বউটা পালাল।

—বস্তির মানুষ মিছে কথা বলছে, ওরা আমার দুশমন।

বছর ঘুরে আর একটা বছর এল; তবু সরসীর দেখা নেই। বাসন্তী তার নিজের ভুল বুঝে চলে গিয়েছে বস্তি থেকে। যাওয়ার সময় সে প্রহ্লাদকে বলেছে, আগুন খেলে মুখ তো পুড়বেই। আমি চলে যাচ্ছি পদ্মর বাবা, ঘরের মানুষটার খোঁজ পেয়েছি হাওড়ায়। আমি সেখানে একবার যাবই। ক্ষ্যাপাটাকে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত আমি বস্তিতে ফিরব না। বাসন্তীর সাফ কথায় মুষড়ে পড়েছিল প্রহ্লাদ। একটা বদ নেশার ঘোরে সে এতদিন আক্রান্ত হয়েছিল। বাসন্তীর কথাগুলো তার মুখের উপর থাপ্পড় কষিয়ে দিল। মনেপ্রাণে সে চাইল, সরসী ফিরে আসুক। পদ্ম-টগর আর যুঁই-ট্যাংরার মা হয়ে বেঁচে থাকুক। এতবড় সংসারে কেউ ফেলনা নয়। খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে প্রহ্লাদ বিড়বিড় করে বলল, হে ভগবান, আমি তো তোমার কাছে কোনদিন কিছু চাইনি। আমার আকাশের মরা চাঁদ তুমি ফিরিয়ে দাও! রূপের আগুনে আমার ডানা পুড়ে গিয়েছে। আমি ছটছট করছি। তুমি আমাকে শান্তি দাও। নাহলে যে আমি পাগল হয়ে যাব। দু'হাতে মুখ ঢেকে প্রহ্লাদ আর্তভরা কণ্ঠে বলল, হে আকাশ, তুমি আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছো?

# হুল

সামনে হিংস্র বুলডোজার। পিছনে একদল সশস্ত্র পুলিশ। মাখনলাল ওদের রিং-লিডার। খোদ ও সি তাকে বলেছেন, আজকের সাফাই অপারেশনের সব দায়-দায়িত্ব তোমার। আমি এস পি সাহেবকে রিং করে বলে দিয়েছি, যদি সাকসেস হও তাহলে তোমার প্রমোশন বাঁধা।

নিঃসন্তান মাখনলাল চাকরির লাল ফিতে ছাড়া আর কিছু জানে না। মমতা প্রায় ঘরে থাকে একা, সেও মনে মনে বিরক্ত। মাখনলাল তাকে বোঝায়, আর ক'টা বছর সবুর করো, তোমাকে আমি রাজরানি করে দেব। লোকাল থানার সব অফিসার আমার কাজ-কর্মে খুশি। দেখবে এ বার আমি ঠিক ছোটবাবু হয়ে যাব। হাঁটতে হাঁটতে মাখনলাল নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছিল। আজকাল পুলিশ লাইনের লোকজনদের মানুষ আর ভয় পায় না। কেন পায় না এর কারণ মাখনলালেরও অজানা। আগে পুলিশের নাম শুনলে অনেকেরই গলা শুকিয়ে যেত, এখন পুরো ছবিটাই অন্য। কটকটে গরমে পিচ গলছে রাস্তার। কালো পিচ মসৃণ কালকেউটের পিঠ যেন। মাঝে মধ্যেই ভারী বুট বসে যাচ্ছে রাস্তায়, ঘাম নামছে কপাল বেয়ে গলায়। গলা থেকে সুড়ুৎ করে চলে যাচ্ছে পেট এবং নাভির কাছে। নিজেকে ভেতরে ভেতরে তাতিয়ে রাখার চেষ্টা করে হেড-কনস্টেবল মাখনলাল। বড় সাহেবের মুখ যে ক'রেই হোক রক্ষা করতেই হবে। দশ ও দেশের সম্মান এর সঙ্গে জড়িত। পুরো পুলিশ ডিপার্টমেন্টের মান-ইজ্জতের দায় যেন তার ঘাড়ে ন্যস্ত। সাফাই অভিযানের চিন্তায় ভালো মতো খেতে পারেনি মাখনলাল। মমতা অভিমান করে বলেছিল, থানার ঝামেলা থানায় রেখে আসবে, ঘরে বয়ে আনবে না। ঘর তো আরাম করার জায়গা। এখানে যতক্ষণ থাকবে থানার কথা ভুলেও বলবে না।

মাখনলাল কতদিন ভেবেছে মমতার কথা রাখবে। কিন্তু ওই ভাবনাই সার। ঘরে চুপচাপ বসে থাকলে থানার কথা তার মনে পড়বেই। বড়বাবুর সে ভীষণ পেয়ারের লোক। চোর-ছ্যাচোড় ঠ্যাঙাতে তার জুড়ি মেলা ভার। এমন কায়দা করে আসামিদের আদা-ছ্যাঁচা করতে তার মতো আর কেউ পারে না। দাগী আসামি ধরা পড়লেই সে যত রাতই হোক না কেন মাখনলালের ডাক আসবে। নিজের কৃতকর্মের জন্য সে গর্বিত। তার একটা বেতের লাঠি আছে। লাঠি হাতে উর্দি গায়ে থাকলে তার মেজাজটাই পাল্টে যায় পুরোপুরি। সে তখন সামান্য পুলিশ নয়, শাহেনশা—আইনের রক্ষাকবচ।

হকার উচ্ছেদের কথা শুনে মমতা বলেছিল, ও সব ঝুট-ঝামেলায় যেও না।

গরিব মানুষের অভিশাপ কুড়িয়ে বড়লোক হয়ে কী লাভ। ডাল-ভাত যখন জুটে যাচ্ছে তখন সুখে-শান্তিতে থাকো।

মমতার কথাগুলো প্রেস্টিজ পাংচার করে দিয়েছে মাখনলালের, এ তুমি কী বলছ? যে সরকারের নুন খাই তার গুণ আমি গাইব না? পুলিশের কাজ কি তা হলে কপালে তিলক কেটে ভজন গাওয়া?

—যা ভাল বোঝ করো। মমতা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে অভিমানে; ফুটপাতে যারা দোকান দিয়েছে, সেই সব ছোট ছোট দোকানগুলোর উপর তার একটা অদৃশ্য ভালবাসার টান লুকিয়ে আছে। মাখনলালের যা বেতন তাতে সে কাচঘেরা দোকানে ঢুকতে সাহস পায় না। ও সব দোকানে লেখা থাকে FIXED PRICE, এক দর। একটু দরদাম করে জিনিসপত্র না কিনলে তার মনে খটকা থেকে যায়। কেনার আনন্দটাই মাটি হয়। এ তার মনের কথা। কিন্তু মাখনলালকে সে বোঝাবে কী করে? খাকি পোশাক পরলে লোকটার মেজাজ অন্যরকমের। সে তখন ঘরের বউকেও চিনতে পারে না। এ রকম ঘটনা বহুবারই ঘটেছে। সব কিছুকে মানিয়ে নেয় মমতা।

বুলডোজারের ঘ্যাড় ঘ্যাড় শব্দ আশেপাশের বাতাসকে ভীত আর দূষিত করে তোলে। বড় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে মানুষ। বাক্যহীন চোখে ভয়ের ফুলঝুরি মেশানো। নোটিশ অনেক আগেই পেয়েছে তারা। উচ্ছেদের দিনক্ষণ সবই জানে। তবু আশা যদি শেষবারের মতো রক্ষা পায়। এ রকম তো এর আগে বহুবার হয়েছে। দোকান ভাঙা হবে, দিনক্ষণ সব ঠিক, পরে কোনও কারণে হল না। এ বার সব বারের চাইতে আলাদা। এ বার কোমর বেঁধে লেগেছে প্রশাসন। সাফাই অভিযান বিফল হবে না।

ছোট মাইকে ঘুরে ঘুরে হুঁশিয়ার করে দেয় পেটমোটা গোপাল। তার আর এক বছর চাকরি বাকি আছে। গোপালের গমগমে গলা, বাতাসে ধ্বংসের জীবাণু মিশিয়ে দেয়। যে যা পারছে মালপত্তর সরাচ্ছে। বুলডোজার দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার মাঝখানে। পুরো এলাকা জুড়ে একশ চুয়াল্লিশ ধারা। বড়বাবু আসবেন ওয়ারলেস ফিটিং জিপ নিয়ে। হেড কোয়ার্টারে টাইম টু টাইম খবর যাবে।

শঙ্কিত দোকানদাররা মরা ছেলেকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার মতো দুঃখী মুখ করে মাল সরাতে ব্যস্ত। আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। যারা সরাতে পারল ভাল, যারা পারল না তাদের সব গেল। কত লোক যে ছুটে এল মাখনলালের কাছে। কাকুতি-মিনতি করে বলল, মাখনদাদা, এ বারের মতো মাফ করে দিন। সময় বেশি চাই না, মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ফুটপাত পরিষ্কার করে দেব। এ ভাবে চোখের সামনে বুকের পাঁজর গুঁড়িয়ে গেলে আমরা যে আর কোন দিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারব না।

মাখনলালের হৃদয় উর্দি পরলে পাষাণ। সে তখন কারওর দাদা-ভাই-কাকা

নয়। সে তখন পুরোদস্তুর পুলিশ। দেশের এবং দশের জন্য নিবেদিত প্রাণ। মোচে তা দিয়ে বলে, তোমাদের অনেক সময় দেওয়া হয়েছিল। টাইম ওভার। এখন আমাদের কাজ আমরা করব। তোমাদের কাজ তোমরা করো। ব্যস, মিটে গেল ঝামেলা।

ঝামেলা মিটতে সময় নেয় দু'থেকে আড়াই ঘণ্টা। ফাঁকা ফুটপাত দেখে মাখনলালের মনে হয় হিপি চুল হঠাৎ করে কামিয়ে ফেলা কোনও যুবক। কেমন ধাঁধা লাগে চোখে। চেনা সব কিছু তবু মনে হয় অচেনা। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে গর্ব অনুভূত হয় মাখনলালের। ওপরতলার অর্ডার সে যথাযথ পালন করতে পেরেছে। এত সব কিছুর পেছনে ভগবানের আশীর্বাদ নিশ্চয়ই আছে। মমতা বলে, ভগবান যা করে মঙ্গলের জন্য। ধ্বংসের মধ্যে কিসের মঙ্গল কুতকুতে চোখ মেলে খুঁজতে থাকে সে। ঘিঞ্জি এলাকাটা বেশ পরিষ্কার লাগছে। ঘরের সামনে-পেছনের ঝোপঝাড় কেটে ফেলার মতো। কী সুন্দর হাওয়া ছুটে আসছে। আগে কি হাওয়া এমন অলিম্পিক দৌড় দৌড়াতে পারত? পারত না। অনেকক্ষণ পরে মাখনলালের খৈনি খাওয়ার মন হয়। কোমরের বেল্টটা হালকা করে সে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছের ছায়ায় খৈনি রগড়াতে থাকে। বুলডোজারের হাঁটাচলা থেমে গেছে। অতবড় জান্তব দেহটা তার বিশ্রাম নিচ্ছে। মাখনলাল লৌহদানবটাকে দেখে অবাক বিস্ময়ে। হঠাৎ-ই তার মনে হয় সে ওই বুলডোজার। বুলডোজার না হলে কি এত বড় ধ্বংসখেলা কেউ খেলতে পারে? সামান্য ইতিহাস জ্ঞান আছে মাখনলালের। হিটলারের নাম সে শুনেছে। তাঁর কীর্তির কথাও পড়েছে। মাখনলাল খৈনি মুখে পুরে ভাবল—সে বিশ্বত্রাস হিটলার। সে লোকাল থানার সামান্য একজন হেড-কনস্টেবল নয়। মানুষ তো কর্মের দ্বারা সৌভাগ্যের শিখরে পৌঁছায়। সেও একদিন পৌঁছাবে। তাকে কেউ রুখতে পারবে না। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়কে কেউ কি থামিয়ে দিতে পারে!

থানার ও সি এলেন সবুজ জিপে চড়ে। হাতে রুল, কোমরে রিভলভার। কড়া ইস্ত্রি করা উর্দি। চকচকে বুটে রোদ পিছলায়। কাঁধের কাছে জ্বলজ্বল করছে তিনটে মেটালিক স্টার। ওই উজ্জ্বল তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে মাখনলালের চোখ স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায়, ও সি'র কোন কথা তার কানে ঢোকে না।

বড়বাবু সৎ-সজ্জন মানুষ, মা কালীর ভক্ত, পান-সিগারেট ছাড়া অ্যালকোহল সেবন করেন না, দায়বশত মাখনলালের কাঁধের উপর হাত রাখলেন, শবাশী দেওয়া গলায় বললেন, আমি জানতাম, তুমি ঠিক পারবে। তুমি পেরেছ মাখনলাল। শবাশ। পুলিশে তোমার মতো কর্মীর বড় প্রয়োজন, আই ফিল ইট। ভেবো না আমি অকৃতজ্ঞ। তোমার নাম আমি হেড-কোয়ার্টারে রিপিট করেছি। এস পি সাহেব বলেছেন, তোমাকে ক্যাশ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে।

মাখনলালের ছত্রিশ ইঞ্চি বুকের সাইজ চল্লিশ ইঞ্চি ছাড়িয়ে যায়, কিছুক্ষণ

সে কোনও কথা বলতে পারে না। নিজেকে সামলে নিতে আরও কিছুটা সময় নেয়, তারপর ঢোক গিলে বিনয় গদগদ কণ্ঠে বলে, স্যার, আমার ডিউটি আমি করেছি। গীতায় বলছে—মা ফলেষু কদাচনঃ।

—তুমি গীতা পড়?

—একটু আধটু, স্যার!

—ওয়েল, এই তো চাই। ও সি আবার পিঠ চাপড়ে দিলেন মাখনলালের। নিজের চোখে সব কিছু দেখে রিপোর্ট লিখে তিনি আবার থানায় ফিরে গেলেন। মাখনলাল আর থানায় গেল না। প্রচণ্ড টেনশনে তার শরীর খুবই ক্লান্ত। এ রকমই সাফাই অভিযান তো ক'দিন ধরেই চলছে। এক একটা এলাকার এক এক রকমের পরিস্থিতি। পাবলিক তো ঘুমিয়ে থাকা বাঘের মতো, কখন গর্জে উঠবে, ফুঁসে উঠবে তা আগাম কেউ জানে না। জনতার নাড়ি পড়তে পারে মাখনলাল। দোকানপাট ভেঙে ভেঙে তার এখন নেশা ধরে গিয়েছে। সে তখন হিটলার নয় দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার। এক দোকান থেকে আরেক দোকান তার দখল নিতেই হবে। এ যেন সাম্রাজ্যবিস্তারের মতো অদ্ভুত এক নেশা! এ নেশার বুঝি শেষ নেই। শুধু ভাঙ আর ভাঙ। যেটা ভাঙবে না সেখানে চালিয়ে দাও বুলডোজার। একেবারে হাতে-নাতে ফল। মাথা তোলা সাজানো-গোছানো দোকানগুলো একেবারে ধুলোয় মিশে যাবে। এর চেয়ে আনন্দ আর কী থাকতে পারে। সৃষ্টিতে যেমন আনন্দ, ধ্বংসেও বুঝি তার চেয়ে কিছু কম নেই।

মমতার জন্য ফজলি আম কিনে মাখনলাল ঘরে ফিরল। ঘামে ভিজে গেছে তার উর্দি। নুনের মানচিত্র বয়ে বেড়ায় তার খাকি পোশাক। মমতা হা করে দেখতে থাকে তার অক্ষত স্বামীকে। ভুস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে সে সুস্থ একটা দম নেয়। তার চিন্তা-ভাবনার দোলানটা থেমে যায়। উদ্বেগের সর মুছে যায় মুখ থেকে। ড্যামাড্যামা চোখে সে শুধু দেখতে থাকে ব্যস্তবাগীশ মাখনলালকে। মাখনলাল এই চাহনিতে কোনও বিব্রতবোধ করে না, বরং পুলকিত হয়, অমন হাঁ করে কী দেখছ?

মমতার কোনও উত্তর সাজানো নেই। সে শুধু দেখে, দেখতেই থাকে। মাখনলাল পাশে সরে আসে, ফজলি আম মমতার হাতে দিয়ে বলে, বড্ড গরম পড়েছে। খিদে খিদেও লাগছে। আমটা কাটো। খাব।

মমতা তবু নির্বিকার। কয়েক ঘণ্টার ভয় তার বুকটাকে বুঝি ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, এমন কষ্ট ভরা গলায় সে বলল, তুমি যাওয়ার পর থেকে আমি শুধু ঠাকুরকে ডাকছি।

—কেন?

মমতা ধীর গলায় বলল, যে কাজে তুমি ক'দিন থেকে মেতে আছ, সেই কাজটা যে খুব সহজ নয়। খবরের কাগজ পড়ি তো, খুব ভয় লাগে। এই দেখো না দু'জন পুলিশ গুরুতর আহত। কাগজে লিখেছ—। মমতা ফজলি আম রেখে

কাগজটা টেনে নিল টেবিল থেকে, পড়ো। সব লেখা আছে। জানো, পড়তে পড়তে আমার বুক কাঁপছিল। তোমার কথা খুব মনে পড়েছিল।

মমতার ভয়কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে হা-হা করে হেসে উঠল মাখনলাল, যারা আহত-নিহত হয় তাদের মতো বোকা পুলিশ তো আমি নই। আমার স্বভাব হল—ধরি মাছ না ছুঁই পানি। সরকারি কাজ করতে গিয়ে পৈতৃক জীবন আমি কোনও দিনও খোয়াব না। তা বলে আমি যে ফাঁকিবাজ তাও নয়। আমার মতো ডিউটিফুল পুলিশ খুব কম আছে। আমি এমন টেকনিকে কাজ করি যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। বুঝলে? মাখনলাল কোঁত করে থুতু গিলে নিল মুখের ভেতর, হাতের চেটোয় মুখ মুছে নিয়ে বলল, তোমাকে একটা সুখর দেওয়া হয়নি। জানো, আমাকে ক্যাশ অ্যাওয়ার্ড দেবেন এস পি সাহেব। বরাত ভাল থাকলে আমার প্রমোশনও হতে পারে। বড়বাবু আমার ফর-এ। আমার নামটা উনি হেড-কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মমতা উৎসাহিত হল না, বরং কিছুটা বিমর্ষ গলায় শুধোল, কিসের জন্য তোমাকে পুরস্কার দেবে ওরা?

আবার শরীর দুলিয়ে হেসে উঠল মাখনলাল, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বলল, সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কি রামের মাসি? তুমি দেখছি আমার কোনও কথা মন নিয়ে শোন না। শুনবে কেন, টাইমে সব কিছু পাচ্ছ তো—

মনঃক্ষুণ্ণ মমতা বলল, আমি তোমার চিন্তায় শুকিয়ে গেলাম। তুমি ডিউটিতে থাকলে আমার যে কী ভয় করে তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না।

—তাহলে আমি হাতে চুড়ি পরে ঘরে বসে থাকি? মাখনলালের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল উত্তেজনায়, জান, আজ আমি কতগুলো দোকান ভেঙেছি? শুনলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। ডিউটির সময় আমি কাউকে চিনি না। কত লোক আমার হাতে-পায়ে ধরল, চোখের জল ফেলল, আমি তাদের হুট-আউট করে দিয়েছি।

—কাজটা তোমার ভাল হয়নি। মমতা মিনমিনে গলায় শুধোল, যাদের দোকান তোমরা ভেঙে দিলে তারা কি কিছু বলল না? কেউ কি বাধা দিতে আসেনি? সবাইকি চুপচাপ মেনে নিল এ অন্যায়?

—বাধা দেবার কারওর সাহস থাকলে তো! কে বাধা দেবে পুলিশকে? বাধা দিলে মেরে একেবারে হাড়গোড় চুরচুর করে দিতাম। চেনে না তো আমার রাগ। রেগে গেলে আমি একেবারে অ্যাটম বোম। সব ছারখার করে দেব। মাখনলাল হাঁপিয়ে গিয়ে ঘনঘন নিঃশ্বাস টানল, কপালের ঘামগুলো খাকি জামায় ঝরে পড়তেই সে কেমন দার্শনিক হয়ে গেল, পাবলিকের এখন আর শিরদাঁড়া নেই। হাড় সব জল হয়ে গেছে। সেই জলের উপর আমি সাঁতার কেটে চলে এলাম।

—কেউ একবার বাধাও দিল না? মমতা আবার ব্যাকুল হয়ে শুধোল, সব

মানুষ কি তা হলে গাছ হয়ে গেছে? কারওর কি কোনও প্রতিবাদ করার সাহস নেই?

—না নেই। মাখনলাল চিৎকার করে উঠল, সব ভেড়া হয়ে গেছে ভেড়াদের বাগে আনতে বাঘেদের বেশি সময় লাগে না।

—এই বাঘ-ভেড়ার খেলা আমার ভাল লাগে না। মমতা খুব অসহায় গলায় বলল কথাগুলো।

মাখনলাল মমতার কথাকে ঢেকে দিল, আমার খুব ভাল লাগে। কারওর ঘর ভাঙতে পারলে আমার খুব আনন্দ হয়। ফিচেল হাসি মাখনলালের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল, থেমে-থেমে সে বলল, ওরা ভাবছেটা কী? জোর যার মুলুক তার? চলবে না। সব গুঁড়িয়ে তছনছ করে দেব। জবরদখল চলবে না। ভেঙে চুরে সব বল খেলার মাঠ করে দেব।

জলে ধুয়ে ফজলি আমের খোসা ছাড়াল মমতা। খুব ভীতু চোখে সে মাখনলালকে দেখছিল। এতদিনের চেনা মানুষ তবু মনে হয় কত অচেনা। বাস্তবিক তার ঘরের মানুষটা কি তা হলে এত নিষ্ঠুর, নাকি ওই খাকি পোশাক পরলে নিষ্ঠুর হয়ে যায় মানুষ? এ ধাঁধার উত্তর মমতার জানা নেই। সে মাখনলালের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারছে না। বিরাট এক অহংবোধ মাখনলালকে গ্রাস করেছে। ঘরভাঙার নেশায় সে বুঁদ হয়ে আছে তার বুকের ভেতরে অদম্য সাহস আর শক্তি। কেউ তাকে বাধা দেয়নি এতে তার সাহস আরও বেড়েছে। এই মিথ্যে সাহসের যে কোনও দাম নেই—এটা মমতা কী ভাবে তাকে বোঝাবে।

ফজলি আমে কামড় মেরে মাখনলাল বলল, মালদার হবে মনে হচ্ছে। আর দু-কেজি আনতে পারলে ভাল হত।

—বেশি আম খাওয়া ভাল নয়, ফোঁড়া বেরবে।

মমতার কথায় বিরক্ত হল মাখনলাল, আমার এই চামড়ায় ফোঁড়া কেন একটা ঘামাচি বেরবার সাহস হবে না। এটা স্টিল বডি, বুঝলে! এখানে কেউ খাপ খুলতে পারবে না।

এ কথার পরে মমতার আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না। মাখনলাল আম খেয়ে গামছায় মুখ-হাত মুছে নিল। খাকি পোশাক খুলে লুঙ্গি পরে খাটের উপর চিৎপটাং শুয়ে পড়ল। মমতা তার পাশে গিয়ে শুল।

ছোট ঘর, জিনিসপত্রে ঠাসাঠাসি। স্টিলের আলমারি এখনও কিনতে পারেনি মাখনলাল, দশ বছরের পুরনো কাঠের আলমারিটা তার চোখের পর্দায় ভেসে উঠল। বালিশে মাথা দিয়ে শুলে আলমারিটা নজরে পড়ে প্রথমে। ঘুম না আসা পর্যন্ত মাখনলাল চেয়ে-চেয়ে দেখতে থাকে আলমারিটাকে। আজও সে চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টি মেলে। মমতা তার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে অভ্যাসমতো। এত কিছুর পরেও মমতার এই আদর-সোহাগমাখা হাত মাখনলালের ভাল

াগে। তার ঘুম আসছে না, সে দেওয়ালের দিকে চেয়ে আছে অপলক। য়েকটা বোলতা ডানায় ব্যস্ততার গন্ধ ছড়িয়ে উড়ে যাচ্ছিল আলমারির পেছনে। মাখনলালের আরাম খাওয়া মাথায় উঠল, তার পুলিশি মনে উঁকি দিল সন্দেহ। ঘাড় উঁচু করে সে দেখতে চাইল বোলতাদের বেপরোয়া গতিবিধি। কিছু বুঝতে না পেরে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। ভারিক্কি চালে হেঁটে গেল আলমারির পেছনে। চোখে পড়ল বহু বোলতার যত্নে বানান বিশেষ ধরনের চাকটা। রাগে-উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল মাখনলালের জোড়া চোখ, চিৎকার করে বলল, দেখ-দেখ, কী কাণ্ড করেছে বোলতাগুলো এখানে? ওদের কি জীবনে ভয় ডর নেই? ওরা কি জানে না এটা পুলিশের ঘর?

কিছু বুঝতে না পেরে মমতা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল, তার হাবাগোবা মুখ দেখে তাচ্ছিল্যে বেঁকেচুরে গেল মাখনলালের ঠোঁট, সারাদিন কি ঘরে বসে ঘুমোও নাকি? বোলতাগুলো ঘর বেঁধেছে, ডিম পেড়েছে আর তুমি দেখতেই পেলে না! এত ম্যাদামারা হলে চলবে, তুমি না একজন পুলিশের বউ?

মমতার চোখের সামনে ভেসে উঠল বোলতাদের নিখুঁত বানান চাকটা। সে ধর্মভীরু মহিলা তাই বিড়বিড় করে বলল, ডিম পাড়ার সময় হলে পিঁপড়েরা ঘর বাঁধে, বোলতা ঘর বেঁধেছে তাতে দোষ কোথায়?

—এটা কি ওদের বাপের ঘর? মাখনলালের গা বেয়ে ঘাম নামল উত্তেজনায়, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা! যে অন্যের ঘর ভেঙে বেড়ায়, তার ঘরে এসে ঘর বাঁধা। এ তো জবরদখল, অন্যায়। আমি কোনওদিন এমন অন্যায় সহ্য করব না। আমি সব ভেঙেচুরে সাফ করে দেব।

মমতার চোখ-মুখ করুণ হয়ে উঠল, বোলতাগুলো তো আমাদের কোনও ক্ষতি করেনি, কেন মিছিমিছি ওদের চাকটা ভেঙে দেবে।

—ভাঙব, হাজারবার ভাঙব। দাঁত-মুখ বিকৃত করে মাখনলাল সরিয়ে দিল মমতাকে, খবরদার, তুমি এখানে এসো না। তোমার দয়ার শরীর। তোমার চোখের দিকে তাকালে আমি দুর্বল হয়ে যাব। আমি তো ভেড়া হয়ে বাঁচতে চাই না।

মমতা বাধ্য হল খাটে ফিরে আসতে। মাখনলাল বেতের লাঠিটা নিয়ে ভাঙতে গেল বোলতার চাক। আলমারির পেছনে হলুদ রঙের পোকাগুলো জেদ করে বসেছিল তখনও। কয়েকটা বোলতা উড়ছিল চাক ঘিরে। বিপদের গন্ধ বুঝে তারাও সতর্ক। মাখনলালের রক্ত ফুটছিল টগবগিয়ে, বেতের লাঠিটা জোরে চাক লক্ষ করে মারতেই দুলে উঠল মোমের বাসা। ভাঙল না, দুলতে থাকল ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো। বাতাসে গুঞ্জন উঠল ডানার। হতচকিত বোলতাগুলো প্রথমে উড়ে গেল ভয়ে। তাদের রণে ভঙ্গ দেওয়ার চেহারা দেখে তৃপ্তির হাসি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল মাখনলালের ঠোঁটে। সে ভাবছিল তার মতো বীরপুরুষ ভূ-ভারতে আর কেউ নেই। সে অপ্রতিরোধ্য, দিগ্বিজয়ী

আলেকজান্ডার। তাকে কেউ বাধা দেবার নেই। যে তাকে বাধা দিতে আসবে বোলতাগুলোর মতো শোচনীয় দশা হবে তাদের। বীরত্বের হাসিটা যখন আরও গাঢ় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল মাখনলালের ঠোঁটে, তখনই সে চাইল পুরো চাকটা ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিতে। শেষবারের মতো বেতের লাঠিটা বোলতার চাকে মারতে গেলে চাক ভেদ করে বেরিয়ে আসে আত্মগোপন করে থাকা এক ঝাঁক বোলতা। তারা আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাখনলালের খোলা শরীরে। বিষাক্ত হুল জ্বালা ধরিয়ে দিল পুলিশী রক্তে। একটা বদরাগী বোলতা কামড়ে ধরল মাখনলালের চোখের কোণ। কিছুতেই ছাড়ল না। কয়েকটা বোলতা কপালে হুল ফোটাল যন্ত্রণার। পুরো চাকটা ভাঙতে পারল না মাখনলাল, তার আগেই মুখে হাত চেপে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মেঝেতে বসে পড়ল। চেঁচিয়ে ডাকল মমতাকে কই গো, ছুটে আসো। এই দেখ, বোলতাগুলো আমার কী হাল করেছে!

মমতা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল মাখনলালের কাছে। উবু হয়ে বসে চোখের কাছে হুল ঢুকানো বোলতাটাকে কোনওমতে ছাড়াল। তারপর দরদভরা গলায় শুধোল, কেন গিয়েছিলে গো? ইস কী ফুলে গিয়েছে! বড্ড জ্বলছে বুঝি?

—জ্বলছে তো! এ যে দেখছি সাপের বিষের চেয়েও বেশি জ্বলন মাখনলালের গলা কাতর হয়ে উঠল। নখ দিয়ে হুলগুলো তুলতে চাইছিল সে না পেরে অস্থির হয়ে বলল, দেখ, কেমন ফুলে গিয়েছে মুখটা। ওদের আমি পুড়িয়ে মারব। আমার নামও মাখনলাল সরদার। আমি ছাড়ব না। দেখে নিও আমি ছাড়ব না।

মমতা পরম মমতায় খৈনির ডিবা থেকে চুন বের করে লাগিয়ে দিচ্ছিল মাখনলালের মুখে। নির্জীব হয়ে হাত-পা এলিয়ে মাখনলাল শুয়ে ছিল মেঝেয় তার মনে একটাই প্রশ্ন, বোলতা যা পারে, মানুষ কেন তা পারে না।

# চাতক

ঝড়ো কাকের মতো বস্তির পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে ড্রেন। জলের রঙ মিশকালো, যারা থাকে তারাও কালো কালো। সুচিত্রা যেদিন এখানে এল সেদিন থেকে ওই ড্রেনটার উপর তার চরম ঘেন্না। নয়নাকে যেতে দেয় না ওখানে। পড়ে গেলে জামা-কাপড় নোংরা হবার ভয়। সাত বছরের নয়না কথা শোনে না, সে বড় বেয়াড়া। বকলে শাসন করলে গাল ফুলিয়ে বলবে, এখানে আমি কার সঙ্গে খেলব, মা? কেউ আমাকে খেলায় নেয় না। নয়নার কথা মিথ্যা নয়। তিন মাসের উপর হতে চলল এখানে আসার। তবু নয়নার একটাও বন্ধু জুটল না! আশেপাশের ফ্ল্যাটগুলোয় যাঁরা থাকেন তাঁরা বেশিরভাগ সময় টিভি দেখতে ভালবাসেন। বিকেলে সামনের সবুজ মাঠটায় এসে বসে সবাই। দু-একজন যে তাকে দেখেনি তা নয়, তবে দেখেও না দেখার ভান। পবিত্র প্রথম দিনই সতর্ক করে বলেছিল, এখানে কারও সঙ্গে বেশি মেলামেশা করার চেষ্টা করিস না। ওরা তোকে বুঝবে না, দুঃখ পাবি। আর শোন, নয়নাকেও বাইরে যেতে দিবি না। ও তো ছোট, সবার কাছে তা হলে সব ফাঁস করে দেবে।

'ফাঁস' শব্দটায় তীব্র হোঁচট খেয়েছিল সুচিত্রা। পবিত্র তার চাইতে মাত্র দু-বছরের বড়, এখনও বিয়ে করেনি, ইস্কুলের মাস্টারি নিয়ে সে চলে এসেছে এই শৈল শহরে। তার কোয়ার্টারটা ছোট, তবে তিনটে মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে থাকতে পারে ভালভাবে। পবিত্রর যদি বিয়ে হয়ে যেত তাহলে সুচিত্রা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত, কে তাকে আশ্রয় দিত? তাকে তো বাধ্যতামূলকভাবে পচে মরতে হত অতনুর ঘরে। মুখ বুজে সহ্য করতে হত অতনুর অত্যাচার। এখনও শরীর থেকে অত্যাচার আর নির্যাতনের দাগগুলো মেলায়নি ভালভাবে। এতদিন হয়ে গেল, চোখ বুজলেই অতনুর লাল, নেশাচ্ছন্ন কঠিন চোখদুটো তাকে ক্ষুধার্ত হাঙরের মতো গিলতে আসে। তখন ভয়ে কাঠ হয়ে যায় শরীর, ফ্রিজের বাইরে রাখা বরফের মতো কুলকুল করে ঘামতে থাকে সে। তার মা ভাবগম্ভীর গলায় বলে, সুচিত্রা, মেয়েদের এত অধৈর্য হলে চলে না। জীবনটা হাওয়া অফিসের মোরগ নয়। নিজেকে ধীর-স্থির রাখ। নাহলে ঠকবি। জীবনভর কাঁদবি। একমাত্র পবিত্রই তাকে কোনওদিন জীবন নিয়ে কোনও কথা বলতে আসেনি। সে প্রকৃত বড়দার মতোই বলেছে, তোর ব্যক্তি স্বাধীনতায় আমি কোনওদিন হাত দেব না। অতনুকে তুই মানিয়ে নেবার চেষ্টা কর।

ঠোঁট শক্ত করে সুচিত্রা বলেছে, তা আর হয় না, দাদা। যে মানুষ নয়, তার সঙ্গে মানুষের ব্যবহার করতে যাওয়া ভুল। আমি ন-বছর ধরে চেষ্টা করেছি ওর সঙ্গে শরবতের চিনির মতো মিশে থাকতে। ও আমাকে বালি ভেবে সরিয়ে

দিয়েছে। শুধু তাই নয়, নেশা করে এলে ওর মাথার কোনও ঠিক থাকে না। আমি আর কত মার খাব বল? মার খেয়ে-খেয়ে আমার এই শরীরে আর কিছু নেই। তুই যদি আমাকে না নিয়ে যাস তাহলে আমার মরা মুখ দেখবি।

বোনের অশ্রু ধোওয়া কঠিন শব্দগুলো কিছুতেই পবিত্রকে স্বস্তি দিতে পারেনি। সেও অতনুকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে হাজারবার। অতনুর কাঁচা কঞ্চির স্বভাব, সে মুচকাবে তবু ভাঙবে না। একদিন সুস্থ মাথায় মুখের উপর বলে দিল, দাদা, কাচের বাসন ভেঙে গেলে আর জোড়া লাগে না। তুমি সুচিকে এখান থেকে নিয়ে চলে যাও। ও আমার সংসারে আগাছা নয়, বিষাক্ত ক্যাকটাস। ওকে আমি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

পবিত্র ভাঙা মন নরম করে বলেছিল, মাথা গরম করো না। নয়নার মুখ চেয়ে তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও।

ওর জেদকে আমি কেন ভগবানও ক্ষমা করতে পারবে না। অতনুর কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়েছিল গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের ঝাঁঝ, যদি ভাল চাও তো তুমি ওকে নিয়ে যাও। ওর মুখ দেখে আমি আমার জীবনটাকে আর সুন্দর করতে পারব না। আমার যা হবার তা তো হবেই, ওর কোনও ক্ষতি হোক আমি তা চাই না। নয়নার জন্য আমার স্নেহ-মমতা থাকবে। নয়না যদি আমার কাছে থাকতে চাই তো থাকুক। আমি ওকে হেস্টেলে রেখে দেব। ও যদি ওর মায়ের সঙ্গে চলে যায়, তাতেও আমি বাধা দেব না। আমি একা থাকতে চাই, এর বেশি আমার আর কিছু বলার নেই।

পবিত্রকে যেতে হয়নি, সুচিত্রাই এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় নয়নার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে চলে এসেছিল তাদের সাবেকি আমলের বাড়িটায়। বাবা-মা দুজনেই অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সুচিত্রা আর ফিরে গেল না। কলকাতা থেকে সাত দিন পরেই পবিত্রর নামে টেলিগ্রাম এল। হেডমাস্টার মশাই কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন. আপনার বাড়ি যাওয়া দরকার। ক'দিন ছুটি নিয়ে কলকাতা থেকে ঘুরে আসুন।

সুচিত্রার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই প্রথম বুকের ভিতরে অস্থির একটা কাঁপুনি টের পেয়েছিল পবিত্র, পাড় ধসে পড়া খরস্রোতা নদীর মতো মনে হয়েছিল সুচিত্রাকে। নির্জন ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ভাই-বোনের কথা হল অনেকক্ষণ। পবিত্র চেষ্টা করেছিল সুচিত্রাকে অতনুর কাছে ফিরিয়ে দেবার। আঁচলে চোখের জল মুছে সুচিত্রা বলেছিল, আমি কোনওদিন পিছন ফিরে তাকাইনি, আর তাকাবও না। তোর যদি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে ঘেন্নাবোধ হয় তা হলে আমি তোর সঙ্গে যাব না। এত বড় পৃথিবীতে আমি যদি বাঁচতে না পারি তাহলে মরতে তো পারব। সংসার কেড়ে নিলেও মৃত্যু তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

হাওড়া থেকে তিনশো কিলোমিটার পথ জানলার ধারে বসে বাইরেব চলন্ত

দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে মুখে ফেলা লজেন্সের মতো ফুরিয়ে গেল। স্টেশনে নেমেই পবিত্র বোনের দুঃখী মুখের দিকে তাকিয়ে আর্দ্রস্বরে বলেছিল, তুই যা সিদ্ধান্ত নিলি তা এখনও আমি মন থেকে মানতে পারছি না। অতনুর কথা তোর আরও অনেকবার ভেবে দেখা দরকার। ও মদ খায় মানছি. কিন্তু মদ খেলেও সে তো তোর স্বামী। তোরা দেখে-শুনে বিয়ে করেছিস। এখন সম্পর্কে চিড় ধরেছে বলে তা একেবারে দু টুকরো করে দিবি তা ঠিক নয়। আমি তোর দাদা। আমি চাই না তোর মনের আগুন দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ুক। আমি চাই তুই তোর সুন্দর মন দিয়ে আবার আগের মতো অতনুকে জয় করে নে। পালিয়ে বেড়ানোর মধ্যে কোনও গর্ব মিশে নেই। ক্ষমার মধ্যেই তো মানুষের গর্ব-ভালবাসা ফুলের রেণুর মতো ছড়িয়ে থাকে।

একটাও কথা না বলে সুচিত্রা হেঁটে এসেছিল রিকশ স্ট্যান্ড অবধি। বাসায় পৌঁছাতে রোদ পাকা কমলার চেহারা নিল। চারদিক মায়াময় সুন্দর হয়ে উঠেছিল তার অস্থির চোখে। এখানে সবুজের বিজ্ঞাপন সর্বত্র। বাতাস ইঙ্গিতবাহী। ঘাসমুখ ক্ষমার প্রতিভূ। আকাশ উদার, দয়াময়ী। আশেপাশের ফ্ল্যাটগুলোয় শান্তির জল ছিটানো। কেউ জোর গলায় কথা বলে না, কারও উৎসুক চোখ অপরকে বিদ্ধ করে না। এখানে সবাই নিজেকে নিয়ে মত্ত। এখানকার মানুষজন যেন এক একটা বর্ষীয়ান বৃক্ষ। প্রথম দর্শনে সব কিছু ভাল লেগেছিল সুচিত্রার। এত ভাললাগা অতনুর ওখানে নুড়ি পাথরের মতো ছড়িয়ে নেই। পবিত্রর এলোমেলো ঘরখানা সে ক'দিনের মধ্যেই গুছিয়ে ফেলল নিজের মনের মতো করে। নয়নাকে প্রথম প্রথম সে ঘরের বাইরে বেরতে দিত না। শিশুরা চঞ্চল পাখি। ওদের শাসনের খাঁচায় কত দিন আটকে রাখা যায়? একটু সুযোগ পেলেই সামনের মাঠটাতে গিয়ে দাঁড়াত নয়না, আর দু-চোখে মুগ্ধতা মিশিয়ে সে দেখতে থাকত কিছু দূরের বস্তিটাকে। এইভাবেই তার সাহসের লতাটা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। একদিন সে সবুজ মাঠ পেরিয়ে চলে গেল বস্তির ড্রেনটার কাছাকাছি। কালো নোংরা জলের স্রোতের দিকে তাকিয়ে সে যেন কী ভাবছিল। তখনই মংলুর বাবা নেশায় চুর হয়ে কী সব বলতে বলতে টাল সামলাতে না পেরে ড্রেনের মধ্যে চিৎপটাং ব্যাঙের মতো পড়ে গেল। প্রথমে হাততালি দিয়ে নেচে উঠেছিল নয়না, পরক্ষণেই তার বাবার কথা মনে পড়ে যেতেই মুখ শুকিয়ে আমচুর হয়ে গেল। বাবাকে সে মদ্যপ অবস্থায় কতদিন দেখেছে। দেখে দেখে তার চোখ সওয়া। এখন আর পথেঘাটে মাতাল দেখলে তার ছোট্ট বুকটা কেঁপে ওঠে না। বরং কৌতূহলী হয়। চোখ জোড়া চিকচিকিয়ে ওঠে। তার ধারণায় যারা মদ খায় তাদের প্রত্যেকেরই চোখ জবাফুলের মতো লাল হয়। চোখ লাল হলে তারা ঘরে এসে উঁচু গলায় ঝগড়া করে। অল্পতে রেগে ওঠে, মারধর করে, চুলের মুঠি ধরে দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেয়। মংলুর বাবা নিশ্চয়ই মংলুর মাকে খুব মারে। মংলুর বাবার চোখ দুটো কি জবাফুলের

চেয়েও টকটকে লাল? ড্রেনের দিকে ঝুঁকে পড়েও নয়না দেখতে পায়নি সেদিন। হাঁপাতে হাঁপাতে ভীতু খরগোশের মতো ছুটে এসেছিল সবুজ মাঠটায়। তারপর এক ছুটে ঘরের ভেতরে। সুচিত্রা কিছু বুঝতে না পেরে শুধিয়েছিল, কোথায় গেছিলিস, অমন যে হাঁপাচ্ছিস?

—জান মা, মংলুর বাবা ড্রেনে পড়ে গিয়েছে! নয়নার চু-চোখে বিস্ময় মাখানো ভয়।

—মংলু কে?

—ওঃ মা, তুমি জান না বুঝি? নয়না পাকা দিদিমণির মতো চোখ করে বলেছিল, ওই যে বস্তিটা দেখছ না, ওখানে ওরা থাকে। মংলু সকাল-বিকেলে ডাংগুলি খেলে। ওর কত বন্ধু। জান মা, আমাকে মংলু খেলায় নেবে বলেছে।

—খবরদার তুই আর ওখানে যাবি না। সুচিত্রার গালে কেউ বুঝি লাল রঙ ঘষে দেয়, ওদের সঙ্গে মিশবি না। ওরা খুব বদমায়েশ। তোর মামা জানতে পারলে বকবে। এসব কোনও কথাই নয়নার কানে ঢুকল না। সে তার নিজের আবেগের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে ভালবাসে, জান মা, মংলুর বাবা আজ মদ খেয়েছে। মদ খেলে কি সবার চোখ বাবার মতো লাল হয়ে ওঠে?

—চুপ কর। চাপা ধমক দিয়ে মেয়েকে থামিয়ে দিতে চাইল সুচিত্রা, কিন্তু নয়না মায়ের রক্তচক্ষুকে ভয় পায় না। সে দ্বিধাহীনভাবে বলল, মংলুর বাবা মদ খেয়ে ড্রেনের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। নোংরা জলগুলো ওর উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। ও মা, তুমি চলো না মংলুর বাবাকে ওঠাবে। নাহলে যে লোকটা মরে যাবে। ঠাস করে একটা চড় মেয়ের নরম গালে কষিয়ে দিল সুচিত্রা, টোকা দেওয়া ফুলের মতো নয়, ঝড়ে বিধ্বস্ত ফুলের মতো যন্ত্রণায় কেঁপে উঠল নয়না, তার সেই অবুঝ কান্না কিছুতেই আর থামতে চায় না। ঠোঁট ফুলিয়ে শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁদে ওঠে সে। সুচিত্রা অপ্রস্তুত। নয়নার কচি চুলে স্নেহের হাত বুলিয়ে বলে, কাঁদিস না। তোকে না কত দিন শিখিয়েছি—'মদ' বলতে নেই, 'জল' বলতে হয়।

—কেন মদ বললে কী হয়? আবার ঠোঁট ফুলে ওঠে নয়নার, চোখের জল হাতের চেটোতে মুছে নিয়ে সে শুধায়, বাবা যখন মদকে মদ বলে, কই তুমি তো তখন কিছু বল না? আমি বললে যত দোষ। দাঁড়াও মামা আসুক, আমি সব বলে দেব। তিন মাসেই এখানকার সবাই জেনে গিয়েছে সুচিত্রার পূর্ব ইতিহাস। শাক দিয়ে যেমন মাছ ঢাকা যায় না তেমনি অভিনয় দিয়ে সত্যিকারের জীবনটাকে আড়াল করা যায় না। জীবন তার নিজস্ব পথ ধরে চলতে ভালবাসে। প্রথম প্রথম পবিত্রও চেয়েছিল বোনের ক্ষতচিহ্নগুলোকে সান্ত্বনার মলমে ঢেকে দিতে। কিন্তু সেও অপারগ। বাংলার মাস্টারমশাই হিমাদ্রির কাছে ধরা পড়ে গেল। মাকড়সার জালে লটকে যাওয়া অসহায় মাছির মতো মুখ করে সে বলেছিল, সুচিত্রা আমার বোন। এখানে বেড়াতে এসেছে। ক'দিন থেকেই চলে যাবে।

এক মাস পরে হিমাদ্রি আবার সস্ত্রীক বেড়াতে এসে দেখল সুচিত্রা তখনও যায়নি। ঘর আলো করে বসে আছে, নয়না তার সামনে খাতা নিয়ে অঙ্ক কষছে। তখনই সন্দেহটা বীজ পুঁতে দিল মনে। চা খাওয়ার পরে সিগারেটে সুখটান দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, কী ব্যাপার পবিত্র, তোমার বোন যে এখনও গেল না? পবিত্র কী জবাব দেবে, তার মুখে তালা-চাবি আঁটা। হিমাদ্রির স্ত্রী রমা হাসতে হাসতে মোক্ষম কথা ছুঁড়ে দিল, দাদার বাড়িতে সুচিত্রা তো বেড়াতে আসেনি, থাকতে এসেছে। নয়না এখানকার প্রাইমারি ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। আমি নয়নাকে রোজই তো ইস্কুলে যেতে দেখি। সুচিত্রা ওকে পৌঁছে দিয়ে আসে। আবার ইস্কুল ছুটি হলে নিয়ে আসে। ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় আরক্ত পবিত্রর মুখমণ্ডল। নিজেকে বাঁচাবার মতো বর্ম তার আর অবশিষ্ট নেই। সুচিত্রার মুখের দিকে তাকালে তারও তো বুক ভেঙে যায়। মায়ের কথা মনে পড়ে, জেদ মানুষকে জঙ্গলে নিয়ে যায়। মেয়েদের জেদ মেয়েদের পায়েই কুড়ুল মারে। মানিয়ে নেবার ধর্ম যে রপ্ত করতে পারে না—সে তো এ সংসারে অচল পয়সা। সুচিত্রা কি তাহলে মায়ের ভাষানুযায়ী অচল পয়সা? বোনকে অচল পয়সা ভাবতে মন থেকে সায় দেয় না পবিত্রর। কাউকে অসুখী দেখলে নিজের কি ভাল লাগে? আয়না তো সবসময় সত্যি কথা বলে। পবিত্র হার মেনে নিয়েছে। যা সত্য তাকে সে আড়াল করে কোথায় রাখবে? সুচিত্রার যা বয়স, এই বয়সে মেয়েরা দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারে। তা ছাড়া সুচিত্রা রীতিমত সুন্দরী। ওর ঢল নামা চুলের বাহার যে কোনও দামি কোম্পানির শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন হতে পারে। ওর ছিপছিপে শরীরটা শুধু দুঃখ লুকিয়ে রাখতে পারে তা নয়, বয়সকেও আড়াল দিতে সক্ষম। ওর কালো দীঘল চোখের দিকে তাকালে এখনও অনেক পুরুষের বুকে কাতলা মাছের ঘাই দেওয়া ঢেউ উঠতে বাধ্য। সুচিত্রার ভবিষ্যৎ নিয়ে পবিত্র তাই রীতিমত চিন্তিত। কতদিন সে এ বোঝা বইতে পারবে, কতদিন? ঘাড় নুইতে নুইতে মাথা একদিন মাটিতে ঠেকে। মুখ লেগে যায় ঘাসে। মানুষ তখন ভারবাহী গাধা। অতনুর ঠিকানায় রেজিস্ট্রি করে চিঠি দিয়েছিল পবিত্র। ওকে বারবার করে আসার কথা লিখেছিল। অতনু আসবে না, মরে গেলেও না। সুচিত্রা বা নয়নার জন্য তার হৃদয়ে কতটুকু জায়গা আছে কে জানে? এমন পাথরমানুষ পবিত্র কি এর আগে কোনওদিন দেখছে? এতদিন হয়ে গেল সে ভুল করেও কোনওদিন সুচিত্রার মুখে অতনুর নাম পর্যন্ত শোনেনি। কোনও কারণে প্রসঙ্গ উঠলে সে উঠে যায় কাজের অছিলায়। আলোচনায় ইতি টেনে দিতে তার মতো দক্ষ আর কেউ নেই। এত অভিমান, বুক ভরা জ্বালা-দহন নিয়ে কী ভাবে বেঁচে থাকবে সুচিত্রা? ঘরের জানলা খুললেই দীর্ণ বস্তির ছবিটা ভেসে উঠে সুচিত্রার চোখে। পবিত্র দশটার আগেই ইস্কুলে চলে যায়। নয়নাকে ইস্কুলে পৌঁছে আসার পর থেকে সময় আর কিছুতেই কাটতে চায় না। অখণ্ড অবসর বুকে পাথর চাপিয়ে দেয়। গাছপালা,

পথঘাট, মানুষের ব্যস্তমুখর কোলাহল ছাপিয়ে মন চলে যায় কোথায় তা সুচিত্রা নিজেও জানে না। ভাবভালবাসার বিয়ে মৌমাছি উড়ে যাওয়া মৌচাকের মতো শ্রীহীন হয়ে পড়ে এটা তার আগে জানা ছিল না। অতনু বরাবরই ব্রিলিয়ান্ট। একই কলেজে পড়ত। ডিবেট কমপিটিশনে ওরা দু-জনে ছিল দু জনের বিপরীতে। তবু বৈপরীত্যের মধ্যে ভালবাসার ভ্রমর উড়ে এল। ঘর বাঁধার স্বপ্নে বিভোর হল। চাওয়ার তীব্রতার মধ্যেই বিয়ের সানাই বেজে উঠল। তখন কি জানত সুচিত্রা তার ফাটা কপালের কথা? মদ খাওয়াটা কি প্রধান উপলক্ষ এই বিচ্ছেদের? জানলার শিক ধরে সুচিত্রা দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে থাকে হারিয়ে যাওয়া চাতক পাখিটাকে। তৃষ্ণা মিটে যাওয়ার পর চাতক কোথায় আশ্রয় নেয়? চাতক কি কোনওদিন ঘর বাঁধে অন্য দশ-পাঁচটা পাখির মতো? চাতকের স্বভাব কেন অন্য পাখিদের মতো হয় না? কেন বর্ষার জল ছাড়া তার জীবন বাঁচে না? চোখের জল মুছে নিলেও কাজের বউ মংলুর মায়ের কাছে সুচিত্রা ধরা পড়ে গেল। ঘর মোছা থামিয়ে মংলুর মা শুধোয়, দিদি, তুমি এত কী ভাব বল তো? বেশি ভাবলে মানুষের মাথা তেতে চুল উঠে যায়। তোমার দেখছি সব আলাদা। তুমি অত ভাব অথচ তোমার চুলগুলা কত লম্বা আর সুন্দর! খোঁপা বাঁধলে তোমাকে সিনেমার বউগুলার মতো দেখায়।

মংলুর মাকে কাজে রাখতে চায়নি সুচিত্রা, কেন না মেয়েদের চোখ মেয়েদের বড় শত্রু, একেবারে হাড়ের ভেতরের লুকানো ঘুনপোকাটাকে দেখে ফেলতে পারে অনায়াসে। পবিত্র তার কোনও কথা শুনল না ; গলায় জোর খাটিয়ে বলল, তুই একা আর কত করবি! সংসারে কাজ তো কম নেই। তা ছাড়া ওরও অভাব। মংলুর বাবা স্টেশনে কুলিগিরি করে যা পায় তা তো মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়। এখানে যে ওষুধের চেয়েও মদ সস্তা। 'মদ' শব্দটায় সুচিত্রার বুঝি এলার্জি. চোখ টান টান করে সে ঠোঁট কামড়ে ধরে, কেমন বিকৃত গলায় বলে, তোকে না হাজার দিন বলেছি আমার সামনে মদ কথাটা উচ্চারণ করবি না? ওই একটার শব্দ আমার কানটায় বিষ ঢেলে দেয়। আমার মনে হয় কানে বুঝি কাঁকড়া বিছে কামড়ে দিল।

মংলুর মা ঘর মোছা থামিয়ে ভেজা হাত আঁচলে মুছে নিয়ে সুচিত্রার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সমব্যথীর চোখে তাকিয়ে সে বলল, দিদি, তোমার চোখদুটো দেখে মনে হয় তোমার অনেক দুঃখ।

হাঁ-হয়ে গেল সুচিত্রার মুখ, কিছুটা ভয় পেয়ে সে ফ্যাকাসে হাসার চেষ্টা করল, তোমার যত কথা! আমার যে দুঃখ আছে এ কথা তোমাকে কে বলল?

—কেউ বলেনি, তোমার চোখের দিকে তাকালে আমার একথা মনে হয়। মংলুর মা সহজভাবে বলল, আয়নায় তো রোজ একবার নিজেকে দেখি। আমার চোখ দু'টার সঙ্গে তোমার চোখ দুটার বড় মিল গো। মংলুর বাপটা রাত দিন মদ খায়। এই দেখ না সে কেমনধারা আমাকে মেরেছে। পিঠটা চাকড়া হয়ে ফুলে

আছে। মংলুর মা ব্লাউজ উঠিয়ে ক্ষত-বিক্ষত পিঠটা দেখাল সুচিত্রাকে, তারপর মুখ করুণ করে বলল, মানুষটা মদ খেলে মাথার কোনও ঠিক থাকে না। মা-বাপ তুলে গাল দেয়। হাতের সামনে যা পায় তাই দিয়ে মারে। চুলের মুঠি ধরে ধরে মাথাটা আমার ব্যথা করে দিয়েছে। চিরুনি দিতে পারি না।

—তোমাকে এত মারে, তুমি কিছু বল না কেন? সুচিত্রা জানলার শিক ছেড়ে দিয়ে মংলুর মায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ল, পড়ে পড়ে মার খেতে তোমার ভাল লাগে? আমি হলে মজা বুঝিয়ে দিতাম।

—তোমরা ভদ্রলোকেরা যা পারো, আমরা ছোটলোকেরা যে তা পারি না, দিদি!

—কেন পারো না? পারো না বলেই তো গায়ে হাত তুলতে সাহস পায়; সুচিত্রার দু-চোখে আগুন ঠিকরে বেরয়, ঘন ঘন নিশ্বাস ছেড়েও তার কপালের ঘাম সাবুদানার মতো ফুটে উঠল। মংলুর মায়ের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে সে বলল, তুমি মুখ বুজে যা সহ্য করতে পারো, তা আমার দ্বারা হবে না। পড়ে পড়ে মারখাওয়ার জন্য আমার জন্ম হয়নি। মংলুর মা আবার সেই অদ্ভুত ভঙ্গিমায় হেসে উঠল, মেয়েমানুষের মাথা অত তেতে উঠলে তার নিজেরই ক্ষতি হয়, দিদি। আমি তো লেখাপড়া শিখিনি, তবু একটু বুঝি দায়ের উপর কুমড়ো পড়লে দায়ের কিছু ক্ষতি হয় না, কুমড়োই কেটে দু'ফাঁক হয়ে যায়। সংসারে মেয়েমানুষ হল কুমড়োর জাত, সে যে শরীরে বীজ ধরে গো, এত বড় কাজ আর কে করতে পারে বলো? তাই বলছিলাম কী দিদি, যখন রাগ হবে মাটির দিকে তাকাবে—রাগ জল হয়ে যাবে।

নয়নাকে ইস্কুল থেকে আনার সময় একটা মাতাল দুর্গন্ধ ছড়িয়ে টলতে টলতে রাস্তা জুড়ে চলে গেল। ঘেন্নায় নাক কুঁচকে খুব জোরে জোরে হাঁটছিল সুচিত্রা। ফুটফুটে আলোর মধ্যেও সে যেন দু চোখে অন্ধকার দেখল হঠাৎ। মাতালটা অনেক দূরে চলে যাবার পরেও বাতাসে মদের গন্ধ সুচিত্রার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে টোকা মারল। কপালের ঘামগুলো আবার ফুটে উঠল চড়বড়িয়ে। অফিস থেকে ফেরার পথে অতনু গলা ভিজিয়ে আসত মদে। কথা বললে ভকভক করে গন্ধ বেরত। মদ খেলে অতনুর যৌন আবেদন জোঁকের মতো লিকলিকিয়ে উঠত। তার আবেদনে মন থেকে সাড়া দিতে পারত না সুচিত্রা। সে তো কারও হাতের পুতুল নয়, যখন ডাকবে তখনই নিজেকে মেলে ধরতে হবে মলাটহীন বইয়ের মতো। অনেকেই যা পারে, সে তা পারেনি। মদাসিক্ত চুম্বনে তার কমলা কোয়া ঠোঁট কখনও কেঁপে উঠতে পারেনি সুষনিশাকের মতো, বরং ভাজা মেটের মতো তা শক্ত হয়ে গেছে ঘেন্নায়। শুধু এই অক্ষমতায় অতনু বিচ্ছেদ চাইছে।

হাঁটতে হাঁটতে নয়নার কচি হাত দুটোকে শক্ত অবলম্বন ভেবে চেপে ধরল সুচিত্রা। অনেক দিন পরে অতনু আবার তার মনে খোঁচা মারল, তুমি আমাকে

কী দিয়েছ? নয়না আসুক তুমি তো চাইতে না। তবু নয়না এসেছে। সেটাও ওয়ান-সাইড গেম। বিছানায় তুমি বরফ নারী। আই হেট ইউ।

সুচিত্রার হাতের ঘামে নয়নার ছোট্ট হাতটা ভিজে গেল। বস্তির শর্ট-কাট রাস্তা দিয়ে সে নয়নাকে টানতে টানতে ঘরে এসে স্বস্তির শ্বাস ছাড়তে চাইল। পারল না। চিলকান্নার আওয়াজে থমকে দাঁড়াতে হল তাকে। হাই ড্রেনের মাত্র হাত দশেক দূরে মংলুদের ঝুপড়ি ঘরখানা। মংলুর মা ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছিল। মংলুর বাবার ক্রোধী হাতে বেড়া উপড়ান লাঠি। অবাধ্য গোরুকে বশে আনার মতো সে লাঠিপেটা করছিল মংলুর মাকে। পড়ে পড়ে মার খেয়ে এখন কান্না ভাসাচ্ছে বাতাসে। মংলুর মায়ের এলোমেলো শ্রীহীন চেহারার দিকে তাকিয়ে সুচিত্রা যেন খুঁজে পেল নিজেকে। শুধু প্রেক্ষাপট আলাদা, এ ছাড়া হুবহু সব এক। চোখ ফেটে জল এল সুচিত্রার। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না বেশিক্ষণ। ভিড় এড়িয়ে চলে এল নিজের চেনা উঠোনে। এসেই দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল সে। বিছানায় ছুঁড়ে দিল ফোটাফুল শরীর। তবু চোখের তারা তার থরথর করে কাঁপছিল। কষ্ট হচ্ছিল মংলুর মায়ের জন্য, নিজের জন্য। চিৎকার, চেঁচামেচির শব্দ কানে এসে খোঁচা মারতেই সুচিত্রা উঠে গিয়ে এই গরমেও জানলাটা বন্ধ করে দিল। ইলেকট্রিক নেই। মাথার উপর পাখাটাও ঘুরছে না। সুচিত্রা কুলকুল করে ঘামছে। অস্থির হয়ে সে শুনছে মংলুর মায়ের লোম চাগানো কান্না। এত মার খেয়েছে বউটা, সে আজ নির্ঘাত কাজে আসবে না। এত মার খেলে কেউ কি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আজ সুচিত্রাকে নিজের হাতে সব করতে হবে। দু হাতে মুখ ঢেকে সুচিত্রা ফুঁপিয়ে উঠল অতনুর পশু-সুলভ আচরণের কথা মনে ভেবে।

বিকেলের রোদ গড়াতেই বস্তির বাতাস আবার শান্ত হয়ে এল। জানলা খুলে দিতেই একরাশ শুদ্ধ আলো-বাতাস ঢুকে এল ঘরের ভিতর। এ সময়টাতে অনেকেই মাঠে এসে বসে হাওয়া খাওয়ার জন্য। ভ্রূক্ষেপহীন চোখে সুচিত্রা বস্তির দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। কাঁঠাল গাছের ছায়ায় দড়ির খাটিয়া পেতে খালি গায়ে শুয়ে আছে মংলুর বাবা। মংলুর মা পাকা গৃহিণীর মতো মেজাজ নিয়ে খাটিয়ার এক পাশে বসে পুটপুট করে ঘামাচি মারছে পুরুষ পিঠের। এত মার খাওয়ার পরেও মুখে এত হাসি আসে কোথা থেকে? সুচিত্রা ভেবে ভেবেও কোনও সদুত্তর পেল না এ প্রশ্নের। মংলুর মায়ের উপর রাগ হল তার, তীব্র অভিমান নিয়ে সে সরে এল জানলার কাছ থেকে। বিকেলের আলো ফুরোতেই কাজে এল মংলুর মা। সে ভাল মতো হাঁটতে পারছিল না, তবু কোনওমতে ঘরে ঢুকে এসে এ কথা-সে কথা পরে বলল, আজও মংলুর বাবা মদ খেয়ে আমাকে খুব মারল। হা দেখ, কেমন ফুলিয়ে দিয়েছে গা-গতর! তাই কাজে আসতে দেরি হয়ে গেল, দিদি।

সুচিত্রার চোখ জ্বলছিল, সে তার রাগকে সংযত না করতে পেরে বলল, এত মার খাওয়ার পরেও তুমি খাটিয়ায় বসে কী করছিলে?

মংলুর মা নির্দ্বিধায় বলল, ঘামাচি মারছিলাম দিদি। ওর পিঠে অনেক পাকা পাকা ঘামাচি। আমি না মেরে দিলে কে মেরে দেবে বল? আমি ছাড়া তো ওকে দেখবার কেউ নেই।

—এত মার খাওয়ার পরেও তোমার লজ্জা হল না?

—কিসের লজ্জা গো, আমাকে কি পরপুরুষে মেরেছে? ও তো আমার ঘরের মানুষ। ঘরের মানুষের কাছে আবার লাজ কিসের? মংলুর মায়ের চোখ দুটো স্বাধীন ডাহুকির মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কোন সন্‌সারে ঠোকাঠুকি নেই বলো, তা বলে কি আমি মুখ হাঁড়ি করে থাকব? এ সব যার দ্বারা হয় হোক, আমার দ্বারা হবে না।

সন্ধ্যার মুখে পবিত্র ফিরে এল মুখ ভার করে। খামে ভরা চিঠিটা বের করে ধরিয়ে দিল সুচিত্রার হাতে। অতনুর মা লিখেছেন, বউমা, তুমি পত্রপাঠ চলে এসো। খোকার শরীর ভাল নেই। ডাক্তার বলেছেন, কিডনির ট্রাবল। আমরা তোমার আসার পথ চেয়ে থাকলাম। চিঠিটা পড়ব না পড়ব না করেও পুরোটাই পড়ে ফেলল সুচিত্রা। এই প্রথম অতনুর কথা ভেবে তার মনের ভিতরে সহানুভূতির মেঘ জমতে শুরু করল। শ্রাবণের আর্দ্র, জলবাহী মেঘের ঝাপটায় ভিজে যেতে লাগল তার অন্তর-বাহির। এক ফোঁটা চোখের জল কখন যে ঠোঁটের কোনায় এসে লেগেছে সে টের পায়নি। চাতকের তৃষ্ণা নিয়ে যে জীবন এত দিন সে বয়ে বেড়াচ্ছে, চোখের জলের আস্বাদনে তা যেন পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে চায়।

# ডাইনোসর

কুঠিয়াবুড়োর কাজ হল হাত-পা গুটিয়ে খাটিয়ার উপর জড়ভরত বসে থাকা। রোদ চড়া হলে গরুর পাল যখন হাঁপিয়ে উঠে নদীর জলে মুখ ছোঁয়ায়, তখনও বুড়োটা বসে থাকে আকাশের দিকে শূন্যগর্ভ চোখ মেলে। তার চোখ সূর্যের কড়া আলোতে কুটকুট করে না, বরং আরামবোধ করে। ঝড়-জল-বৃষ্টি হলে আলাদা কথা। তখন কুঠিয়াবুড়ো খাটিয়াটা কুলগাছে ঠেকা দিয়ে ছুটে পালায় দাওয়ার উপর। সেখানেও বিছানো থাকে চট। পেছন থেবড়ে বসে বুড়োটা ভাবতে থাকে ফেলে আসা জীবনের কথা। নদীর ধারে ছোট টালির ঘর। হাওয়া বইলে জলের শব্দ ওঠে ছলাত ছলাত। অন্ধকারে নদীটা বিছিয়ে রাখা সাদা কাপড়, কেউ বুঝি শুকাতে দিয়ে তুলতে ভুলে গিয়েছে কাজের ঝামেলায়। জ্যোৎস্নায় রূপ বদলায় নদী, জল তখন শ্বেতপরীর বিজ্ঞাপিত শরীর। হাসি-কলকাকলিতে মুখরিত হয় চারপাশ। এই খরাজ্বলা দিনে লু' বইলে নদীটা মরাটে শরীর নিয়ে ক্রমাগত ধুঁকতে থাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে। কুঠিয়াবুড়োর সব চাইতে ভাল লাগে নদীর সঙ্গে একান্তে কথা বলতে। নদী চুপচাপ শোনে তার কথা। এমন মুগ্ধ শ্রোতা আর ক'টা আছে এ দুনিয়ায়। প্রায়ই সে নদীর সঙ্গে রম্ভাকে মেলানোর চেষ্টা করে। রম্ভাও তো নদীর মতো ছিল বয়সকালে। ওই নদীর পাড়ে দশ বছর আগে দাহ করা হয়েছিল তাকে। জ্যান্ত আগুন উড়ে গিয়ে পড়ছিল জলে। কুঠিয়াবুড়ো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল সেই হৃদয় থরথরানো দৃশ্য। চোখে এক ফোঁটা জল নেই, কাঠ শরীরে বিছিয়ে ছিল শোকের কাজল। তার এই নির্বিকার, নিরুত্তাপ দশা দেখে শ্মশানযাত্রীরা আড়ালে বলল, বুড়োটা মানুষ নয় গো, পোড়া কাঠ। কাঠেরও রস থাকে, এ বুড়ার কোনও রস-কষ নেই!

সব কথাই কানে আসছিল কুঠিয়াবুড়োর। কানে এলেও তার কিছু করার নেই। একমাত্র ছেলে নারান বলে, বাবা, তুমি ক'দিন ঘুরে আসো যশোদার ঘর থেকে। জামাই তো পয়সাওলা মানুষ। সেখানে তোমার খাতির-যত্ন ভাল হবে। আমার সামান্য চাকরি। তোমার অসুখে-বিসুখে এক পোয়া দুধও দিতে পারিনে।

কুঠিয়াবুড়ো দন্তহীন মুখের পাতাল হাঁ-গহ্বর দেখিয়ে হাসে, দুধে কি সব হয়ে রে বাপ! দুধ-ঘি খেলে কি শরীরের জোর বাড়ে? তা নয়। মানুষের আসল জোর হল মনে। মনের জোর থাকলে জোর বাড়ে কোমরের।

নারানের আর কিছু বলার থাকে না। সে তো সরকারি অফিসের সামান্য এক জন পিওন। তার আর আয় কতটুকু! নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর দশা। নারানের বউ আশার চোখে চিকচিক করে রাগ। বুড়োটা ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং দুলিয়ে খায়, হুকুম পাড়ে। কুটোটি ভেঙে দুটো করে না। এমন বুড়ো সংসারে

থাকার চাইতে না থাকাই ঢের ভাল। এত বয়স হল তবু যমে যে কোন তাকে নেয় না! যে যমের অরুচি তাকে যম কেন ছোঁবে? শুধু নারানের বউ নয়, পড়শি রতনের বউ মেনকাও বলে এ কথা। ওরা নদীতে জল আনতে যাওয়ার সময় আলোচনা করে বুড়োকে নিয়ে। মেনকা চোখ শক্ত করে বলে, ঘাটের মড়া, ঘাটের কাছে আছে তবু চিতা ডাকছে না তাকে! অথচ ওর বয়সি বুড়োগুলো সব করে পগার পার।

নদীর এ ধারের ঘরগুলোয় অভাবি মানুষের বসবাস। ত্রিশ ঘরের মধ্যে মাত্র দুটো ঘর থেকে লোক যায় সরকারি অফিসে কাজ করতে। বাকি সবাই কাজ ছাড়াই ব্যস্ত। ফলে দুপুরের দিকে পাড়ায় পুরুষমানুষ থাকে না বললেই চলে।

বুড়োর ব্যবহারে আশা তিতিবিরক্ত। যক্ষের ধন আগলানোর মতো বুড়োটা সারা দিন বসে থাকে খাটিয়া আঁকড়ে। খাওয়ার সময় হলে গা ধুয়ে আসে নদী থেকে। পরনের ধুতিটা কোনও দিন কাচে না সোডা দিয়ে। আশাকেই কেচে দিতে হয়। বুড়োর পুরনো অর্শ। ধুতিতে লেগে থাকে রক্তদাগ। বড় ঘেন্না লাগে আশার, তবু নারানের ভয়ে চুপ করে থাকতে হয় তাকে। কুলতলায় ছায়া নামলে বুড়োর এক কাপ চা চাই, না হলে বিগড়ানো মাথায় সে কেমন বোমভোলার চোখে তাকায়। দাপনা চুলকে বলে, বউমা, আজ চা দিলে না তো?

—ঘরে চা বাড়ন্ত, বাবা।

—কেন, নারান যে কাল এক ঠোঙা চা নিয়ে এল। সেগুলো কোথায়? বুড়োর গলায় ঝাঁজ, অভিমানে-অপমানে ধড়ফড় করে তার বুক। কালে কালে কত কী যে দেখতে হবে তাকে। ঘোর কলিকাল না হলে ছেলের বউ, যে কিনা মেয়ের মতো—সে কেন দিনের আলোয় ঠোঁটে মিথ্যের রঙ মেখে ঘুরে বেড়াবে? নারানের কানে বুড়ো তুলে দেয় কথাটা। অফিস থেকে ফিরে নারান মাথা গরম করে বলে, বাবা তো আমার পয়সায় খায়। তুমি চা করে দাওনি কেন? ফের যদি এমন কথা শুনি তা হলে সিঁদুর তুলে, শাঁখা ভেঙে বাবার ঘরে চলে যেও। তোমাকে ছেড়ে থাকব, কিন্তু বাবাকে ছেড়ে নয়।

নদীর দু-ধারে ঘন বসতি। এ পারের সঙ্গে ওপারের চরম বিরোধ। পুজোর সময় বিসর্জন নিয়ে বোমাবাজি চলে। এছাড়া আছে ক্লাবে-ক্লাবে ঝগড়া। নদী এখন দুভাগ। ঘাট আলাদা। এ পারের মানুষ ওপারে মাইক বাজলে হিংসায় জ্বলে। নারান-রতন ও সবের সাতে-পাঁচে থাকে না। তারা রোজ খোলা বেলব্রিজ পেরিয়ে অফিসে যায়, ফিরে আসে সন্ধের পরে। ও পারের মানুষ এ পারে খুব কমই আসে। হাট-বাজার-স্কুল-কলেজ কোনও কিছুই তো এ পারে নেই। যা আছে সত্তর ছাড়ানো এই বুড়োটা।

তবু রতনের ক্লাস এইট পাশ বউয়ের গা জ্বলে, মুখ বেঁকিয়ে বলে, বুড়োটার নজর যেন আমার গতরে বিচুটি ঘষে দেয়। গলা খাদে নামিয়ে সে প্রায় দিনই আশাকে শোনায়, জান দিদি, তোমার শ্বশুরের নজরটা বড় খারাপ। সে দিন নদী থেকে চান করে ফিরছিলাম, বুড়োটা কেমন হাঁ করে দেখছিল আমাকে,

যেন কোনও দিন মেয়েমানুষ দেখেনি। আমি তো লজ্জায় মরে যাই। ওকে বলেছি—উঠোনে পাকাঠির বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে। তোমাদের ওই বুড়োর জ্বালায় ঘরে আমি শান্তিতে কাজ করতে পারিনে। বুড়োটা সর্বদা হাঁ করে গিলতে থাকে আমাকে। কেমন কাছিমের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে।

আশা ভয়ে ভয়ে বলে, বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। দাও না, একদিন চোখ দুটো গেলে। আমি বাধা দেব না। যেমন কর্ম তেমন ফল তো পেতেই হবে।

মেনকার মাধ্যমে পাড়ার সবাই জেনে গিয়েছে কুঠিয়াবুড়োর কাজ কারবার। নারানের কানে গিয়েছে কথাগুলো। রতন দোকানে বসে বলেছে সব। বাধা দিয়ে উঠেছে নারান, হতেই পারে না। ছানি কাটাবার পর থেকে বাবা তো চোখে ভাল দেখতেই পায় না। ডাক্তার বলেছিল, চশমা নিতে। আমি পয়সার অভাবে করে দিতে পারিনি। যে মানুষটা চোখেই দেখে না, সে তোর রূপসী বউকে দেখবে কীভাবে?

রতন হারমানার ছেলে নয়। দুপুরে পাটকাঠি দিয়ে ঘিরে দিল বেড়া, একেবারে কুলগাছ সমান করে। ফলে উঠোন হয়েছে দু-ভাগ। মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

কুঠিয়াবুড়োর তবু কুলগাছের ছায়ায় বসা কমল না। আশা আক্ষেপ করে বলে, বুড়োটা মরলেই বাঁচি। এ সংসারে ওর একটা কানাকড়িও দাম নেই। জীবনভর শুধু বসে বসে খেল। কোনও দিন সংসার নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করল না।

কুঠিয়াবুড়ো সদা-সর্বদা একা। ঘরে নাতিপুতি আছে, তাদের মিশতে দেয় না আশা। মেনকাও তাকে সতর্ক করে বলে, বুড়ো ভাম থেকে সাবধান। ওদের ছানিপড়া নজরে পাপের চাষ-আবাদ।

অফিসের কাজ সেরে নারান ঘরে ফিরে এলে কুঠিয়াবুড়োর ফুর্তি ধরে না। বর্ষার কইমাছের মতো যৌবন ফিরে পায় সে। অবুঝ গলায় শুধোয়, হ্যাঁ রে নারান, এবার মাঠে ধান কেমন হল?

—খু-উ-ব ভাল।

—ধানচারাগুলো মোটা মোটা হয়েছে তো! ভালমতন সার দে। মাটির আর আগের মতো জোর নেই। মাটি হয়েছে নিষ্ফলা। বাবার কথাগুলো শুধু নারান শোনে মন দিয়ে। সে বুঝতে পারে, বুড়োটা তার চোখ দুটো নিয়ে আকাশ-মাটি নদী আর সবুজে গাঢ় হয়ে আসা ধানামাঠগুলোকে দেখতে চাইছে।

রতন আর মেনকার এ সব আদিখ্যেতা একদম পছন্দ হয় না। বিশেষত মেনকার দু'চোখের বিষ এ সব। সে একদিন রতনকে রসিকতা করে বলল, সিনেমার ডাইনোসরটা এখন আমাদের পাড়ায় ঘুরছে। কী বিরাট লম্বা ঘাড়! চোখ দুটো ঘোলা ঘোলা। গায়ের চামড়া খসখসে। পায়ের আঙুলগুলো থেবড়ানো। তুমি কি দেখেছ?

রতন মেনকার ঠাট্টাটা বুঝতে পারল না। ডাইনোসরের ছবিটা সে দেখেছে।

ক'দিন আগে খবরের কাগজের সামনের পাতায় ছাপা হয়েছিল সেই বিশাল জন্তুটার ছবি। এক ঝলক দেখলেই বুকের রক্ত চলকে ওঠে. জন্তুটার গায়ে অসুরের শক্তি। কাউকে ভয় পায় না। চার পায়ে ভর দিয়ে দৈত্য-শরীর নিয়ে হাঁটে।

—এ পাড়ার আবার ডাইনোসর এল কোথা থেকে? রতনের গলায় ঠাট্টা মেশানো, ডাইনোসর তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। তুমি আবার ডাইনোসরের দেখা পেলে কোথায়?

মেনকা সবজান্তা হাসি হাসে। ঠোঁটে গড়িয়ে যায় চাপা হাসির রং. চলো, তোমাকে ডাইনোসর দেখাই। কথা শেষ না করেই মেনকা বেড়া ফাঁক করে গালে হাত দিয়ে বসে থাকা কুঠিয়াবুড়োকে দেখায়, তারপর চাপা গলায় বলে দেখো—বুড়োটা ডাইনোসর কি না! ছানিপড়া চোখ দুটো মার্বেলগুলির মতো. কেমন কণ্ঠা নড়িয়ে খকখক করে কাশছে দেখো।

বুড়োটার ক'দিন থেকে শরীর খারাপ। অর্শের ব্যথাটা তাকে প্রায়দিন নাজেহাল করে ছাড়ে। রক্তে ভেসে যায় কাপড়। কেমন বীভৎস দেখায় তাকে। রতন ভয় পেলেও মেনকা মোটেও ভয় পায় না। সে জোর গলায় বলে, বুড়ো মানুষদের বেশি দিন বাঁচা ঠিক নয়। বুড়ো গরুতে দেশ ভরে গেলে লাঙল টানবে কে

রতন উৎসাহিত হয়ে মেনকার বুদ্ধির বহর দেখে, তুমি ঠিকই বলেছ। রেসের ঘোড়া খোঁড়া হয়ে গেলে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। অথচ ঘোড়াগুলোর তখনও কত আয়ু থাকে।

মজাদার কথার বুঝি পাখা থাকে। কুঠিয়াবুড়োর নাম লোকের মুখে মুখে রটে যায় 'ডাইনোসর'। শহরের সিনেমা হলে ছবিটা এসেছে। নারানের খুব ইচ্ছা সিনেমাটা সে একদিন দেখে আসবে। আশাকে মনের কথাটা বলতেই মুখে কুলুপ আঁটল সে। কেমন বিবর্ণ, মলিন চোখে তাকাল। মেনকা তাকে নদীর ঘাটে বলেছে, সিনেমা দেখে আর কী হবে দিদি. ঘরে তো তোমার ডাইনোসর ঘুরছে। মেনকার ঠাট্টা বিদ্রূপ ভরা হাসিটা তখন মন থেকে মেনে নিতে পারেনি আশা। একজন প্রায় অথর্ব বুড়ো মানুষকে নিয়ে পড়শির এমন জ্বালা ধরানো কথা তার আদৌ মনপছন্দ হয়নি। রাতে শোয়ার সময় সে নারানকে বলল, বাবাকে ক'দিন যশোদার ঘরে পাঠিয়ে দাও। এক জায়গায় বুড়োমানুষ বেশি দিন থাকলে আরও বুড়িয়ে যায়।

নারান বিস্ময়ভরা চোখ মেলে দেখছিল আশাকে। বউয়ের মানসিক পরিবর্তন তৃপ্ত করল তাকে। আশার মন রাখার জন্য সে বলল, ঠিক আছে, তোমার কথামতোই কাজ হবে। ভাবছি কাল অফিসে গিয়ে ছুটি নিয়ে নেব। আমারও ভাল লাগছে না। ক'দিন বেড়িয়ে এলে মনটা জুড়াবে—

আশা কোনও কথা না বলে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে দাওয়ার দিকে। কষ্টে বুক ভেঙে যায় তার। মেনকার কথাগুলো মনে পড়ে।

—দিদি, তোমার শ্বশুর একটা রাক্ষস! এত খেয়েছে জীবনভর যার জন্য রক্ত সব পেছন দিয়ে বেরিয়ে যাচ্চে।

যে মানুষটাকে নিয়ে মেনকার এত হল্লা-চিল্লা, অদ্ভুতভাবে সেই মানুষটা বড় নির্বিকার। 'ডাইনোসর' শব্দটা কানে গেলেও এই নিয়ে তার কোনও মাথাব্যথা নেই। নারান দুঃখ করে বলে, বুড়ো মানুষকে নিয়ে যারা মজা মারে, তারা কি একদিন বুড়ো হবে না?

আশা চুপ করে শোনে। বুড়োটা চলে যাবে শুনে মন ফাঁকাফাঁকা। কুলগাছটার দিকে তাকালে হু হু করে ওঠে ভেতরটা। নারান অফিসে ছুটির জন্য দরখাস্ত দিয়েছে। কুঠিয়াবুড়োও মনে মনে খুশি। আশা জামা-কাপড় সব গুছিয়ে দিয়েছে। অর্শের মলম আর ওষুধগুলো ভরে দিয়েছে ব্যাগে।

কাল ভোরেই কুঠিয়াবুড়ো চলে যাবে। মেনকা এই সংবাদে ভীষণ খুশি। সে আগ বাড়িয়ে বলল, বুড়োটা গেলেই বাঁচি। ওর জন্য আমার কোনও কাজ হয় না। আসলে আমি কিছুতেই বুড়ো মানুষ সহ্য করতে পারি না।

আশা চুপচাপ শোনে। মেনকার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে অনেক ভুল করেছে জীবনে। নিজের কৃতকর্মের জন্য মাঝেমাঝেই অনুশোচনায় দগ্ধে যায় তার বুকের ভেতর। শ্রদ্ধার সম্পর্ককে সে আর কোনও দিন নষ্ট হতে দেবে না। অথচ মেনকা নিজের জেদে টইটম্বুর। সে তার ভাবনা থেকে এক পা-ও নড়বে না।

দুপুর গড়ালে কুলগাছের নীচে ছায়া নামে জমাট হয়ে। আশা কুলগাছের নীচে খাটিয়া পেতে দিয়ে বলে, বাবা, তুমি একটু আরাম করো। আমি চা করে আনি।

কুঠিয়াবুড়ো সজল চোখে দেখে আশার মুখখানা। ধরা গলায় বলে, কাল ভোরেই তো চলে যাব, আবার কবে দেখা হবে কে জানে। বউমা, তোমাকে একটা কথা বলি। এই ভিটেমাটি ছেড়ে আমার কোথাও যেতে মন করে না। এই কুলগাছের ছায়ায় খাটিয়া পেতে বসলে পুরো দুনিয়াটা আমার দেখা হয়ে যায়। হাতের তালুতে চোখ মুছে নিয়ে সে আরও বলে, তোমরা সব ভাল থেকো বউমা। আমি যশোদা'র ওখানে থাকলেও মনটা তোমাদের এখানেই পড়ে থাকবে।

আশা চা করে দিয়ে গেল কুলতলায়। বুড়ো চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আকাশ দেখল ঘোলাটে চোখে, হাওয়ার স্পর্শ মেখে নিল গায়ে। তৃপ্তির শ্বাস ছেড়ে আবার চেয়ে থাকল দূরের দিকে। কিন্তু বেশিক্ষণ সে এই অনাবিল সৌন্দর্য ছানিপড়া চোখে মেখে নিতে পারল না, তার আগেই কানে এসে বিঁধল চাঁদাপার্টির হল্লা-চিল্লা। মেনকা চিল স্বরে তর্ক করছিল ড্রাগন ক্লাবের ছেলেগুলোর সঙ্গে। ওরা নদী পেরিয়ে এসেছে চাঁদা তুলতে। মেনকার নামে বিল কেটেছে একান্ন টাকার। ওপারে পুজো হবে ধুমধাম সহকারে। জুরাসিক পার্কের ডাইনোসর চরবে প্যান্ডেলে। একেবারে জলজ্যান্ত ডাইনোসর। খরচও হবে প্রচুর। চাঁদা পার্টির একজন বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল মেনকাকে। তার পরনে

টাইট লাল গেঞ্জি, জিনসের প্যান্ট। এই ছেলেটাই হাঙ্গামা বাধায় শহরে কোনও সুযোগ পেলে।

মেনকা বেগতিক বুঝে নরম সুরে বলল, ঘরে কেউ নেই। এখন আমি চাঁদা দিতে পারব না। চাঁদা নিতে হলে সন্ধেবেলায় আসতে হবে।

—কার এত সময় আছে বলুন। যা দেবার এখনই দিন।

মেনকা একটা পাঁচ টাকার নোট দিতে চাইল ওদের। লাল্টু নামের ছেলেটা পানের পিক বারান্দায় ফেলে বলল, পাঁচ টাকা নেবার জন্য নদী পেরিয়ে এত দূর আসিনি। মাল ছাড়ুন। না হলে খুব খারাপ হয়ে যাবে।

—বললাম তো আমার কাছে আর টাকা নেই। এমনিতে মাসের শেষ। অত টাকা আমি কোথায় পাব? বিষণ্ণতা, বিপন্নতা ঝরে পড়ল মেনকার কণ্ঠস্বরে। লাল্টু ভ্রূক্ষেপহীন গলায় ধমকে উঠল, তা হলে চাঁদা দেবেন না তো? ঠিক আছে। এই পটাই, যা তো ওই পেতলের কলসিটা তুলে নে। ওটা বেচলে নিশ্চয়ই একান্ন টাকা হয়ে যাবে।

পটাই ছুটে গেল বারান্দার এক কোনায় রাখা জলভরা ঘড়াটার দিকে। সজোরে লাথি মেরে উল্টে দিল মেঝেয়। জল গড়িয়ে গেল দ্রুতগামী সাপের ঢঙে। মেনকাও কাঁপা কাঁপা পায়ে ছুটে গেল গড়িয়ে যাওয়া কলসিটার গতিরুখে দেবার জন্য। ওটা তার বিয়ের দানসামগ্রীর একটা। সে কিছুতেই ওটা শয়তানগুলোর হাতে তুলে দেবে না। তাতে যা হয় হোক। মেনকা উবু হয়ে ছাড়িয়ে নিতে চাইল পটাইয়ের দখলে চলে যাও ঘড়াটা। অসম লড়াই জমে উঠল নিমেষে। মেনকার বাঘিনী তীব্রতার কাছে এক সময় হার মানতে বাধ্য হল পটাই। বুকের কাছে ঘড়াটা চেপে ধরে হাঁপাতে লাগল মেনকা। লাল্টুর সহ্য হল না এই দৃশ্য। ভারী বুটের শব্দ তুলে সে এগিয়ে গেল মেনকার দিকে। ঘড়াটা জোর করে কেড়ে নিয়ে সে ঠেলা মেরে ফেলে দিল মেনকাকে। তারপর একটা কান ঝালাপালা খিস্তি দিয়ে সে মেনকাকে বলল, আমরা যাচ্ছি। আবার দেখা হবে।

ভেজা মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে মেনকা কেঁদে উঠল বাতাস ফাড়িয়ে, কে কোথায় আছ গো, আমাকে বাঁচাও। ওরা আমার বিয়ের ঘড়াটা নিয়ে চলে যাচ্ছে।

কুঠিয়াবুড়ো কুঁড়ের হদ্দ, এমনিতে দশ ঠেলা মারলে যে ওঠে না, সে খাড়া হয়ে দাঁড়াল মেনকার ভয়-বিহ্বল আর্ত চিৎকার শুনে। কানে কেউ বুঝি বিষ ঢেলে দিল তার। ক্লাবের ছেলেরা চাঁদা তোলার অজুহাতে যে অসভ্যতা করল, এর বুঝি কোনও ক্ষমা নেই। ঘরের বউয়ের গায়ে হাত তোলা, অশালীন ব্যবহার করা—এ কোন শিক্ষার নমুনা? তা হলে কি শিক্ষার নামে স্কুল-কলেজে এ সবই চলছে? কুঠিয়াবুড়োর গা-হাত-পা শক্ত হয়ে উঠল রাগে, রক্ত চড়ে গেল মাথায়। চিৎকার করে ডাকল আশাকে, বউমা, আমার লাঠিটা দাও তো। ওরা ভেবেছেটা কী?

—তুমি চুপ করো বাবা। ওখানে যেও না। আশার ভীত গলা, ওরা ভাল ছেলে নয়। গুণ্ডা। ওরা তোমার মান-সম্মান রাখবে না।

—মানসম্মানের আর বাকি কি থাকল? কুঠিয়াবুড়ো ফুঁসে উঠল তেজি বাঘের গলায়, ঘরের বউকে আছড়ে ফেলে দিয়েছে, এ সব আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব! এ কিছুতেই হবে না বউমা। তুমি আমার লাঠিটা দাও।

আশা কিছুতেই লাঠি দিল না। সে আগে থেকেই জানত বুড়োর রাগ। যে মানুষ শান্ত মাটির মতো, সে যদি হঠাৎ রেগে ওঠে তা হলে তাকে সামলানো দায় হয়।

কুঠিয়াবুড়ো বিনা লাঠিতেই ছুটে গেল আগড় সরিয়ে। গলার রগ ফুলিয়ে লাল্টুকে বলল, ভাল ছেলের মতো ঘড়াটা নামিয়ে রাখো। তুমি যার হাত ধরেছিলে তার পায়ে ধরে ক্ষমা চাও। না হলে তোমাদের সব ক'টাকে আমি মেরে পুঁতে দেব।

হা-হা-হা অট্টহাসিতে গলা ফাটিয়ে শরীর দুলিয়ে হেসে উঠল লাল্টু, হাতি-ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল! হা-হা-হা।

—হাসছ যে, কথা বুঝি কানে গেল না!

—হাসব না তো কি কাঁদব? লাল্টুর তাচ্ছিল্যভরা জবাবে কুঠিয়াবুড়ো দমল না বরং ফুঁসে উঠে বলল, সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আমি আঙুল বেঁকাতে বাধ্য হব।

—যাও, যাও। তোমার মতো বুড়ো-থুড়োদের দেখা আছে।

লাল্টুর কথা শেষ হল না, কুঠিয়াবুড়ো তার নড়বড়ে শরীর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাশে সরে গিয়ে লাল্টু চোখের নিমেষে বের করে আনল যত্নে লুকিয়ে রাখা রিভলভার। তারপর ডান হাতের তর্জনীতে ঘোরাতে ঘোরাতে সে খুবই উত্তেজিত গলায় বলল, হাট রে! না-হলে একটা গুলিতে তোর মাথার খুলি আমি উড়িয়ে দেব। এই যন্ত্রটা দিয়ে আমি তিন-তিনটে মার্ডার করেছি। থানা-পুলিশ সবাই জানে, কেউ আমার টিকিটাও ছুঁতে পারেনি।

চোখ-মুখ রক্তজবার মতো লাল করে কুঠিয়াবুড়ো গর্জে উঠল, তবে রে হারামির ছা, আমাকে ভয় দেখানো! যা-যা তোর বাপ-মাকে ভয় দেখাবি গে যা।

কথা শেষ হল না, পোড়া বারুদের গন্ধে নাক কুঁচকে এলোমেলো কাপড়ে ছুটে এল আশা। কাঁদতে-কাঁদতে লুটিয়ে পড়ল লাল্টুর পায়ের উপর, এ কী করলে গো, সামান্য চাঁদার জন্য এ তুমি কী করলে গো—

—চল পটাই, কেটে পড়ি। ঘড়াটা কুলগাছের গোড়ায় ছুঁড়ে দিয়ে লাল্টু আর দাঁড়াল না। ঘটনার আকস্মিকতায় ভয়ের ছোপ ধরেছে তার চোখেমুখে। কাঁচা রক্তের রং পাষাণ হৃদয়ও বুঝি টলিয়ে দেয়।

আশা জলভরা চোখে দেখল একটা যুগের অবসান। ছায়া সরে যাওয়া কুলগাছের নীচে মেনকা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নীরবে। জলভরা চোখে সে দেখল ডাইনোসর নয়, শান্তির ঘুমে যেন ঘুমিয়ে আছে তার নিজের বাবা।

# আলোর পোকা

ভ্যান রিকশা বাঁধের গা ধরে ছুটছিল, মরা খাল তার ছায়াসঙ্গী। ধুলো ওড়ার সময় নয়, সূর্যের ঝাঁঝ কম, ঝিম-ধরা আলোয় পৃথিবী বড় মায়াময়। কোথা থেকে একটা ফিঙে পাখি উড়ে এসে সোনাঝুরিগাছের ডালে বসতেই তনুময় অবাক গলায় শুধোল, কাকের চাইতে ফিঙে কি বেশি কালো? এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউ। মণিদীপার চোখের তারা নেচে উঠল, কথায় ভারিক্কি প্রলেপ দিয়ে সে বলল, কাক কালো, ফিঙেও কালো, চুল কালো, চোখের মণিও কালো। কোনটা বেশি কালো সেটা হলফ করে বলব কীভাবে। তবে ফিঙে-পাখির গ্লেজ বেশি। কাকের এই গ্লেজটা নেই। ফিঙে অসাধারণ হলে, কাক সাধারণ।

রিকশা চালাচ্ছিল ঝগড়ু। কে যে ওর নাম ঝগড়ু রেখেছিল, কেন রেখেছিল তা রীতিমত গবেষণার বিষয়। আপাত নিরীহ ঝগড়ুর চেহারায় কাক বা ফিঙের মিল নেই, তার স্বভাব অনেকটা বাঁধের নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া মরা খালের স্রোতের মতো। তিরতিরে স্রোত সবার ভাল লাগার কথা। ঝগড়ুকে কারওর না-পছন্দ নয় সেই কারণে। ভ্যান রিকশা ছাড়া চার চাকার গাড়ি ঢুকবে না মেলায়। দেবাশিস অনেক আগেই বলেছিল, মোরাম ফেলা রাস্তা যত দূর তত দূর গাড়ি যাবে। তারপর হেঁটে যেতে হবে মাইল খানেক। এক মাইল পথ তোমরা সবাই হেঁটে যেতে পারবে তো?

ওর কথা শুনে মণিদীপার গলা শুকিয়ে কাঠ। চোখ কুঁচকে বলেছিল, মেলায় গিয়ে আর কাজ নেই। তার চেয়ে ঘরে বসে গল্প করি চল।

তনুময় আপত্তি জানাল তার কথায়, মেলার আনন্দ কি ঘরে বসে পাওয়া যাবে? তাছাড়া আজই মেলার শেষ দিন। এত দূর এসে মেলায় যাব না হতে পারে না। রেডি হয়ে নাও, যত কষ্ট হোক, আজ মেলায় যাবই।

তনুময়ের জেদেরই জয় হল। দেবাশিস ঝগড়ুকে ধরে নিয়ে এল কোথা থেকে। বেচারির হয়তো যাওয়ারই মন ছিল না, কিন্তু দেবাশিসও ছাড়বার ছেলে নয়, শেষ পর্যন্ত রাজি করিয়ে ছাড়ল। যা ভাড়া তার থেকে মাত্র পাঁচ টাকা ভাড়া বেশি নেবে ঝগড়ু। তা নিক তবু তো মেলায় যাওয়া যাবে।

ভ্যান রিকশার কাঠের উপর পা থেবড়ে বসেছিল মণিদীপা। হালকা রঙের শাড়ি পরেছে সে। শ্যাম্পু করা চুল আলতো বাঁধা, ফলে কানের দু-পাশে ফুরফুরিয়ে উড়ছে কুচো চুলের রাশি। দু-চোখে প্রকৃতি দেখার ক্ষুধা। কতদিন পরে সে এই পথ ধরে চলেছে। বিয়ে হয়েছে ন'বছর আগে। ন'বছরে ন'বারও আসেনি সে এই গ্রামে। বিশেষত বাঁধের ধার দিয়ে হেঁটে যাওয়াটা স্বপ্নময়। বর্ষায়

তাদের বিয়ে হয়েছিল। তখন মরা খালের ভরা গতর। ঢেউগুলো বকাটে ছেলের টেরিকাটা চুলের মতো। খালের দু-ধারে অজস্র বুনো লতাপাতার ঝোপ। মাঝে মাঝে হোগলার ভেজা কোমর। সে সময় গলায় সাদা দাগ দেওয়া গাভীন ডাহুক দেখেছিল মণিদীপা। কেমন তেল কুচকুচে পালক। চোখজোড়ায় অদ্ভুত চঞ্চলতা। এমন অস্থিরতা সে কেবল গর্ভবতী মেয়ের চোখে দেখেছে। সেই যাওয়া, আর আসা হয়নি। তনুময় নিয়ে আসেনি। কেন নিয়ে আসেনি, মণিদীপা তা জানে না। সে নিজেও তো বায়না করেনি আসার জন্য। আসলে নাড়ির টান না থাকলে যা হয়। মণিদীপাকে পুরোপুরি দোষ দিতে পারে না তনুময়। বিয়ের পরই বেশির ভাগ মেয়েরাই চৌবাচ্চার তেলাপিয়া মাছ হয়ে যায়। তবে তনুময় কেন বদলে গেল? বদলে যাওয়ার ঋজু কোনও কারণ ছিল না। অফিসের ছুটি না পাওয়া যদি একটা কারণ হয় তাহলে অন্য কারণ হল তার অদ্ভুত নিস্পৃহতা। এই নিস্পৃহতা তার আজন্ম। একটা বেড়া নিজের ভেতরে গড়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। সেই বেড়াটাকে সে ভাঙতে বা টপকাতে পারেনি। যত দিন গিয়েছে ততই মজবুত হয়েছে বেড়া। বেড়েছে গ্রামের সঙ্গে কর্মস্থলের দূরত্ব। মণিদীপার বাড়ি যেখানে সেখানে শহুরে নাগরিক সুবিধাও কম নেই। মাত্র চার মাইলের মধ্যে গ্রাম, সেখানে আর ফিরে তাকানো হয়নি। কেন তাকাবে তনুময়? সেখানে তার কে আছে? একখানা মাটির ঘর ছিল, সেটা ভেঙে গেছে বন্যায়। বুড়ো জ্যাঠামশাই গত হয়েছেন অর্শরোগে। জেঠতুতো ভাইয়েরা শহরে থাকে চাকরিসূত্রে। তাদের সঙ্গে শেষ দেখা গিয়েছিল জ্যাঠামশাইয়ের শ্রাদ্ধে। সেটা ছিল এক দায়সারা অনুষ্ঠান। শেকড়কাটা গাছের চেয়েও ঝিমুনি ধরা মন নিয়ে সেদিন গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছিল তনুময়। জেঠিমার জন্য তার বুকের ভেতরটা খচখচ করছিল কষ্টে। শুকিয়ে যাওয়া খালটার সঙ্গে জেঠিমার কোথায় যেন অদ্ভুত একটা মিল আছে। জেঠিমার লুকনো চোখের কোণে যে অমলিন আক্ষেপ শুকিয়ে ছিল, সেই আক্ষেপই এতদিনে তনুময়ের মনের ভেতরে গভীর একটা ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। ফিরে আসার সময় তনুময় কর্তব্যরক্ষার খাতিরে বলেছিল, জেঠিমা, তুমি আমার সঙ্গে চল। আমার ওখানে থাকবে। এখানে তো তোমাকে দেখার কেউ নেই। আমি থাকতে তোমার কোনওরকম অসুবিধা হবে না। খুব মন খারাপ করলে আমি তোমাকে গ্রাম থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাব। সেদিন জেঠিমা কোনও উত্তর না দিয়ে শূন্য চোখে তাকিয়ে ছিলেন, সেই বিরাট শূন্যতার অর্থ বুঝতে পারেনি তনুময়। যতদিন গিয়েছে ততই সেই শূন্য চোখ জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে তনুময়ের মনে। অদৃশ্য একটা টান সে উপলব্ধি করেছে মনে মনে। এই গ্রামের উপর তার টান থাকার কোনও কারণ নেই। তনুময়ের বাবা চাকরিসূত্রে প্রায় ত্রিশ বছরের উপর গ্রাম ছাড়া। কদাচিৎ এলেও গ্রামে থাকতে ভালবাসেন না। গ্রামে অনেক অসুবিধা। এখানে ডাক্তার নেই, প্রয়োজনের সময় হাইপ্রেসারের ওষুধ পাওয়া যায় না। নাড়ির টান না থাকলে মাটির উপর টান

কমে যেতে বাধ্য। মণিদীপাদের বাড়িতে যতবার এসেছে তনুময় তত বারই তার চোখ চলে গেছে গ্রামের দিকে। শহরের আকাশের সঙ্গে গ্রামের আকাশের যোগাযোগ এখনও ছিন্ন হয়ে যায়নি। তাই বন্ধুরা গ্রামের প্রসঙ্গ ওঠালেই তনুময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ জেঠিমার মুখখানা মনে ভাসে সবার আগে। আশ্চর্য সবাই চলে গেলেও জেঠিমা এখনও গ্রাম আঁকড়ে পড়ে আছেন। কেন পড়ে আছেন এর কোনও ব্যাখ্যা জানা নেই তনুময়ের।

খুব ছোটবেলায় জেঠিমার হাত ধরে মকরসংক্রান্তির মেলায় যাওয়ার আনন্দটাই ছিল অন্যরকম। জেঠিমাই ছিল তার আব্দার আনন্দের উৎসমূল। কত বছর পরে আজ মেলায় যাবার কথা উঠতেই তনুময় তাই নিজেকে ঠিক ধরে রাখতে পারেনি। প্রথমে দোকানে দেবাশিসই কথাটা তোলে। তনুময় রাজি হয়ে যায়। তখনই সে মনে মনে ঠিক করে নেয় মণিদীপাকেও মেলায় নিয়ে যাবে। জেঠিমার সঙ্গে দেখা করে আসবে। কত বছর জেঠিমার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। এখনও তো মাঝে মাঝে বুকের ভেতরে দুঃখবোধের জোয়ার আসে, তাকে সামাল দেওয়া যায় না কিছুতেই।

ঝগড়ু ভ্যান-রিকশাটা চালায় ভাল। ওর রিকশায় সাইকেলের বেল লাগানো। লোকজন দেখলেই ক্রিং ক্রিং বেল বাজাচ্ছিল সে। বেলা শেষের আলোয়, মৃদু হিমেল বাতাসে সেই শব্দ ঝংকার তুলছিল কানে। এক সময় প্রায় সিঁটিয়ে গিয়ে তনুময় মণিদীপাকে ঠেলা মেরে বলেছিল, এই দেখ, কত চমৎকার দৃশ্য। পারফেক্ট গ্রাম বলতে যা বোঝায় তুমি আমাদের গ্রামে তা দেখতে পাবে।

মণিদীপার চালচলনে বাড়তি কোনও আগ্রহ নেই। নতুনকে দেখার আগ্রহ তার চোখে-মুখে থাকলেও তা সংযমের বেড়াকে ভাঙতে পারেনি। আলো কমে আসা পৃথিবীতে ঝগড়ুর ভ্যান-রিকশা ছুটছিল দ্রুত গতিতে। দেবাশিস একটা সিগ্রেট ধরিয়ে তনুময়ের মুখের দিকে তাকাল। শুধাল, তনুময়, তুমি একটা সিগ্রেট ধরাবে?

তনুময় ঘাড় নাড়তেই দেবাশিস সিগ্রেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল ওর দিকে। ঝগড়ুর রিকশা বাঁক পেরিয়ে ছুটে যাচ্ছে মোরাম ফেলা রাস্তা ধরে। মণিদীপার মুখে কোনও কথা নেই। দেবাশিস চুপ করে থাকতে অভ্যস্ত নয়। সে বলল, দেখ তনুময়, আমরা এখন একটা পুকুরের ধার দিয়ে যাব। তোমার ওই পুকুরটার নাম মনে আছে?

তনুময় অসহায় চোখে তাকাল, ঝুরি নামা বটগাছের ছায়ার মাঝখানে টলটলে কাকচক্ষু জলের পুকুর। ঘরে ফেরা পাখিদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে পুকুরপাড় এখন উৎসবমুখর যজ্ঞের চেহারা নিয়েছে। আলো কমে গেলেও পাখিদের উৎসাহের কোনও কমতি নেই। পুকুরের চারধারের ঝুরি নামানো বটগাছগুলো যেন লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা পাহারাদার। ওদের কাঁচা পাকা পাতায় দিনের শেষ আলো। এই পুকুরটা তনুময়ের চেনা হলেও নামটা কিছুতেই

মনে করতে পারে না সে। অথচ নিজের দুর্বলতা সে দেবাশিসের কাছে প্রকাশ করতে নারাজ। সে যে পথ দিয়ে গ্রামে ফিরত এটা সে পথ নয়। বিগত বছরে অনেক কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে গ্রামগুলোয়। সোনাঝুরি-আকাশমণি গাছগুলো আগে ছিল না, এখন পঞ্চায়েত থেকে লাগিয়েছে। আগে যা ছিল শুধুমাত্র পায়ে চলার পথ, এখন সেই পথ শরীর ঢেকেছে মোরামে। আর ক'দিন পরে পিচ পড়বে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। তনুময়কে নিরুত্তর দেখে দেবাশিস বিজ্ঞের হাসি হাসল না, তার চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল অবজ্ঞাজনিত সূক্ষ্ম হাসির রেখা। সে সিগ্রেটের শেষাংশটা ঘাসে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, আমি জানতাম, তুমি পুকুরটার নাম বলতে পারবে না। এটা তোমার দোষ নয়। দীর্ঘ দিন যাতায়াত না থাকলে সবাই এইরকম অনেক কিছু ভুলে যায়।

দেবাশিসের কথাগুলো তনুময়ের গায়ের মাংস চিরে দিলেও তার কোন প্রতিবাদ করার শক্তি ছিল না। দেবাশিস হাসতে-হাসতে বলল, ডাকাত পুকুরের নাম কি তোমার মনে পড়ে? এই পুকুরপাড়ে আগে একটা মন্দির ছিল। এখন সেটা আর নেই। আমার দাদুর মুখে গল্প শুনেছি, পুকুরের জলে স্নান সেরে ডাকাত সর্দার মন্দিরে কালীমায়ের পুজো সেরে তবেই ডাকাতি করতে বেরোত। সন্ধের পরে আগে এই রাস্তা দিয়ে ভয়ে কেউ হাঁটতে পারত না। এখন দেখ, পুকুরপাড় ঝাঁট দেওয়া উঠোনের চেয়েও ঝকঝকে তকতকে। রাত দশটার পরেও এই রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল করে। ভয়ের কোনও কারণ নেই।

মণিদীপা দেবাশিসের কথা শুনে অবাক না হয়ে পারল না। ঝগড়ু রিকশা থামিয়ে দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে দিয়েছে আলো। কেরোসিন তেলের ডিবরি নারকেল তেলের কৌটোর মাঝখানে বসে আছে দিব্যি। মোটা, কালো শিস নড়ছে হাওয়ায়। সেই মলিন আলোয় মাত্র হাত তিনেক পথ দেখা যায়। ঝগড়ুর চেনা রাস্তা. ফলে তার কোনও অসুবিধা হয় না। মণিদীপার গলা শুকিয়ে আসছিল ভয়ে। তার মনে হল ফিঙে পাখির চেয়েও নিষ্ঠুর অন্ধকার ঘিরে ধরেছে তাকে। এই অন্ধকার চিরে সে কি আদৌ মেলায় পৌঁছতে পারবে?

খোলা মাঠে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার মহড়ায় ব্যস্ত ছিল উদ্দাম হাওয়া। মণিদীপার চুল হঠাৎই উড়ে এসে পড়ল মুখের উপর। বিরক্তিতে ঘিনঘিনিয়ে উঠল শরীর। গলা কাঁপিয়ে সে শুধোল, দেবাশিসদা, টর্চটা জ্বালুন। যা-অন্ধকার, ভ্যান-রিকশা ঠিকঠাক মেলায় পৌঁছালে ভাগ্য ভাল বলে ধরে নিতে হবে।

দেবাশিসের কাছে তিন ব্যাটারির টর্চ ছিল। রিকশার সামনে সে টর্চের আলো ফেলে বলল, তোমার কোনও ভয় নেই। অন্ধকার শুধু এই মাঠটুকুতেই আছে। মাঠ পেরলেই আবার একটা ছোট্ট গ্রাম পড়বে। আর গ্রামটা পেরলেই মেলার আলো দেখতে পাবে তুমি। আর বেশি পথ বাকি নেই। আমরা এসে গেলাম বলে—

তবু ভরসা পাচ্ছিল না মণিদীপা। অন্ধকারকে তার ভয় বরাবরের।

অন্ধকারের যে নিজস্ব রূপ আছে, সেই রূপের যাদুটোনায় মানুষ যে মোহিত হতে পারে এটা বোঝার শক্তি সে হারিয়ে ফেলছিল ক্রমশ। ভয়ে জড়োসড়ো দেখাচ্ছিল তার মুখ।

ঝগড়ুর শ্বাস টানা আর শ্বাস ছাড়ার শব্দ ছাড়া এখন আর পৃথিবীতে কোনও শব্দ নেই। মোরাম রাস্তা হঠাৎই উঁচু হয়ে ঢালু হয়েছে বেশ কিছুটা পথ গিয়ে। সাঁঝের বেলায় তার গা-বেয়ে টপটপিয়ে ঘামের ধারা কোমরের কাছে গিয়ে ঠেকছিল। দেবাশিস বুঝতে পেরে বলল, রিকশা থামাও ঝগড়ু, আমরা এইটুকু পথ হেঁটে যাই। তোমার কষ্ট হচ্ছে। এত আপ। তুমি ভ্যান ঠেলবে কী ভাবে?

তনুময় নেমে আসতেই মণিদীপাও নেমে এল ভ্যান-রিকশা থেকে। দেবাশিস টর্চ জ্বেলে পথ দেখাচ্ছিল ওদের। কিছুটা আসার পর দেবাশিস কৌতুকভরে শুধাল, তনুময়, তোমার কি মনে আছে এই উঁচু জায়গাটা কাদের জমি?

তনুময় অন্ধকারে চোখ মেলে তাকাতেই দেবাশিস টর্চের আলো ফেলল উঁচু জমিটায়।

প্রায় বিঘা দশেক অনাবাদী জমি মাঠের মাঝখানে হঠাৎ জেগে ওঠা দ্বীপের মতো মাথা তুলে আছে। বর্ষাতেও সেখানে জল দাঁড়ায় না; ফলে চাষ হয় না কোনও বছর। গ্রামের ছেলেরা ওটাকে বল খেলার মাঠ বানিয়েছে। তনুময় গ্রাম ছেড়েছে জ্ঞান পড়ার আগেই। বাবার সঙ্গে দু-একদিনের জন্য গ্রামে আসলেও এত খোঁজখবর সে জানত না। নিজের অজ্ঞতায় সে যখন বিব্রতবোধ করছিল, তখনই দেবাশিস বলল, ওটা হল সামন্তদের মাঠ। উঁচু জায়গা বলে ও মাঠে চাষ হয় না। এখন ওটা ফুটবল খেলার মাঠ। জানো তনুময়, সামন্তদের মাঠে এরোপ্লেন ভেঙে পড়েছিল। বেশি দিনের কথা নয়। এ ঘটনা তুমি নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। কাগজেও বেরিয়েছিল সেই ভাঙা এরোপ্লেনের ছবি। তখন আমি ক্লাস টেনে পড়ি। সাইকেল নিয়ে এসেছিলাম দেখতে। বাবা জানতে পেরে কত বকাঝকা করল। ধমক দিয়ে বলল, খবরদার আর কোনও দিন সামন্তদের মাঠে যাবিনে! ও মাঠ হল অভিশপ্ত মাঠ। দেখিস না, অত জমি, কী সুন্দর মাটি তবু ধান চাষ হয় না!

রিকশা যখন গ্রামের ভেতর ঢুকল তখন বুঝি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মণিদীপা, বড় করে শ্বাস ছেড়ে সে বলল, এত অন্ধকার আমি বুঝি জীবনে আর দেখিনি। মনে হচ্ছিল অন্ধকারের মাঝখানে হারিয়ে যাব, আর বুঝি ফিরতে পারব না। এখন আলো দেখে মনে হচ্ছে—আমরা বুঝি অন্ধকারের সমুদ্র পেরিয়ে এইমাত্র ডাঙায় এসে পা ছোঁয়ালাম।

দেবাশিস সশব্দে হেসে উঠল কথা শুনে। ঝগড়ু গামছা দিয়ে ঘাম মুছছিল। পিঠের ঘাম মোছা শেষ করে সে একটা বিড়ি ধরিয়ে মণিদীপার মুখের দিকে তাকাল, এই আঁধার আমাদের গা-সওয়া। আঁধার না থাকলে আলোর কি কদর আছে বলুন! আলো-আঁধার টাকার এপিঠ আর ওপিঠ।

ধান ভাঙা কলের শব্দ ভাসছিল বাতাসে। কেমন ধক্ ধক্ শব্দ। মণিদীপা শুধোল, ওটা কিসের শব্দ।

তনুময় বলল, ডিপ টিউবওয়েলের। গ্রামে এখন তোলা জলে চাষ হয়। বছরে তিন-চারটি ফসল উঠছে। গ্রামের মানুষ এখন অনেক বেশি সচ্ছল।

—এই জন্যই কি জেঠিমা গ্রাম ছেড়ে আসতে চায় না? মণিদীপার প্রশ্নে খোঁচা ছিল, নিজেকে সামলে নিয়ে তনুময় বলল, আমি যতদূর জানি, জেঠিমার অবস্থা এখন ভাল নয়। দাদারা জেঠিমাকে টাকা পাঠায় না। তাদেরও অভিমান জেঠিমা কেন শহরে গিয়ে থাকবে না।

—কী ভাবে যে চলছে, তা আমিও ভাবি। এক মানুষ, ইচ্ছে করলে যে কোনও ছেলের কাছে গিয়ে থাকতে পারেন। তবু যাবেন না। ঘর আঁকড়ে পড়ে আছেন। এ বড় কঠিন মায়া।

তনুময়ের কথা শেষ হল না, ফুঁসে ওঠা বেড়ালের চোখে তাকাল মণিদীপা, সেকালের মানুষগুলোর বিচারবুদ্ধি খুবই কম। ওরা নিজেরা কষ্ট পাবে, সেই সঙ্গে অন্যকেও কষ্ট দেবে। এটাও এক ধরনের পারভাশন্।

—জেঠিমাকে দেখলে তোমার একথা মনে হবে না। তনুময় বোঝাতে চাইল, ওরা ওদের সেন্টিমেন্ট নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। ওরা ওদের জীবন দিয়ে দেবে, তবু নিজের মত থেকে এক পাও সরবে না। ওদের বোঝানো তোমার-আমার কাজ নয়।

সন্ধ্যার ঘন ছায়া আছড়ে পড়েছে চরাচরে, শান্ত-নিঝুম পরিবেশে তনুময়ের ইচ্ছে করছিল না পারস্পরিক সম্পর্ককে উত্তপ্ত করতে। আপসের পথ বেছে নিল সে। মণিদীপার দিকে নিরীহ চোখে তাকিয়ে তনুময় ঢোক গিলল, আমরা মেলায় এসে গেলাম। এখানে দাঁড়িয়ে জান আমার শুধু জেঠিমার কথাই মনে পড়ছে। আগে এখানে জেঠিমার হাত ধরে আসতাম। একবার মেলায় ঢুকলে ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করত না। একটা পাঁপরভাজা খাওয়ার জন্য কত আগ্রহ ছিল আমার। এখন সেই আগ্রহ আর নিজের ভেতরে টের পাই না। কোথায় যে আবেগগুলো হারিয়ে যায় বুঝতে পারি না।

দেবাশিস উচ্ছল হয়ে উঠল মুহূর্তে, আমরা তাহলে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি কী বল?

—মানুষকে একদিন বুড়ো হতেই হয়। দেবাশিসের কথার জবাব দিল মণিদীপা, এমন একটা উত্তর দিতে পেরে নিজেকে সে তৃপ্ত মনে করল। এত কিছুর মধ্যেও প্রতিক্রিয়াহীন ছিল তনুময়। সব কিছু ছাপিয়ে তার চোখ ঘোরাফেরা করছিল মেলার ভিতরে। কত বছর এখানে আসা হয়নি, কত কিছু যে পাল্টে গিয়েছে তার কোনও হিসাব নেই। মেলার চাকচিক্য বেড়েছে আগের তুলনায় অনেক বেশি। মাইকে ভাসছিল মেলা-কমিটির ঘোষণা। রাত্রি ন'টায় যাত্রা শুরু হবে। সম্পূর্ণ পৌরাণিক পালা। আগেও হত। এখনও হয়। আগে যা

হত না, এখন যা নিয়মিত হচ্ছে তা হল ভিডিও শো। বেশ মারদাঙ্গা হিন্দি ছবির রঙিন বিজ্ঞাপন সাঁটা ছিল অস্থায়ী ভিডিও হলের তাঁবুর গায়ে। ওসব দিকে কোনও লক্ষ ছিল না তনুময়ের। তার চোখ খুঁজছিল পুতুলনাচের তাঁবুটা। পুতুলনাচ বছর-বছর আসে। এ বছর তাহলে আসেনি! খুব হতাশ দেখাল তনুময়কে। ছোটবেলার কত কী যে হারিয়ে গেছে। তার ছোটবেলা শ্লেটের ছবির মতো মুছে দিয়েছে কেউ। কে মুছে দিল এমন করে? সে কি নিজে মুছে ফেলেছে নিজের হাতে আঁকা অস্পষ্ট, কাঁপা-কাঁপা ছবি! হতে পারে। মানুষ তো অনেক কিছু মুছে ফেলে মন থেকে। তনুময়ের কষ্ট পাওয়ার মাত্রাটা আরও বাড়াল। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে সে টের পেল তার ভেতরের আরেকটা তনুময় তাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। ঘুমন্ত তনুময়কে ঠেলা মেরে জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে অন্য এক তনুময়। এ-ও এক রহস্যমিশ্রিত খেলা। যতদিন বেঁচে থাকা, ততদিন এ খেলার বুঝি শেষ নেই।

ছোট গ্রামীণ মেলা একসময় মুখে ঢোকানো বাতাসার মতো আকর্ষণ হারিয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। তনুময় ভিড়ের মধ্যে খুঁজতে থাকে তার জেঠিমাকে। মেলার মধ্যে দেখা হয়ে গেলে তাকে আর গ্রামের মধ্যে ঢুকতে হত না। নিজের সুবিধার জন্য সে যা ভাবছিল তা আদৌ বাস্তবায়িত হবার নয়। এই অসময়ে জেঠিমা মেলায় আসবেন কেন? তার অসুস্থ শরীর, তা ছাড়া বয়স হয়েছে। ইদানীং চোখেও কম দেখেন। তাকে এই অসময়ে মেলার মধ্যে আশা করাই ভুল। মণিদীপা উসখুস করছিল কিছু বলার জন্য। এক ঝলক শীত হাওয়া এল খোলা মাঠ পেরিয়ে। চারপাশের দাঁড়িয়ে থাকা বটগাছগুলোর পাতা নড়ে উঠল বুড়োদের পাঁজর কাঁপানো কাশির মতো। মেলার মাঝখানে পুকুর। অদ্ভুত রঙের জল নড়ে উঠল তিরতিরিয়ে। মেঘ সরে যাওয়া আকাশে তখন হাতে গোনা তারা। মণিদীপা গায়ে শাড়ির আঁচলটা ভালভাবে জড়িয়ে নিয়ে বলল, চলো, এবার আমরা ফিরে যাই।

খুব আশ্চর্য হল তনুময়, এত দূর এসে জেঠিমার সঙ্গে দেখা করে যাব না তা কী করে হয়? মেলা ছাড়িয়ে কপা গেলেই জেঠিমাদের ঘর। চলো, আমরা ঘুরে আসি।

—আমার আর হাঁটার শক্তি নেই। মণিদীপা বিরক্তির চোখে তাকাল, ভ্যান-রিকশার ঝাঁকুনিতে শরীর আমার টলছে। আমি আর হাঁটতে পারব না। তনুময় অসহায় চোখে দেবাশিসের দিকে তাকাল। দেবাশিস সমব্যথীর গলায় বলল, এতদূর এসেছ যখন, তখন জেঠিমার সঙ্গে দেখা করে যাওয়াই ভাল হবে। আমরা ওখানে বেশি সময় নষ্ট করব না। দু'মিনিট কথা বলেই ফিরে যাব। খড়কুটো আঁকড়ে ধরা ডুবন্ত মানুষের চোখে তাকাল তনুময়, হ্যাঁ এসেছি যখন, জেঠিমার সঙ্গে দেখা করেই যাব। চলো, আর দেরি করা ঠিক হবে না। আমরা ভ্যান-রিকশায় গিয়ে বসি। এখান থেকে জেঠিমার ঘর পর্যন্ত রিকশা যাবে।

মণিদীপা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভ্যানে গিয়ে বসল। মুখ মেঘলা, থমথম করছে জলবাহী মেঘের মতো। দেবাশিস তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল, তনুময় যা বলেছে, সেটা আমাদের মানা উচিত। আমি ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। নস্টালজিয়া গ্রাস করছে ওকে। ওটা ওর দোষ নয়। এই কন্ডিশনে আমারও এমন দশা হতে পারত।

ঝগড়ু র পথঘাট সব চেনা। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে পৌঁছে দিল জেঠিমার উঠোনে। ভ্যান থেকে সবার আগে নেমে এল তনুময়, এক পা হাঁটতে গিয়ে সে টের পেল তার রক্তের ভিতরে আবেগের জোয়ার এসেছে, স্মৃতি একটা মন্থর ডিঙি নৌকার মতো ঘোরাফেরা করছে তার সমগ্র সত্তায়। সামনে দাঁড়িয়ে আছে খড়ের ঘর, যতদূর দেখা যায় শ্রীহীন, অগোছালো। ফাটা দেওয়ালের ফাঁকে কালো বাস্তুসাপের মতো সিঁধিয়ে গিয়েছে অন্ধকার। অথচ এক সময় মাটির দেওয়ালে বহু যত্নে গোবর লেপে দিতেন জেঠিমা, সামনের উঠোনে ছড়া দিতেন রোজ ভোরে গোবর জলের। মুগ্ধ চোখে তনুময় দেখত ভেজা মাটির বুকে কেঁচোর ঘরগুলো কী অদ্ভুতভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আজ উঠোন আছে, কিন্তু উঠোনের শ্রীময়তা নেই। কঞ্চির বেড়ার উপর ঝিঙেগাছ লতিয়ে বাড়ছিল, লতার বুকে কোনও ফুল নেই, শুধু লিকলিকে সবুজলতা দোল খাচ্ছিল সর্পিল ঢেউ তুলে। পুকুরপাড়ে কলাঝাড়টা একইরকম রয়ে গেছে। একই রকম রয়ে গেছে মনসাতলা। তুলসীমঞ্চ। পচা খড়ের উপর শুয়ে আছে অন্ধকার। ঝগড়ু রিকশাটা পথের একপাশে দাঁড় করিয়ে বিড়ি ধরাল আমেজে। অসময়ে ভ্যান রিকশা দেখে কয়েকজন উৎসাহী লোক এগিয়ে এল সামনে। ওদের মধ্যে কে যেন বলল, কাদের ঘরে যাবে গো? ওরা তনুময়কে দেখেনি. তনুময়ই এগিয়ে এল সামনে। একটা বৃদ্ধ পোড়খাওয়া লোককে সে চিনতে পেরে শুধোল, হরিজ্যাঠা না?

—হ্যাঁ। কে? তনু নাকি?

—আমাকে চিনতে পারলে হরিজ্যাঠা?

—দেশের ছেলে, তোকে আমি চিনব না? হরিজ্যাঠা ফ্যাকাসে হাসল. ওর হাসিতে নিখাদ দুঃখ, গাঁ ছেড়ে তোরা চলে গিয়ে ভাল করেছিস। এখানে থাকলে কিছু হত না।

—এ কথা কেন বলছ জ্যাঠা? তনুময় খুব সহজ হতে চাইল ওদের কাছে। হরিজ্যাঠা খকখক করে বার কতক কাশল, তারপর শ্লেষ্মা উগরে বলল, তোর জেঠিমার শরীরটা তত বিশেষ ভাল নেই। ক'দিন থেকে শুয়ে আছে দেখছি। মোটে ঘরের বাইরে বেরয় না। কারও সঙ্গে তত বিশেষ কথা বলে না। সেদিন সদর থেকে তোর জ্যাঠার ছেলে দিবাকর এসেছিল। কত করে বুড়িকে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু সে যাবে না। বুঝি না, এ গাঁয়ে কী যে মধু রাখা আছে ওর

জন্য! তনু, তুই এক কাজ কর। এসেছিস যখন, তখন জোর করে তোর জেঠিমাকে নিয়ে যা।

তনুময় বলল, আমি তো বারবারই এক কথা বলছি, সে আমার কথা শুনবে তবে না!

—না শুনলেও জোর করে নিয়ে যা। এখানে থাকলে তোর জেঠিমা আর বেশি দিন বাঁচবে না। হরিজ্যাঠা চলে যাবার পর আবার এক রাশ অন্ধকার ছেঁকে ধরল তনুময়কে। তনুময় আর সময় নষ্ট করল না। উঠোন পেরিয়ে সরাসরি উঠে এল দাওয়ায়। গলা কাঁপিয়ে ডাকল, জেঠিমা, ও জেঠিমা!

ঘরের ভেতর থেকে ক্ষীণ গলায় সাড়া দিল কেউ, তারপর হ্যারিকেন হাতে মাজা ধাপিয়ে ঘরের ভেতর থেকে দুর্বল শরীর নিয়ে বেরিয়ে এলেন জেঠিমা। হ্যারিকেনের বাতি উসকে খুব আশ্চর্যভরা চোখ মেলে দেখলেন তনুময়কে, এতদিন পরে আমার কথা তোর মনে পড়ল তনু? সেই কতদিন আগে এসেছিলিস, তারপর তো আর খোঁজই নিলি না! আমি বুড়ো হয়েছি। ক'দিন আর বাঁচব বল? তোকে দেখে খুব ভাল লাগছে। আয় বাবা, বস।—জেঠিমা মাদুর পেতে দিলেন দাওয়ায়। মণিদীপা পিছনে ছিল, তাকে দেখতে পাননি জেঠিমা। মণিদীপা সামনে আসতেই জেঠিমা তার হাত ধরে বললেন, ও মা, আমার কী ভাগ্য, বৌমাও এসেছে দেখছি তোর সঙ্গে! আসো মা, বসো। জেঠিমা মণিদীপার হাত ধরে জোর করে বসিয়ে দিলেন মাদুরে, তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, সবাই চলে গেল কিন্তু আমি তো যেতে পারলাম না! কতবার ভেবেছি—চলে যাব। তবু পারিনি। যাওয়া বললেই কি যাওয়া হয় গো?

—এখানে তো আপনার আর কিছু নেই, আপনি চলুন আমাদের বাসায় গিয়ে থাকবেন। মণিদীপা সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করল, আপনি গেলে আমার অনেক সুবিধা হবে। ওখানে আমাদের মাথার উপর কেউ নেই, বিপদে-আপদে আপনি আমাদের আগলে রাখবেন।

—যাওয়ার কথা তো ওরাও বলেছিল। জেঠিমার মুখ শীতের ঝরে পড়া বিবর্ণ পাতার মতো দেখাল, এই বয়সে আমি আর কোথাও যাব না বৌমা। কোথাও গিয়ে মন বসানো খুব কঠিন হবে। এই গ্রামে আমার জীবনের তিন ভাগ সময় তো কেটে গেল। আর তো মাত্র ক'টা দিন! এই কটা দিন আমি শান্তিতে থাকতে চাই।

তনুময় কিছু বলার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করছিল। পুকুরপাড়ে কলাঝাড়ে হাওয়া এসে ছটফটিয়ে উঠল দমবন্ধ করা রোগীর মতো। এত দূর থেকে অন্ধকারে কলার বেগো ভেঙে পড়ার শব্দ শুনতে পেল সে। মারাত্মক মর্মান্তিক শব্দ। এই শব্দের ভিতরে যন্ত্রণার অণু-কণিকারা লুকিয়ে ছিল বুঝি। তনুময় কাতর হয়ে বলল, জেঠিমা, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারিনি। শুধু স্বার্থপরের মতো নিজেরটাই দেকেছি। জ্ঞান পড়ার পর থেকেই শুধু বাবার সঙ্গে

ঘুরছি। ফলে আমার কোনও নির্দিষ্ট ছোটবেলা নেই। আমার টাকা-পয়সা-মান-সম্মান সব আছে, শুধু হারিয়ে গেছে ছোটবেলা। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার মতো অসহায় মানুষ বুঝি আর দুটি নেই। আমার সামান্য যেটুকু ছোটবেলার স্মৃতি আছে তার সবটা জুড়ে তুমি আছ জেঠিমা। যখন নিজেকে নিয়ে ভাবি, তখন খুব করে তোমার কথা মনে পড়ে। আর মনে হয় আমরা সবাই তোমার উপর অবিচার করেছি। যতটুকু তোমার প্রাপ্য ছিল আমরা তোমাকে তা দিইনি। এই অপরাধবোধ আমাকে প্রায়ই কুরে কুরে খায়। জেঠিমা সব শোনার পরেও নিরুত্তর থাকলেন কিছু সময়। তনুময়ের কথাগুলো সব হৃদয়জনিত, হৃদয় দিয়েই বুঝতে হবে। ওর এই অস্থিরতার মূল্য এই কঠিন সময়ে কতটুকু আছে তা জেঠিমা সঠিকভাবে অনুমান করতে পারেন না। তবু তনুময়ের এই চিন্তা-ভাবনা তার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। প্রসঙ্গ বদলে জেঠিমা খুব সহজভাবে বললেন, তোরা এসেছিস বলে আমার ভাল লাগছে। ক'দিন থেকে শরীরটা আমার ভাল যাচ্ছে না। ক'দিন আমার কাছে থাক। তোরা থাকলে আমার অসুখ সেরে যাবে।

তনুময় ফাঁপরে পড়া চোখ-মুখ নিয়ে মণিদীপার মুখের দিকে তাকাল। মণিদীপার মুখের অবস্থা বাসি ফুলের চেয়েও করুণ। থাকবার জন্য তারা এখানে আসেনি। তারা এসেছে, দেখা করে ফিরে যাবে বলে। কিছু বলার আগেই দেবাশিস উদ্ধারকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হল, আজ আমরা থাকতে পারব না, জেঠিমা। কাল ভোরে আমাকে কলকাতা যাওয়ার বাস ধরতে হবে। আমরা এখনই ফিরব। ভ্যান-রিকশা তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

—এভাবে কেউ কি আসে? জেঠিমার গলা অভিমানে বুজে এল, অসময়ে তোমরা এলে! দুটো মিষ্টি যে তোমাদের দেব তেমন সুযোগও আমার নেই। গ্রামে-ঘরে সব কিছু তো হাতের কাছে পাওয়া যায় না, বাবা!

—আপনি ওসব নিয়ে ভাববেন না, জেঠিমা। আমাকে এক গ্লাস জল দিন।

জল নয়, জেঠিমা সরবত করে এনে দিলেন ওদের। যাওয়ার সময় বেড়ার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ছল ছল করছিল চোখ। বয়স্ক ঠোঁটের কাঁপুনিটা বলে দিচ্ছিল তিনিও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। এই বিপর্যস্ততার রেশ কাটিয়ে উঠতে তার সময় লাগবে।

ঝাপড়ুর ভ্যানে বসে তনুময় বলল, ওই যে ডাঙা জমিটা, ওখানে আমাদের ঘর ছিল। ওখানে আমার জন্ম হয় এক হিম শীতের রাতে। আমার জন্মের পর থেকে আমার মায়ের শরীরটা ভেঙে যায়। জেঠিমার দুধ খেয়ে আমি নাকি মানুষ হয়েছি!

মণিদীপার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। কোনও কথা না বলে সে তাকিয়ে থাকল দূরের দিকে। দেবাশিস একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, জন্মভূমিতে এসে তুমি বেশ দুর্বল হয়ে পড়ছ, তনুময়। আমাদের বয়স হচ্ছে। এখন এসব দুর্বলতাকে

মানুষ ভাল চোখে দেখে না। আমার মনে হয়, এখনকার পৃথিবীতে এ ধরনের আবেগের কোনও মূল্য নেই। প্রায় মানুষই এখন আবেগহীন শুষ্ক কাঠ।

তনুময় ঠোঁটে আঙুল বুলিয়ে নিল আনমনে। ওর জন্মভিটে পেরিয়ে ঝগড়ু র ভ্যান ছুটছিল দ্রুত গতিতে। ডিবরির ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে পড়েছে মোরাম ঢাকা পথে। আলোর পোকা ছুটে আসছে দলে দলে। তনুময়ের মনে হল সেও বুঝি ওই আলোর পোকাগুলোর মতন। জেঠিমা ক্ষীণ আলোক বিন্দু।

তনুময়ের মা এখনও বলে, ও তোর জেঠিমা নয়, ও হল তোর দুধমা। দিদি না থাকলে তোকে কি আমি বাঁচতে পারতাম। তুই জন্মাবার পরেই আমি তিন মাস বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলাম না। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়েছিল। অথচ দেখ, তার সেবায় আমরা দু-জনেই বেঁচে উঠলাম।

ভাবতে ভাবতে একসময় বিড়বিড়িয়ে উঠল তনুময়ের ঠোঁট. পাশে বসা দেবাশিসের হাত চেপে ধরে সে বলল. জানো দেবাশিস, জেঠিমা আমার দুধমা। জেঠিমার দুধ খেয়েই আমি আজ বেঁচে আছি। আমার সব কিছুর উৎসমূলে ওই জেঠিমা।

দেবাশিস কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকাল তনুময়ের মুখের দিকে। তনুময় দেবাশিসকে দেখছিল না। তার অস্থির ভেজা চোখ দুটো একভাবে তাকিয়ে ছিল ঝগড়ু র ভ্যান-রিকশার নিচে বেঁধে রাখা কেরোসিন ডিব্‌রিটার দিকে। আলোর পোকারা উড়ছিল ঝাঁকে-ঝাঁকে। এও যে এক মেলা। এত ক্ষুদ্র পোকা তবু ওরা আলোক উৎস ছেড়ে এক পাও নড়ছিল না। এই প্রেম, আকর্ষণ কোথায় হারাল তনুময়! তবে কি সে ওই পোকাগুলোর চেয়ে ক্ষুদ্র?

দু-চোখ অন্ধকারে জলে ভরে যেতেই মণিদীপা বলল, রুমাল নেবে? তখন বলেছিলাম না—তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে। এখন বিশ্বাস হল তো আমার কথাটা!

মণিদীপার কথাগুলো তনুময়ের চোখের জল ঝরিয়ে দিল যেমন দমকা হাওয়া এসে ঝরিয়ে দেয় মেঘের ভ্রূণ।

# রঙ

ছায়া সরে যাওয়া পৃথিবীতে প্রমথ চাইছিলেন মনের মত করে সেই ছবিটা আঁকতে—যে ছবিটা তিনি রোজ স্বপ্নে দেখেন।

সাধনা পরপর দু-কাপ চা করে দিয়েছেন তাকে, স্বামী যখন আঁকতে বসেন রঙ-তুলি নিয়ে তখন তিনি চা করাটাকে সংসারের একটা কাজ করা বলে ধরে নেন। এ সংসারে চায়ের অনেক ঝামেলা। যখন চিনি থাকে তখন হয়ত চা পাতা থাকে না, আর চা-পাতা থাকলে দুধের বড় আকাল হয়ে পড়ে। অথচ এক সময় সারা মাসের চা-চিনি-দুধ মজুত থাকত প্রমথর ঘরে। এখন সেই একই ঘর তবু অভাব এসে থাবা মেরেছে তার পাঁজরে। ছবিটা অনেকদিন থেকে অর্ধেক হয়ে পড়েছিল, পরপর দু'দিন অফিস ছুটি বলে প্রমথ সেই ধুলো লাগা ড্রয়িংসিটের ভাঁজ খুলে শিউলি তলায় এসে বসেছেন। একটা রঙচটা টিনের চেয়ারে তার ফাটা গেঞ্জি ঢাকা পিঠ, বড় তুলিটায় রঙ চুবিয়ে আকাশ আঁকছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছিলেন আকাশের দিকে, সেই স্বপ্ন মাখা চোখের তারায় যথাযথ ধরা পড়ছিল না মেঘলা প্রকৃতির রঙ। তার পায়ের কাছে নামানো শূন্য পেয়ালা, সোলক্ষয়া চপ্পলটা সরে গিয়েছে কাজের ঝামেলায়। প্রমথ পায়ের উপর পা তুলে উদাস চোখে দূরের মাঠটার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিলেন, সম্ভবত ছবির রঙ সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল তাকে। রঙ নির্বাচনে প্রমথ একটু চড়া সুরের, নিজের জীবনের সঙ্গে ছবির রঙকে তিনি মিলিয়ে দিতে ভালবাসেন। প্রমথ কেন চড়া রঙকে পছন্দ করেন তার কারণ সঠিক ভাবে তিনি নিজেও জানেন না ; তবে ছবি দেখে, রঙের যথেচ্ছ ব্যবহার দেখে সাধনা ঠাট্টা করে বলেন, যারা অভাবী হয় তাদের মনের রঙ কিন্তু আকাশের রঙের চাইতে গাঢ়। জীবনে অভাব থাকলেও রঙের বেলায় তারা রাজা মহারাজা। —কেন এমন বলছো? প্রমথ কষ্টের হাসি হেসে প্রশ্ন করলে সাধনা সেই একই সুরে বলেন, অভাব মানুষের স্বভাব বদলে দেয় একথা কিন্তু ঠিক। তোমার আগের ছবিগুলোর চেয়ে এখনকার ছবিগুলো অনেক উগ্র মেজাজের। রঙের আধিক্যই বলে দেয় তুমি কষ্টে আছো।

সাধনার কথাগুলো হয়ত ঠিক। ভাবলেন প্রমথ। রঙ নির্বাচনে তিনি প্রথম থেকেই খুঁতখুঁতে। ফলে আগুনের রূপ আঁকতে গেলে তার সময় কীভাবে হাতছাড়া হয়ে যায় তা তিনি নিজেও জানেন না। একটা সীমাহীন অতৃপ্তি শূন্য বুকে শূন্য আকাশ হয়ে ধরা দেয়। প্রমথ যে ছবি আঁকতে চান, যেমন ভাবে আঁকতে চান—তা-না পেরে হতাশায় ভুগতে থাকেন সর্বক্ষণ। তবু রঙ তুলি নিয়ে নাড়া-ঘাঁটা না করলে তার পেটের ভাত হজম হয় না। তিনি অতৃপ্তিতে ভোগেন।

সাধনা বোঝেন প্রমথর মনকে। শিল্পীর দুঃখ সহজাত—একথাও তিনি জানেন। যৌবনবেলার স্মৃতিকথা এখনও তো তিনি ভোলেননি। সমুদ্রের ধারে ছবি আঁকছিলেন প্রমথ। ময়ূরকণ্ঠী নীল রঙ যে উত্তাল ঢেউয়ের এত সুন্দর প্রকাশ হতে পারে—তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। ফলে মুগ্ধতা গ্রাস করেছিল তাকে। ছবিটা কিনতে চেয়েছিলেন সরাসরি। এমন একজন সুন্দরী শিল্প অনুরাগী পেয়ে প্রমথ দাম নিতে অস্বীকার করেছিলেন প্রথমে কিন্তু সাধনার জোরাজুরিতে শেষে তাকে দাম নিতেই হল। সেই আলাপের কথা এখনও তো মনে পড়ে সাধনার, তখন তিনি অন্যরকম হয়ে যান, প্রমথর মুখের দিকে তাকিয়ে সমুদ্রতটে সেই যুবকটিকে খোঁজার চেষ্টা করেন—যার চোখের গভীরতা ছিল সমুদ্রের গভীরতা। প্রেম মানুষকে বন্য জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়. পাগল বানায় সুস্থ মানুষকে। প্রমথর প্রেমের টানে জোয়ারের টানে ভেসে যাওয়া বিসর্জনের ফুলের মত অবলীলায় ঘর ছেড়ে দিলেন সাধনা। সেই শক্তি এখন যে কোথায় হারাল সারাদিন কপালে হাত দিয়ে ভাবলেও উত্তর মেলে না। জীবনটা এখন সরল দেবদারু গাছের মত, ঢেউ খেলানো পাতাগুলো শুধু প্রমথর এক একটা সৃষ্টির মত—এটুকু আনন্দ-সুখ ছাড়া সাধনার জীবনে এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। অথচ তিনি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন. প্রমথ উঁচুদরের শিল্পী হয়ে উঠুক, তার শিল্পচ্ছটায় বিস্মিত হোক সমগ্র দুনিয়া। চাওয়াটা একটু বেশি চেয়েছিলেন তিনি. তাই হয়ত অলক্ষ্যে মুচকি হেসে ছিলেন বিধাতা। হয়ত তারই শাস্তিস্বরূপ. প্রমথকে সরকারি চাকরি নিয়ে চলে আসতে হল কলকাতা ছেড়ে। সাধনা বিয়ের আগেই গর্ভবতী, প্রমথকে তিনি কিছুতেই বোঝাতে পারেননি. ফলে সেই ভুলের মাশুল সারাজীবন ধরে গুণছেন। এই সাধারণ ক্লাস-থ্রির চাকরিটা যদি প্রমথকে না নিতে হোত তাহলে তাদের জীবন-নদী বুঝি অন্য খাতে বইতে পারত। ঘরে যখন আগুন লাগে তখন ড্রেনের জল আর নদীর জলের মূল্য বুঝি একই। প্রমথর সোনার মত গুণটা গিল্টি গয়নার দামে বিকোল। জীবিকার জন্য সে হল সরকারি ফার্মের সাধারণ একটা পেন্টার। গাড়ির নাম্বারলেখা, আসবাবপত্রে ফার্মের ছাপ মারা, কখনও বা অফিসারদের বাংলোর জানলা দরজা রঙ করার জন্য তার মৌলিক শিল্পীসত্ত্বাকে ব্যবহার করা হত। চাকরির প্রথম দিন থেকে প্রমথ নিজেকে শিল্পী বলে কারোর কাছে জাহির করেনি, তার অতৃপ্ত শিল্পী সত্ত্বা গুমরে ওঠে প্রসাশনের নির্মম চাকায় পিষ্ট হয়ে। এ যেন এক বিরাট ফাঁদ, ঘুঘুপাখির মত প্রমথ সেই যে আটকে গিয়েছেন, এতদিনেও নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না।

সাধনা প্রায়ই দুঃখ করে বলেন. কী চেয়েছিলাম আর কী পেলাম! তখন যদি নিজেদের একটু সামলাতে পারতাম তাহলে আজকের এই কষ্টের জীবন বইতে হোত না। জান তো, মাঝে মাঝে এ জীবন আমার অসহ্য লাগে, আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। আমার সব চাইতে বেশি কষ্ট হয় তোমার জন্য। তোমার

তুলির রঙ যে অমন ভাবে শুকিয়ে যাবে, তোমার ভেতরে শিল্পী মনটা যে এভাবে মরে যাবে—এটা আমি কখনও ভাবিনি।

—জীবন যেমন বয় তাকে তেমন বওয়াতে হয়। প্রমথর ঋণাত্মক কথাগুলো সাধনাকে তৃপ্তি দিতে পারে না এই বয়সেও। তিনি এখনও চান প্রমথর শিল্পী হৃদয় আবার অঙ্কুরিত হোক অভাব-দারিদ্রের অপ্রতিকূল আবহাওয়ায়, প্রমথ আবার ফুটে উঠুক পারিজাতের মতো। কিন্তু অভাবের বিষ বুঝি সাপের বিষের চেয়েও ভয়ানক, সাধনার শুকনো উৎসাহ তাই সেই বিষের প্রকোপে নীল হয়ে গেছে একদিন। এখন জীবনের বিকেলবেলায় পৌঁছে প্রমথ ভেবেছেন, এমন একটা ছবি তিনি আঁকবেন যা হবে তার শেষ সৃষ্টি ; যার প্রতিটি রেখার টানে, রঙের সুষম ব্যবহারে তিনি বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল। মনের এই গোপন ইচ্ছাকে তিনি ছেলে-মেয়ে এমন কী সাধনার কাছেও প্রকাশ করেননি, যদি হেরে যান এই ভয় সদাসর্বদা তাকে অন্তর্মুখী করেছে।

শূন্য পেয়ালার দিকে তাকিয়ে চায়ের তেষ্টা অনুভব করেন তিনি, সাধনাকে বলতেই প্রথমে নিমরাজী হন তারপর রান্নাঘরে ঢুকে স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল বসান তিনি।

অমলা রুষ্ট চোখে তার দিকে তাকায়, চোখ কুঁচকে মুখ বিকৃত করে বলে, সকাল থেকে দু-কাপ চা হয়ে গেছে, এই বয়সে কি এত ঘন ঘন চা খাওয়া ভাল দেখায়? এমনিতে হার্টের ট্রাবল, তার উপরে যে হারে বিড়ি ফোঁকেন বাবা—তাতে কোন বিপদ না ঘটে গেলে বাঁচি!

পুত্রবধূ অমলার তিক্ত কথাগুলো মন দিয়ে শোনেন সাধনা। বুঝতে পারেন—অমলা ভয় পাচ্ছে তার নিরাপত্তার খাতিরে। প্রমথর যদি কিছু অঘটন ঘটে যায় তাহলে সরকারি এই বাসাবাড়িটা ছেড়ে দিতে হবে তাদের। তখন কোথায় দাঁড়াবে তারা? বড় ছেলে প্রণবেশ এখনও বেকার, বিয়ের পর থেকে সে চক্ষুলজ্জার খাতিরে গুল কয়লার ব্যবসা করে। অমলার তাই মুখ ফুটেছে, স্বামী যেহেতু সংসারে টাকা দেয় তাই সে তার অধিকারবোধ ফলাতে কোন কার্পণ্য করে না। এই সব হিজিবিজি ছবি আঁকা, রঙ তুলি নিয়ে দিনভর খেলা করা—এসব তার দু'চোখের বিষ। সুযোগ পেলে সে-ও বলে বসে, বাবা কী ছাইপাশ আঁকে বুঝি না। এর চেয়ে যদি সাইনবোর্ড লিখত তাহলে দু-চার পয়সা ঘরে আসত।

—যা বোঝ না ; তা নিয়ে তর্ক করো না, বৌমা। সাধনার ব্যথিত কথাগুলো অমলাকে কোনদিন স্পর্শ করো না, তাই সে মূর্খের মত বলে, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে এখন ছবি এঁকে শিল্পী হওয়া যাবে না। সময় পেরিয়ে গেলে চোখে চালসে ধরে মানুষের। চাল্‌সে ধরা চোখ নিয়ে বাবা কি আঁকবেন তা আমার আর জানতে বাকি নেই।

—তুমি তোমার জানা নিয়ে থাকো। অনধিকার চর্চা করো না। সাধনার দু-

চোখে আগুন জ্বলে উঠলেও অমলা চুপ করে না, সে খোঁচা দিয়ে বলে, যার কাজ হল জানলা-দরজা রঙ করা, তার ছবি যে কত মহৎ শিল্প হতে পারে তা আর আমার জানতে বাকি নেই। কবে ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছিল, এখন গন্ধ শুঁকলে তা-কি পাওয়া যাবে? আপনার ছেলেও এসব পছন্দ করে না ; সে তো সব সময় বলে, রঙ-তুলি আর ক্যানভাসের যা দাম তাতে বাবার এতসব বিলাসিতা করা ভুল হচ্ছে।

এই নির্দয় কথাগুলো আহত করেছিল প্রমথকে। ছবি আঁকা থামিয়ে তিনি তখন প্রায়ই যেতেন মদের দোকানে। অফিস ফেরতা ভরপেট মদ খেয়ে ঘরে ফিরতেন তিনি। টাকার দরকার হলে জুয়ার আসরে বসতেন। তারপর এক সময় সর্বশ্রান্ত হয়ে ফিরে এসে সাধনার সামনে মুখ নীচু করে দাঁড়াতেন। সাধনা বকাঝকা করলে তার মুখ থেকে টু শব্দটিও বেরত না। শুধু দু-চোখের তপ্ত অশ্রুকণা ভিজিয়ে দিত তার রুক্ষ্ম-শুষ্ক গাল। প্রণবেশ রাগারাগি করে বলত, বাবা, তুমি কি আর কোনদিনও বদলাবে না? প্রণতির এখনও বিয়ে বাকি। অমলেশ বেকার। তুমি কি ওদের কথাও ভাববে না? এভাবে মদ-জুয়া নিয়ে মাতলে সমাজে যে আমরা মুখ দেখাতে পারব না।

—আমি তোমাদের মুখে চুনকালি দেবার মত কোন কাজ করিনি। মদ এ সমাজে কে না খায়? আমলা থেকে রিকশাওলা সবাইতো মদের দোকানে লাইন লাগায়! প্রমথর কথাগুলোয় তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে প্রণবেশ, সে রাগে অন্ধ হয়ে বলে, তারা কেউ তোমার মত হাঁটুর বয়সী ছেলেদের সঙ্গে জুয়া খেলে না। তারা জানে—বয়স বাড়লে মানুষের কি করা উচিত, আর কি করা উচিত নয়।

—শিল্পীর আবার বয়স কী?

—ছাড়ো তোমার শিল্পী! তাচ্ছিল্যে বেঁকে-চুরে গেল প্রণবেশের মুখমণ্ডল, সারাজীবন যে শুধু অফিসের আসবাবপত্রে ছাপ মেরে গেল, নাম্বারিং করে গেল প্রোডাক্টের—সে যদি শিল্পী হয় তাহলে বাজারের ঐ রামু সাইনবোর্ডওলাও শিল্পী।

—চুপ কর প্রণবেশ, ছোটমুখে বড় কথা বলা উচিত নয়। রাগে থরথর করে কাঁপে প্রমথর শরীর। কথা জড়িয়ে যায় তার। তবু কোন মতে বলেন, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না—এতো জানা কথা। আমি জানি, তোমরাও আমাকে কোনদিনও বুঝবে না। বোঝার মত চোখ তোমাদের নেই। তোমরা দেববংশে অসুর হয়ে জন্মেছো।

অমলা প্রণতি অমলেশ ও প্রণবেশ—কেউই চায় না, তার বাবা ছবি আঁকুক। শুধু সাধনা একা কুম্ভের মত ঠেকিয়ে রেখেছে তার জেদ। এই ছবি আঁকাআঁকিকে কেন্দ্র করে একদিন তাদের ভালোবাসার সূত্রপাত। এই ছবি নিয়েই যেন তাদের শেষ হয় জীবন। এমন আশায় দু-চোখ ভরে থাকে সাধনার। তাই ছবি আঁকার

সময় তিনি কাউকেই ঘেঁষতে দেন না প্রমথর কাছে। নিজে দ্বাররক্ষীর মত চেয়ার নিয়ে বসেন দরজার কাছে। কখনও পাশে গিয়ে দাঁড়ান, উৎসাহ দেন অকৃপণ।

প্রণতি সকাল সকাল স্নান সেরে সিনেমায় যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। কলোনির আর সব মেয়েরা যাবে, অতএব তার না গেলে চলবে না। টাকার জন্য সে প্রমথর কাছে দরবার করতে চায় ; সাধনা অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, এখন তোমার বাবাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। কতদিন পরে আঁকতে বসেছে....তুমি গেলে ওর মুডটাই নষ্ট হবে।

—শুধু নিজের মুড দেখলে চলবে না। ছেলে মেয়েদেরও মুড বুঝতে হবে। প্রণতির ঝাঁঝাল সুরে চমকে তাকাল সাধনা। কষ্টে বুক ভেঙে যায় তার। এমন সন্তান তিনি গর্ভে ধারণ করেছিলেন ভাবতেও লজ্জা হয় এখন। প্রণতি অবুঝের গলায় বলে, মা, আর দেরি করো না! খেয়ে-দেয়ে আমি সিনেমায় যাব। সবাই রেডি হয়ে গিয়েছে। শুধু আমারই হয়নি।

—এত ঘন ঘন সিনেমা দেখা কি ভাল দেখায়? তুমি বড় হচ্ছো—সাধনার কথা শেষ হল না, প্রণতি ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল তার কথা, বড় হয়েছি বলেই তো সিনেমা দেখার বড় প্রয়োজন। সিনেমা না দেখলে যুগটাকে জানব কী করে? মা, প্লিজ আর দেরি করো না। তোমার কাছে যা আছে আমাকে দাও। -বেশি না কুড়ি টাকা দিলেই হবে।

—কুড়ি টাকা আমি কোথায় পাব?

—বাবার রঙ-তুলি কেনার জন্য টাকা পাও কোথা থেকে?

—সে তো তোমার বাবারই টাকা! তোমার বাবার মাইনে থেকে—

—আমাকেও সেই মাইনে থেকে দাও। প্রণতি অবুঝের মত বলল কথাগুলো। সাধনার মাথা ভার হয়ে এল যন্ত্রণায়। আলমারির চাবিটা ছুড়ে দিয়ে তিনি বললেন, যাও, যা খুশি করগে যাও। আমাকে আর জ্বালিও না। আমি তো তোমার বয়স থেকেই জ্বলছি।

চাবিটা হাতে ধরে নিয়ে হাসল প্রণতি. জ্বলে-জ্বলে তুমি সোনা হয়েছ মা। আমরা কোনওদিন তোমার মত হতে পারব না। এই বয়সে তুমি বাবাকে যা ভালবাস—সিনেমার হিরোইন বুঝি তার হিরোকে এত ভালোবাসে না। প্রণতি চলে যাবার পর শূন্যতা গ্রাস করে সাধনার অন্তঃস্থল। তার ভেতরটা গুমরে ওঠে অজানা এক ভয়ে। একী কঠিন সময় এল? কেন আয়ত্তের বাইরে চলে গেল ওরা. কার দোষে. কিসের জন্য? জোড়া চোখে জল ভরে উঠল সাধনার. শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে তিনি স্বামীর পাশে দাঁড়ালেন। প্রমথ তুলি থামিয়ে মৃদুগলায় বললেন, অনভ্যাসে কপাল চড় চড় করে, আমার হয়েছে সেই অবস্থা। সাধনা, তুমি যতই চেষ্টা করো, আমার দ্বারা আর কোন কিছুই হবে না।

এই দেখ আঁকতে চেয়েছিলাম আকাশ অথচ রঙ যা বুলিয়েছি—তাতে পুরো ক্যানভাসটাই মনে হচ্ছে—পলাশ বন। সেই ময়ূরকণ্ঠী নীলরঙের ব্যবহার আমি ভুলে গিয়েছি, কিছুতেই আর আকাশের নীলিমাকে ধরতে পারছি না তুলির আঁচড়ে। তুমিই বলো, আকাশের রঙ কি কখনো পলাশ রঙা হয়? —তুমি তো ঠিকই এঁকেছো। সাধনা বেশ জোর গলায় বললেন কথাগুলো, বয়সের সাথে সাথে আকাশের রঙও বদলায়। এই গোধূলিবেলায় আকাশের রঙ তো পলাশ রঙা।

—তুমি বলছো?

সাধনা সম্মতির চোখে তাকালেন, কাঁচা-পাকা চুলে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, আকাশের নীচে এই ঘর বাড়ি সংসার সবই তো যথাযথ ফুটেছে তোমার তুলিতে। আমাদের এই বেড়াটাকেও এঁকেছ ভাল, শুধু শিউলি গাছটা কেমন চোখে লাগে। এ সময় কি গাছের পাতা এত সবুজ থাকে? প্রমথ হাসলেন, তুমি ঠিকই বলেছ। আসলে বয়স হয়েছে তবু আমার চোখ থেকে এখনও সবুজতা হারায়নি। সবুজ রঙ আমার বড় প্রিয় রঙ। তাই একটু বেশি দিয়ে ফেলেছি।

সাধনা গভীর ভাবনায় ডুবে গিয়ে অস্ফুটে বললেন, আমি বুঝতে পারিনি। তুমি ঠিকই বলেছ। সবুজ তো জীবনের প্রতীক। সবুজ তো বেঁচে থাকার আনন্দ। সবুজ মানে থেমে থাকা নয়, এগিয়ে যাওয়া—

ওরা যখন কথা বলছিলেন তখন রিকশ থেকে নামল ওদেরই ছোট ছেলে অমলেশ। দিন আষ্টেক আগে সে কলকাতায় গিয়েছিল কোন এক বিশেষ কাজে, তখনই অমলেশকে পোস্টার কালার কেনার জন্য টাকা দিয়েছিলেন প্রমথবাবু। তাই ছোট ছেলেকে দেখে তিনি এগিয়ে গেলেন আগ্রহ ভরে, এই এলে বুঝি?

—হ্যাঁ, বাবা! রিকশর ভাড়া মিটিয়ে অমলেশ সংকোচ ভরা চোখে বাবা-মার দিকে তাকাল। রিকশর সিটের দিকে তাকিয়ে অমলেশ লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, বাবা, আমি কিন্তু তোমার পোস্টার কালার আনতে ভুলে গিয়েছি। তবে তার বদলে আমি শীলাকে সঙ্গে করে এনেছি।

—শীলা! প্রমথর কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ঝরে পড়ে, ওকে তো চিনলাম না?

—ও তোমার বৌমা। আমি কালীঘাটে শীলাকে সিঁদুর পরিয়েছি। অমলেশ কুণ্ঠিত স্বরে বলল, ওর সাথে আমার আলাপ হয়েছিল ট্রেনে। ওর আগে একবার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু বিয়ের তিন বছর পরে স্বামী মারা যায় ক্যানসারে। ওর একটা ছেলে আছে দু'বছরের। আমি তাকে পরে আনব। এখন শুধু শীলাকেই নিয়ে এলাম।

—আমাদের না জানিয়ে এত বড় সিদ্ধান্ত তুমি নিতে পারলে? প্রমথর গলা

বুজে এল কথাগুলো বলতে গিয়ে। গুঁড়ি গুঁড়ি ঘামে ভরে উঠল তার মুখ। বড় বিপন্ন আর অসহায়বোধ করছিলেন নিজেকে।

অমলেশ এসব ভ্রূক্ষেপ না করে ভারী অ্যাটাচিটা নামাল রিকশ থেকে ; তারপর শীলাকে বলল, নেমে এসো। ওরা আমার বাবা-মা, ওদের প্রণাম কর।

শীলা নীচু হয়ে পায়ে হাত ছোঁয়ানোর আগেই তিনি হাত পিছিয়ে এলেন সাধনা, চোখে-মুখে কঠিন্য এনে বললেন, থাক, আমাকে প্রণাম করার কোন প্রয়োজন নেই তোমার। তোমরা যখন নিজেরাই সব কিছু করতে পেরেছ তখন আমাদেরকে আর এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন?

শীলা ভীতু চোখে মুখ নিচু করে দাঁড়াল। অমলেশ স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে বলল, এটা কার্সিস।

—বাবা-মাকে না জানানোটাও কি একটা কার্সি? সাধনার কঠিন কথায় টলে গেল অমলেশের হৃদয়, তবু সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তুমি যখন পালিয়ে এসেছিলে ঘর থেকে তখন কি তোমার বাবা-মা জানতেন তুমি প্রেগনেন্ট! জানত না। তবে এটা তুমি জেনে রেখ—শীলা প্রেগনেন্ট নয়। সে বিধবা ঠিকই, কিন্তু তোমার মত নয়—

—চুপ কর অমলেশ। জীবনে এই প্রথম বুঝি ছেলেকে ধমকে উঠলেন প্রমথ, চোখে আগুন ঝরিয়ে বললেন, তোমার লজ্জা করে না মায়ের চরিত্র নিয়ে কথা বলতে? যাও, বৌমাকে নিয়ে ঘরে যাও, রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিন ক্রিয়েট করো না।

—না, ওকে আমি ঘরে ঢুকতে দেব না। সাধনা হাত মেলে অনড় শরীরে গেটের সামনে দাঁড়ালেন।

অমলেশ জ্বলে উঠে বলল, পথ ছেড়ে দাও মা। আমাদের যেতে দাও। ট্রেন জার্নি করে খুব টায়ার্ড লাগছে—

সাধনা উত্তেজিত হয়ে বললেন, যেতে হলে আমাকে মাড়িয়ে যাও। আমি বেঁচে থাকতে এ ঘরে তোমাদের কোন স্থান নেই।

শীলা এগিয়ে এল ধীর পায়ে, নম্র স্বরে বলল, মা, আমি আপনার মেয়ের মত। জীবনে কোন সুখ আমি পাইনি। তাই, ওর হাত ধরে এখানে এলাম। এত বড় জীবন, একা বাঁচতে ভয় করছিল তাই ওর অবলম্বনকে বাঁচার রাস্তা বলে ভেবেছি। আপনি তাড়িয়ে দিলে আমরা চলে যাব ; কিন্তু এমন আশা করে আমি তো ঘর ছেড়ে আসিনি। একটা ঘর পাবার আশায় আমি সবকিছু ছেড়ে এখানে এসেছি। সবাইকে নিয়ে থাকব, এটাই আমার সখ। নাহলে শহরে কি ঘরভাড়ার অভাব? তাছাড়া, আমি নিজেও তো একটা চাকরি করি—

দু-হাত আলগা হয়ে এল সাধনার। মনে পড়ল—তার সেই অভিশপ্ত দিনগুলোর কথা। প্রণবেশ তখন তিন মাসের ভ্রূণ, প্রমথ বেকার। শুধু একটা

আশ্রয়ের জন্য তারা আত্মীয়-স্বজনের দোরে দোরে হন্যে হয়ে ঘুরেছে. কেউ তাদের একদিনের জন্য স্থান দেয়নি লোকলজ্জার ভয়ে। সেই ভয় কী করে হুবহু উঠে এল শীলার গলায়, এত বছর পরে?

তবে কি সময় এতটুকুও পাল্টায়নি? সাধনা ভাবল, গলা বুজে এল তার কান্নায়। প্রমথর রঙে ভরান ক্যানভ্যাসের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ওগো তুমি এই ছবি ছিঁড়ে ফেল। সময় শুধু হেঁটেছে, তার রঙ একটুও পাল্টায়নি। শীলা আর অমলেশকে দেখ। ওদের চোখের রঙ কি আমাদের চোখের রঙের মত ছিল না?

প্রমথ ঘাড় নাড়লেন শুধু।

মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে তিনি হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন সেই রঙ—যে রঙ দিয়ে তিনি সমুদ্রতটে ছবি আঁকতেন। ঝুঁকি নিতেন জীবনের, শিল্পের। ঝুঁকি নিতেন সমূহ আকাশের ভার বইবার।

কত বছর পরে তিনি আবার যুবকের সবুজ হাতে তুলি ধরলেন, সবুজকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে।

# গঙ্গামাটি

খরায় শুধু মাটি পোড়ে না, মনও পোড়ে। ক'পা হেঁটে আসার পরেই কান্নাটা ঠেলে উঠল জানকী বুড়ির গলায়। প্রহ্লাদের কঠিন কথাগুলো তার সারা শরীরে ঘাম ঝরিয়ে ছাড়ল। অমনি কুঁকড়ে গেল মন, গা-হাত-পা হয়ে গেল অসাড়-অবশ। দু'চোখে খেলে গেল হলুদ আলোর বিচ্ছুরণ। কী কুক্ষণে মরতে সে গিয়েছিল প্রহ্লাদের দোরে। প্রহ্লাদের বউ ঝর্না তাকে দূরছাই করে তাড়িয়ে দিল। না চেনার ভান করে বলল, সাত দোরে ঘুরেও যার পেটের গর্ত ভরে না তার পেট তো সমুদ্র। ভগবানেরও বাপের সাধ্যি নেই সে পেট ভরায়।

কথা শুনে আর থাকতে পারেনি জানকী বুড়ি, এমনিতে তার ক'দিন থেকে খাওয়া-শোওয়ার ঠিক নেই তাই ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিল, এই পেটেই তো প্রহ্লাদ জন্মেছিল বউ, এই পেটে দশ মাস দশ দিন না ধরলে সে তোমার সোয়ামী হতে পারত না। এখন যে ছোট মুখে বড় কথা বলো সে তো ঐ আমার ছেলের ফুটানীর জোরে। বেলুনের হাওয়া বেরিয়ে গেলে তার আর কি ইজ্জোত থাকে গো?

জানকী বুড়ির কথাগুলো ঝর্নার দু-কানে বিষবোলতার হূল ফুটিয়ে দেয়, জ্বালা পোড়া করে ওঠে তার সর্বাঙ্গ, বুড়িকে ঠেলা মেরে ফেলে দিয়ে সে মুখের উপর দরজা লাগিয়ে দিল। দুপুরবেলায় শুকনো মাটিতে আছড়ে পড়েছিল জানকী বুড়ি, তার চোখ ফেটে জল এসেছিল তবু সে নিশ্চল নির্বিকার। কার কাছে সে মনের কথা বলবে, কে শুনবে তার দুঃখের কথা? বয়স হলে মানুষের শুধু জ্ঞান কমে না, কথার ভার-ধার দুটোই কমে যায়। এর আগেও প্রহ্লাদকে সে অনেকবার বলেছে বউমার গুণকীর্তির কথা। সে এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিয়েছে কথা। বরং মাকে শাসন করে বলেছে, তোমাকে না হাজার দিন বলেছি তুমি আমার ঘরে যাবে না? যদি যাও তাহলে দু-চার টাকা যাও বা দিই, তাও বন্ধ করে দেব। আমার কাছে আগে ঘর, তারপর অন্য সব।

—আমি কি তোর ঘরের মধ্যে পড়ি না বাপ? মা কি কোনদিন পরের মানুষ হয় রে?

জানকী বুড়ির দীর্ঘশ্বাস নিংড়ানো কথাগুলো প্রহ্লাদের মনে কোন রেখাপাত করেনি! উল্টে সে বউয়ের পক্ষ নিয়ে বলেছে, পরের মেয়েকে তুমি যদি বারবার জ্বালাতন করো তাহলে সে ছেলে মেয়েদের নিয়ে তার বাবার বাড়ি চলে যাবে। তখন আমি তোমাকে ছেড়ে কথা বলব না।

—বউ তাহলে তোর কাছে মায়ের চেয়েও বেশি?

জানকী বুড়ির প্রশ্ন প্রহ্লাদ এড়িয়ে গেছে সযত্নে। চতুর গলায় সে বলেছে,

মায়ের জন্য বউকে তো আমি পর করে দিতে পারি নে। তোমার তো তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তোমার এখন এত বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। তুমি যেখানে আছো, সেখানেই থাকো। আমি মাসে মাসে তোমার টাকা বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসব।

—পাঁচ মাস হলো তুই আমাকে ঘর খরচা দিস নে, তাহলে আমার কী-ভাবে চলে? পেটে দানা না জুটলে মাথা কি কারোর কাজ করে?

জানকী বুড়ির চোখ জুড়ে জল এসে গেলেও প্রহ্লাদ তবু প্রতিক্রিয়াহীন। একটা পাউরুটির দাম ধরিয়ে দিয়ে সে বলে, আমাকে আর অফিসে এসে জ্বালিও না, যা বলার কোয়ার্টারে গিয়ে বলো। এভাবে আমার মুখে আর চুন-কালি লেপে দিও না। তুমি যদি আমাকে এভাবে বিরক্ত করো তাহলে আমি এখান থেকে বদলি হয়ে অন্য অফিসে চলে যাব। তখন মাথা ঠুকে কাঁদলেও কেউ তোমাকে দুটো টাকা দেবে না!

গাছতলায় বসে আঁচলের ঘসটানীতে জ্যাবজেবে ঘাম মুছে নিয়ে দূরের দিকে তাকাল জানকী বুড়ি। গলাটা সেই কখন থেকে শুকিয়ে আছে, ঢোক গিললেও থুতুতে গলা ভেজে না। সে ভেবেছিল আজ দুপুরের খাবারটা ছেলের বাড়িতেই খেয়ে নেবে। কিন্তু ঝর্না তাকে দেখলেই তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। কেন যে জ্বলে ওঠে এর কোন কারণ খুঁজে পায়নি সে। গুণধর বুড়া দিনরাত বিড়ি বেঁধে মানুষ করল ছেলেটাকে। তার কত আশা ছিল প্রহ্লাদের উপর। ছেলে বড় হয়ে দশজনের একজন হবে। সবাই বড় মুখ করে বলবে, হ্যাঁ, প্রহ্লাদ মানুষের মত মানুষ হয়েছে। ছেলে চাকরিতে ঢোকার আগেই গুণধর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল টিবি হাসপাতালের বিছানায়। সেদিনই জানকী বুড়ির সুখের গাছটাকে দুর্ভাগ্যের ছাগলে মুড়িয়ে খেয়ে নেয়। প্রহ্লাদ চাকরি পেল, তবু বুড়ির ভাগ্যের চাকা ঘুরল না, বরং অক্ষমতার কাদায় আটকে গেল সেই চাকা। তিন মাসের মাথায় প্রহ্লাদ বিয়ে করল আগে থেকে পছন্দ করে রাখা ঝর্নাকে। বিয়ের মাত্র দশ দিনের মাথায় ওরা বস্তির ঘর ছেড়ে চলে গেল ভাড়া ঘরে। যাওয়ার সময় জানকী বুড়িকে তারা রেখে গেল বস্তির ঘর পাহারা দেবার জন্য। প্রহ্লাদ বুঝিয়ে সুজিয়ে বলল, মা, তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি তোমাকে রোজ একবার এসে দেখে যাব। তোমার আর রাঁধাবাড়ার দরকার নেই, আমিই ভাত নিয়ে আসব তোমার জন্য। প্রথম প্রথম ভাত নিয়ে আসত প্রহ্লাদ, মাস না ঘুরতেই তার মন ঘুরে গেল, কাঁচুমাচু মুখ করে সে বলল, তোমার বউমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, সে এখন আর রান্নাঘরে যেতে পারে না। আমি নিজেই হোটেল থেকে ভাত এনে খাচ্ছি, তুমি বরং নিজেরটা এবার থেকে নিজে ফুটিয়ে খাও। এই নাও টাকা, আমি তোমার খাই-খরচা সব দিয়ে যাব। ছেলের অসুবিধার কথা ভেবে জানকী বুড়ি নিজেই হাত পুড়িয়ে সেদ্ধভাত খেত। ছেলে

বউয়ের জন্য তার মন কাঁদলেও কিছু করার ছিল না। প্রহ্লাদ তাকে স্পষ্ট করে বলেছিল, তোমার আর আমার ঘরে গিয়ে কাজ নেই। তুমি গেলে বস্তির ঘরটা কে সামলাবে? বাবার ঘরখানা তো তোমাকেই সামলাতে হবে। তাছাড়া তুমি আমার ঘরে আসো, তোমার বউমা তা পছন্দ করে না। তার মাথা গরম, তোমাকে দেখলেই মাথায় রক্ত উঠে যায়। ছেলের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে জানকী বুড়ি কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি সেদিন। কপাল পুড়লে কাঁচা হাঁড়ির মত তা আর শক্ত হয় না বরং ঘসির মত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বুড়ো হলে, বয়স বাড়লে মানুষ যেন মেরুদণ্ডহীন কেঁচো। সব বুঝেও মন মানে না জানকী বুড়ির। বুড়োর শোক ভোলা যায়, কিন্তু ছেলের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হজম করা সহজ কথা নয়। বুকের ওম দিয়ে, দুধ দিয়ে, স্নেহ ভালবাসা মমতা দিয়ে ছেলেকে সে পাখির ছায়ের মত বড় করে তুলেছে। এখন উড়তে শিখেই সে যদি ডানা ঝাপটিয়ে সুখের খোঁজে পালিয়ে যায় তাহলে তাকে কি আটকে রাখা যায় বুকের খাঁচায়? মায়ের বুকের খাঁচা তো হাড়খাঁচা? হাড়খাঁচায় মিশে থাকে স্নেহের পরশ। মন মানত না জানকী বুড়ির, ছেলের খোঁজে সে প্রায়ই যেত বাসাবাড়িতে। ঝর্না ফাটা কাপে চা দিত তাকে, কোনদিন বসতে বলত না, ম্যাক্সি পরে পটের বিবি সেজে ঘুরত। দেখেও না দেখার চেষ্টা। প্রহ্লাদের চোখের সামনে ঘটত সবকিছু, সে যেন মুখ সেলাই করা তোতাপাখি, বউয়ের চোখের ঈশারায় চলা-ফেরা করত। কোন দিন বড় মুখ করে বলল না, মা, আজ তুমি এখানে দুটো খেয়ে যাও। ছেলের ঘরে সে যেন পরের মানুষ। ঝর্না ঠোঁট উল্টে বলত, আমাদেরই চলে না, মাসে মাসে তোমাকে টাকা দেব কোথা থেকে? দুটো সংসারের দায় ভার সামলান কি এ যুগে চাট্টিখানি কথা? এবার থেকে তুমি নিজের ভাতের যোগাড় নিজে করে নাও। তোমার ছেলে যা বলতে পারে না, আমি তাই বলে দিলাম। বিশ্বাস না হয় ঐ তো তোমার ছেলে কুঁজো হয়ে বসে আছে, ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখো?

কপাল পুড়লে সেই ঘা আর সহজে শুকায় না। প্রহ্লাদ মাত্র ক'বছরেই হয়ে গিয়েছে অসুর, জহ্লাদ। প্রায়ই বস্তির ঘরে এসে শাসিয়ে যায়, তোমাকে না হাজারবার মানা করেছি আমার বাসায় যাবে না? কেন যাও? তোমার কি লজ্জা শরম বলতে কোন জিনিস নেই? এবার যদি তোমাকে আমার বাসার সামনে ঘুরঘুর করতে দেখি তাহলে পাড়ার ছেলেদের দিয়ে তোমার হাড়-গোড় সব ভেঙে দেব। একদিন অশান্তি যা হবার হোক, রোজ রোজ আমি অশান্তি পছন্দ করি না।

—শেষ পর্যন্ত মায়ের গায়ে তুই হাত তুলবি? জানকী বুড়ির ঠোঁট থরথরিয়ে কেঁপে উঠলেও প্রহ্লাদের ঠোঁট শক্ত হয়ে ওঠে রাগে, হ্যাঁ-হ্যাঁ মারব। মেরে মেরে তোমার হাড় আমি গুঁড়ো করে দেব। তোমার জন্য আমি তো বউ-ছেলে-মেয়েকে বিসর্জন দিতে পারব না।

—তাহলে আমার খাই-খরচ তুই দিবি না? এই বুড়ো বয়সে আমি পরের

দোরে হাত পাতলে তোর মান-সম্মান কি বেড়ে যাবে? জানকী বুড়ির এই প্রশ্নটাই প্রহ্লাদকে ঘুমাতে দেয় না শান্তিতে। বিছানায় অন্তরঙ্গ মুহূর্তে ঝর্না তার বুকে হাত বুলিয়ে বলে, মা-মা করে তোমার মনটাই দেখছি শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেল! এত যখন মায়ের উপর টান তাহলে আমাকে কেন বিয়ে করতে গিয়েছিলে?

প্রহ্লাদের মুখে কোন জবাব নেই। ঝর্না তাকে যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল, রেসের ঘোড়া ছুটতে না পারলে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। তোমার মায়ের ঐ চিমড়ে শরীরটার দাম নিশ্চয়ই রেসের ঘোড়াগুলোর চেয়ে বেশি নয়?

—তুমি কি বলতে চাও? প্রহ্লাদ সোজা হয়ে বসেছিল বিছানায়। দু-চোখ জুড়ে ভয়, সংশয়, দ্বন্দ্ব। ঝর্না খুব সহজভাবে বলল, বুড়িকে একদিন ঘরে ডেকে আন ভুলিয়ে ভালিয়ে, তারপর যা করার আমি করব। তোমাকে আর ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। পথের কাঁটা কীভাবে সরাতে হয় তা আমার চেয়ে আর কেউ ভাল জানে না।

গুণধরের টালির ঘরখানায় চাঁদ দেখা যায় রাতের বেলায়, শীতের রাতে হিম ঢুকে যায় হুড়মুড়িয়ে, বর্ষায় ঘরের মেঝে ভিজে যায় জলের ধারায়। বুড়ি না মরা পর্যন্ত ঘরটার দখল পাবে না প্রহ্লাদ। ঝর্না বারবার করে বলছে, ও বুড়ি মরবে না। ভাতে বিষ মাখিয়ে দিলাম তবুও মরল না। খেয়ে-দেয়ে দিব্যি হাসপাতালে গিয়ে উগরে দিল। আয়ুর জোর না থাকলে এমন ঘটনা ঘটে না। ওর কাছে যে আর আমাকে কতবার হেরে যেতে হবে কে জানে?

—মাকে বিষ খাইয়ে মারার ষড়যন্ত্র করা তোমার উচিত হয়নি। প্রহ্লাদের মৃদু প্রতিবাদে ঝর্না যেন আগুন উগরান গলন্ত আগ্নেয়গিরি, কী উচিত আর কী অনুচিত—সেটা আমি তোমার মত বোকার কাছ থেকে শিখব না। জান, আজও রামু দালাল এসেছিল ঘরে। বস্তির ঘরখানার দাম দিয়ে গেল কুড়ি হাজার টাকা। ভাবো তো কুড়ি হাজার টাকা যদি নগদ পেতাম তাহলে কত কাজে লাগত। সাদা- কালো টিভিটা পাল্টে আমরা রঙিন টিভি আনতে পারতাম।

—তোমাকে আমি রঙিন টিভি কিনে দেব। কুঁই-কুঁই করে কোনমতে কথাগুলো বলে প্রহ্লাদ। দাঁত-মুখ সিঁটকে ঝর্না বলে, তোমার মুরোদ আমার জানা আছে। ঐ ভিখারী মায়ের পেটে তো তোমার জন্ম, মানুষ হয়েছো বস্তিতে, তোমার আর কী উন্নতি হবে! কয়লাকে শত ধুলেও তার ময়লা যায় না।

—তুমি যা চাও, তা আমার দ্বারা হবে না।

—তোমার দ্বারা না হলেও তা আমার দ্বারা হবে। ঝর্নার চোখ লাল হয়ে ওঠে উত্তেজনায়, তুমি ভেবো না, আমি বুড়িকে ঠিক যমরাজের কাছে পাঠিয়ে দেব। এবার আর বিষ নয়, ওকে আমি পুড়িয়ে মারব। কী ভাবে যে মারব তা তোমাকে আমি বলব না।

প্রহ্লাদ এখন অফিস ইউনিয়নের হোমড়া-চোমড়া নেতা। প্রায় দিনই তার বাসার সামনে মোটর সাইকেল আর স্কুটারের ভিড় লেগে থাকে। শহরের নামী-দামী লোকের আনাগোনা। তার ঘরে বসেই ইউনিয়নের যাবতীয় শলাপরামর্শ হয়। সেখানেও ভাগ নেয় ঝর্না। তার সিদ্ধান্তকে অনেকেই স্বাগত জানায়। অনেকেই বলে, প্রহ্লাদদা, বৌদির ব্রেন হলো একস্ট্রা অর্ডিনারি! তোমার মত স্ত্রী ভাগ্য ক'জনের হয়?

মাদক বিরোধী ভাষণ দিতে প্রহ্লাদ দলবল নিয়ে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে গ্রামে। গ্রামে-গঞ্জের অশিক্ষিত মানুষকে নেশার কুফল নিয়ে বিস্তারিত বোঝানোর প্রয়োজন আছে। সেন্ট্রাল কমিটির নির্দেশ অমান্য করতে পারেনি প্রহ্লাদ। সে সাত দিন থাকবে না শহরে। কম্‌সে কম পঞ্চাশটি গ্রাম তাকে ঘুরতে হবে এই সাত দিনে। সব শুনে ঝর্না খুশি হয়ে বলল, দেশের কাজে যাচ্চো এ নিয়ে এত ভাবনা কেন? আমি তোমার সংসার সাত দিনের জন্য ঠিক সামলে রাখতে পারব। তুমি নিশ্চিন্ত মনে যাও। আমাদের জন্য না ভাবলেও চলবে।

—তাহলে একটা কাজ করো। মাকে এই কুড়িটা টাকা দিও। প্রহ্লাদের গলা বুজে আসে, সেদিন দেখলাম মা ঝুপড়ি হোটেল থেকে ভাত চেয়ে খাচ্ছে। আমাকে দেখেও কোন কথা বলল না। মা যদি চাইত সেদিন আমার মুখে চুনকালি লেপে দিতে পারত অনায়াসে।

—সে আর কোনদিন তোমাকে পথে-ঘাটে বিরক্ত করবে না। ঝর্না দাঁত বের করে হাসল, আমি তাকে ট্রেনিং দিয়ে দিয়েছি। সে এখন আমাকে রীতিমতন ভয় পায়। আমার বাসায় এলেও সে এখন আর বেয়াদপি করার সাহস পাবে না।

প্রহ্লাদ চলে যাবার পরই ঝর্নার মাথায় কুটকাচালির খেলা শুরু হয়। এই শহরে একজন ভিখারিনী তার আত্মীয়া এটা ভাবতে তার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। তাছাড়া কলোনির লোকে হাজার রকমের কথা শোনায়। সামনে না হলেও পিছনে অনেকেই বলে। সে কার মুখকে চাপা দেবে! হাওয়ার গতিকে সে রুখে দেবে তার তো এমন সাধ্য নেই। তবে মানুষ পারে না, এমন কাজ কি আছে? ঘরের দালাল তাকে কুড়ি হাজার টাকার লোভ দেখিয়ে গিয়েছে। বস্তির ঘরখানা সে যে করেই হোক নিজের দখলে আনবে। তা না হলে তার মনে শান্তি নেই। সাতদিন সময় কম নয়। প্রহ্লাদ ফিরে আসার আগেই তাকে যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। সে কিছুতেই প্রহ্লাদ কিংবা জানকী বুড়ির কাছে হার মানতে নারাজ।

ভর দুপুরে হাঁড়িয়া খেয়ে জানকী বুড়ি ঘরে ফিরে আসে টাল মাটাল পায়ে। যে দিন ভাত জোটে না, সেদিন সে হাঁড়িয়া খেয়ে পেট ভরায়। তাছাড়া খরার দিনে হাড়িয়া খেলে শরীরটাও ঠাণ্ডা থাকে। ছেলে বউয়ের অপমান সওয়ার জন্য হাঁড়িয়া হল তার কাছে এক ধরনের শক্তি। ঘরে এসে সে তালাই পেতে শুয়ে

পড়ে মেঝেয়। মনে হাজার রকমের চিন্তা। মাঝে মাঝে তার মনে হয় এ জীবন রেখে কোন লাভ নেই। শরীর অচল হলে সেই শরীরের কী দাম? তার চেয়ে ভগবানের কাছে চলে যাওয়াই শ্রেয়। বুড়োটা আগেভাগে গিয়ে ভালই করেছে। তাকে আর জড়জগতের জ্বালাযন্ত্রণা বেশি ভোগ করতে হল না! আজ দিন ভর ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত বুড়ির শরীর। এবার না খেতে পেয়ে মরলেও সে আর ছেলের দোরে যাবে না। আর সে অপমান হজম করতে পারছে না। ওরা ওদের মত থাকুক। বৌমার রাগের কাছে সে কোনদিও দাঁড়াতে পারল না। এ যুগে মেয়েরা তো মেয়েদের বড় শত্রু! নাহলে সেদিন মাত্র একটা টাকা চাইতে গিয়ে তাকে গায়ে গরম জলের ফোসকা নিয়ে ফিরে আসতে হল। বৌমা রেগেমেগে তার গায়ে গরম জল ছিটিয়ে দিয়েছিল। ফুঁসলিয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে মারল। চিৎকার করারও সুযোগ দেয়নি। মুখে গুঁজে দিয়েছিল কাপড়। চোখ রাঙিয়ে বলেছিল, যদি বাঁচতে চাও তো পালাও। আর কোনদিন এ মুখে এসো না। আর কোনদিন পথে-ঘাটে তোমার ছেলেকে জ্বালিও না। যদি শুনি জ্বালিয়েছ তাহলে তোমাকে আমি জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব। কেউ আমার কিছু করতে পারবে না।

সেই থেকে ভয়ে মরছে জানকী বুড়ি। ভয়টা সদা সর্বদা তার পেছনে ফেরে। গায়ের ফোস্‌কাগুলো শুকিয়ে গেলেও দাগগুলো মেলায়নি। এই লজ্জার কথা সে কাউকে মুখ ফুটিয়ে বলতে পারেনি। তাছাড়া বৌমার বদনাম হলে কি তার সুনাম হবে? কাঁটা নিয়ে খেলতে গেলেই রক্ত ঝরার ভয় থাকে। এই বয়সে আর অশান্তি চায় না জানকী বুড়ি। ছেলের মায়া সে ভুলে যাবার চেষ্টা করছে। বস্তিবুড়া তার দুঃখ শুনে বলেছে, পেল্‌হাদের মা, মানুষের সোনা বোঝাই জাহাজ জলে ডুবে যায়, তার শোকও মানুষ ভুলে যায়। তুমার পেল্‌হাদ তুমাকে ভুলে গেলে তাতে তুমার কি আসে যায়? তুমিও ওরে ভুলে যাও, তাহলে দেখবা মনে কুনো অশান্তি নাই। অশান্তি হলো গিয়ে আগুন, তাতে যত হাওয়া দেবা ততই বাড়বে!

বস্তি বুড়ার কথাগুলো জানকী বুড়ির মনে মলমের কাজ করেছে। সে ধীরে ধীরে চেষ্টা করছে ছেলে-বউমা-নাতি-নাতনীকে ভুলে যেতে। কিন্তু ভোলা বড় সহজ কথা নয়। যা ভাবা সহজ, তা করা কঠিন।

গলাটা শুকিয়ে আসছিল জানকী বুড়ির। হাঁড়িয়া খেলেই গলাটা শুকিয়ে যায় হঠাৎ-হঠাৎ। ঘরের কোণে মাটির হাঁড়িটায় জল নেই। বস্তির কুয়ো অব্দি না গেলে কে তাকে জল দিয়ে যাবে ঘর বয়ে? গলাটা ক্রমশ শুকোয়, শুকাতে থাকে। জানকীবুড়ি মাটির হাঁড়িটা নিয়ে দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। আঁধার নেমে এসেছে চারপাশে। গলিতে ছেলেছোকরার দল ঘাপটি মেরে বসে আছে। ওদের কর্মহীন জীবনে সুখ নেই। বেকারত্ব এই অন্ধকারে ওদের কুরে কুরে খায়। নেশা করার পয়সা না পেলে গরম হয়ে যায় ওদের মাথা। গলিপথ

ধরে জানকীবুড়ি হেঁটে আসছিল কুয়োর কাছে। কে যেন তাকে টালমাটাল অবস্থায় পেয়ে বলল, বুড়িটা আজ বহুৎ নেশা করেছে। কেন করবে না? ওর ছেলে থাকতেও যে নেই!

যে টুকু আলো ছিল তাও নিভে যায় ঝুপ্ করে। কুলগাছের ডাল থেকে উড়ে গেল কালপেঁচা। পুরো বস্তি জুড়ে এখন লোড শেডিং। থিক-ধিক করে অন্ধকার। তবু চেনা পথে হাঁটতে কষ্ট হয় না জানকীবুড়ির। সে শামুক-মন্থর গতিতে হাঁটে। হাতে তার মাটির হাঁড়ি।

সরকারি কুয়োর কপিকলের শব্দ হয়। বালতিটা জলের মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকে ধীরে ধীরে। বস্তিবুড়ার ঘরটা কুয়োর পাশে। সে সবার জল তোলার শব্দ চেনে। আঁধারের মাঝখানে গলা খেঁকারি দিয়ে বলে, কে গো, পেল্‌হাদের মা বুঝি?

—হ।

—তা কখন ফিরলে ভিখ্ মেঙে? বস্তিবুড়ার গলা থেমে যায় কিছু সময়ের জন্য। তারপর আবার গলা ঝেড়ে নিয়ে বলে, আজ পাশের গাঁয়ের হাটে গেচিলাম। সেথায় তুমার পেল্‌হাদরে দেখলাম। বড় ভাল লাগল তুমার ছেলেটারে দেখে। জানো পেল্‌হাদের মা, তুমার বেটা কত কী বলল লেশা করা নিয়ে। আহা, ওর মুখ থিকে যেন মধু ঝরে পড়ছিল। তুমার বেটার গলাটা হুবহু গুণধরের মতো।

—ওর কথা আমার কাছে বলো নি। জানকীবুড়ি নাকের সকড়ি মুছে ফ্যাচ করে কেঁদে উঠল আঁধারে, সোনার জাহাজ ডুবে গেলেও মানুষ ভুলে যায়, তাহলে আমি কেন তার কথা ভুলব নি? তুমি কি ভাবো, আমার কলজেটা কমজোরী? তা লয় গো। আজ আমি টুকে বেশি হাঁড়িয়া খেয়েচি! হাঁড়িয়া না খেলে যে মরা পেট কথা শোনে নি?

বস্তিবুড়া দূর থেকে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলল, লেশা-ভাঙ আর করো না। তুমি তার মা হয়ে নেশা করে এলে? ছিঃ, এ কাজ তুমার মানুষের কাজ হলো নি। ছিঃ পেল্‌হাদের মা, কাল থিকে তুমি হাঁড়িয়া-রশি ছুঁবে না। তুমাকে তোমার বেটার কিরে...অন্ধকারে ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে জানুকীবুড়ির কান, আর্তনাদের মত শোনায় তার কণ্ঠস্বর, এ তুমি কী বললে গো, এ যেন আমার মরণ সমান। গরিব মানুষ আমি, হাঁড়িয়া না খেলে খাব কী গো?

—তুমাকে তুমার বেটার কিরে, তুমি আর হাড়িয়া ছোঁবে না। আঁধারে আবার চিল্লিয়ে ওঠে বস্তিবুড়া, যদি না খেতে পাও তাহলে মর, তবু তুমি তুমার বেটার মুখ রাখো।

অন্ধকারে হায়-হায় করে ওঠে জানকী বুড়ি। জলের শব্দ মিলিয়ে যায় জলে। হাঁড়ি ভরে জল আনতে গেল তার পা টলে, তবু সে হাঁটে। মাথার উপর দিয়ে

বিশ্রী ডাকতে ডাকতে উড়ে যায় কালপেঁচা। ভয়ে বুক মুচড়ে ওঠে তার। মাটির হাঁড়িটা শক্তভাবে ধরে সে হাঁটে। তার মনে হয় সে যেন তার ছেলের ঘামে ভেজা শরীর ধরে হাঁটছে। আর ভয় করে না তার। বস্তির অন্ধকারকে তার কোন অভিশাপ বলে মনে হয় না। বরং মনে হয় এই অন্ধকার স্বাভাবিক। এটাই যেন স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ। অন্ধকারে থেকেও প্রহ্লাদের জন্য তার গর্ব অনুভূত হয়। গায়ে গরম জলের ছিটে দিলেও সে আবার কাল তার ছেলের বাসায় যাবে। বউমাকে গর্ব করে বলে আসবে ছেলের কথা। সে-এও বলে আসবে, প্রহ্লাদকে সে পেটে ধরেছিল।

ভাঙা টালির ঘরের সামনে এসে বুড়ির চোখ জ্বলে ওঠে আঁধারে। ফিসফাস কথা কানে ঢোকে তীরের ফলার মতো। বুড়ি থেমে যায় ঝাঁটি বেড়ার আড়ালে। আঁধারে ভেসে আসে গলা, যা করার তাড়াতাড়ি কর। বুড়ি এসে যাবে। তখন কিন্তু কেস গুবলেট হয়ে যাবে।

—গলার হারটা মনে হয় সোনার।

—ওটা খুলে নে। চুড়ি-কানের দুল সব খুলে নে। এ মালটা আমাদের এদিককার নয়। পাখি উড়ে এসে ফাঁদে ধরা পড়েছে। যা করার তাড়াতাড়ি কর।

হঠাৎ পেট্রোলের গন্ধ ভাসল বাতাসে। ভয়ে পিছিয়ে গেল দু-জন ছোকরা। একজন ফিসফিসিয়ে বলল, ঘোন্টু পেট্রোলের গন্ধ আসছে রে। শালা পেট্রোল আসবে কোথা থেকে? তোরা যা, আমি দেখছি। আজ ওর সব খুলে নেব। তারপর...। জিভ টসটসিয়ে উঠল তার। অন্ধকারে জ্বলে উঠল চোখ।

—খাসা মাল, ভাগাভাগি করে খাব। বহুৎ দিন পর পেয়েছি।

হাত থেকে খসে পড়ল মাটির হাঁড়ি জানকী বুড়ির। ভয়ে ভয়ে সে শুধোল, কে, কে রে ওখানে? কী করছিস তোরা?

অন্ধকার ফুঁড়ে এগিয়ে এল একজন। ভাঙা মাটির হাঁড়িতে পা কেটে গেল তার।

—বাপরে, মরে গেলাম! বলে সে খাবড়ে ছুটে গেল গলিপথে। বুড়ি আর দেরি না করে গলা ভাসিয়ে দিল বাতাসে।

—ওগো, কে কুথায় আছো ছুটে আসো। আমার ঘরে চোর এসেছে গো... তার খনখনে গলা ছুটে গেল অলিতে গলিতে। সবার আগে হ্যারিকেন হাতে ছুটে এল বস্তিবুড়ো। তার দেখাদেখি আরো অনেকেই। জানকীবুড়ির ছোট উঠোনে গিজগিজিয়ে উঠছে লোক। দাওয়ায় টর্চের আলো ফেলতেই মুখে কাপড় বাঁধা ঝর্না নড়ে উঠল ডানা বাঁধা পোলট্রির মুরগির মত। বুড়ি ছুটে গিয়ে তার মুখের কাপড় খুলে দিল, তারপর হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বিস্ময়ে শুধোল, বউমা, এই আঁধার রাতে তুমি এখানে কি করতে এসেছিলে? ঝর্নার মুখে কোন কথা নেই। শুধু চোখ দুটো ছলছল করছিল জলে। দূরে পড়ে থাকা শাড়িটা তার

দিকে এগিয়ে দিয়ে জানকীবুড়ি বলল, ওটা পরে নাও, বউমা! তোমার শ্বশুর টিপায় আজ এ পাপ ঘটে গেলে আমি যে মরেও শান্তি পেতাম না। যাক মা, বহু জন্মের পুণ্যিফল যে অল্পের জন্য বেঁচে গেলে। আমি যদি সময় মত না আসতাম, তাহলে তোমার যে কী হোত তা ভগবানই জানে।

বস্তিবুড়া মুখ ঘুরিয়ে ছিল এতক্ষণ। ঝর্না শাড়ি শরীরে জড়িয়ে নিতেই সে ভিড় হটিয়ে দিয়ে বলল, যা তোরা সব। ইখানে কি ঠাকুর উঠেছে যে হাঁ করে দেখছিস? ভিড় পাতলা হবার পর বস্তিবুড়া ধীর গলায় বলল, বউমা, তুমারে এট্টা কথা বলি। তুমি পড়া লিখা জানা মেয়ে! তুমার জ্ঞান-বুদ্ধি আমাদের চেয়ে ঢের বেশি। বস্তিবুড়া খুকখুক করে কাশল, তারপর পাশে পড়ে থাকা ছোট পলিথিনের ক্যানটা হাতে তুলে নিয়ে গন্ধ শুকে বলল, এটা নিয়ে আমি তুমাকে এদিক পানে আসতে দেখেচি। তা মা, যারে তুমি জ্বালাতে এসেছিলে, সেই অভাগীর বিটি যে আজ তোমাকে বাঁচাল! নাহলে বস্তির কুত্তাগুলো আজ তুমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত। শেযে ওরাই তুমাকে পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যেত। যার দয়ায় আজ তুমার জান বাঁচল, তার কাছে মাথা হেঁট করে ক্ষমা চাও। এ সন্সারে পরের জন্যি কবর খুঁড়লে, সেই কবরে নিজেকে চাপা পড়তে হয়। মা জননী, লেশ্চয়ই মুখ্যু মানুষের কথাটা বুঝতে পারলে?

ঝর্নার কথা বলার কোন ক্ষমতাই ছিল না। তার ক্ষমতার গর্ব লুটিয়ে পড়েছে ভাঙা ঘরের ছায়ায়। ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে কোন মতে লুটিয়ে পড়ল জানকী বুড়ির পায়ের উপর ; অস্ফুটে বলল, মা, মাগো, আমাকে তুমি মেরে ফেল। আমি পাপী, আমি আর বাঁচতে চাই না।

জানকীবুড়ি ঝর্নার মাথায় স্নেহের হাত রেখে বলল, ছিঃ বউমা, শ্বশুরটিপায় এসে অমন ধারা কেঁদো না। যা হবার তা তো হয়েছে। চোখ মুছো। আলো আঁধারের মাঝখানে ঝর্নার চোখের জলে ধুয়ে যেতে থাকে গংগা মাটির মতো নরম জানকীবুড়ির ফোস্কা পড়া পা-দু'খানা।

# ভূমি সত্য

গাছের পাতা পড়লে শব্দ হয়, ধড়াস করে ওঠে বুক, এমন নিঃস্তব্ধ দুপুর। মহুয়া গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আর ভার শরীরটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে না গদাধর মুর্মু। চোখের তারায় কিলবিল করে রোদের আঁচ, হাওয়ায় নাচতে নাচতে ওরা লক্ষ লক্ষ সাপ হয়ে নদী পেরিয়ে চলে যায় মোরাম ফেলা পথ ধরে বহু দূরে। গদাধর মুর্মুর চোখের দৃষ্টি বুজে আসে ক্লান্তিতে, তার পা আর চলতে চায় না, ভার পাথরের চেয়ে ভারী হয়ে গেছে দুটো পা। পুরো শরীর যেন পাথর জমা কঠিন পাহাড়। গলগলিয়ে ঘামের ধারা নামে কানের দু-পাশ বেয়ে, মাথার চুলও ভিজে সপসপে। ঘামে ভিজে ন্যাতার মত জড়িয়ে গেছে চুল। তাকে দেখলে মনে হবে সে বুঝি তাতান মাথা এইমাত্র চুবিয়ে এল নদী থেকে। গাঁ ছেড়ে আসার পথে সাংগির সাথে তার দেখা হয়েছিল। লম্বা, টলটলে শরীরের সাংগি নেশা করেছিল গলাতক, তাকে দেখে ঝাঁঝাল ঢেকুর তুলে বলেছিল, কুথায় যাচ্চিস রে বেটা? এত চড়া খরায় কেউ কি বাইরে বেরয়? তোর মাথাটাথা সব ঠিক আচে তো? সাংগির মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা উত্তর দিতে পারেনি গদাধর মুর্মু, শুকনের ঢোক গিলে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল টাগরা ভেজাবার, না পেরে চ্যাড় চ্যাড় করছিল কণ্ঠনালীর কাছটা, ভ্যাসভেসে গলায় সে দুঃখ মিশিয়ে বলেছিল, চাচা গো, আমার কপাল পুড়েচে। ঘরে গিয়ে দেখলাম বউ-বিটি কেউ নাই। গাঁ-ওলারা বলল ওরা নাকি পুবের দিকে ভেগেচে। আমি এখন ওদের কুথায় খুঁজব। এত বড় দেশ-দুনিয়ায় ওদের আমি কোথায় ঢুনব বলো তো?

সাংগির বয়স্ক কপালে ভাঁজ পড়েছিল সরু রেখার, তাতে চুলবুল করছিল ঘাম, ওর পুরো মুখটা কুসুম তেল মাখানো ভাদ্র মাসের তাল। সব শুনে গম্ভীর হয়ে সে বলেছিল, যমুনার তো স্বভাব খারাপ নয়, সে তোরে ছেড়ে কুতায় পালাবে? তোর প্রথম পক্ষের বিটিটার কী যেন নাম? সে তো বেশ ডাগর হয়েচে দেখেছি। বিটিরে নিয়ে যমুনা আর কুথায় পালাবে, খুঁজে দেখ ধারে কাছে কুথাও ওরা নুকিয়ে আচে। ওদের হয়ত কোন দুঃখু আচে। তুই নিশ্চয়ই ওদের মনে দুখ দিয়েছিস। না হলে সুখের ভাত ছেড়ে ওরা কেনে ঘর ছাড়বে? ওদের তো পাগল কুত্তায় কাটেনি?

সাংগির চাঁচা ছোলা কথায় মুচড়ে পড়েছিল গদাধর মুর্মু। হাতের তেলো, নাকের ডগা এমন কী মুখের চারপাশ ঘেমে উঠছিল তার। যমুনা তার দ্বিতীয় পক্ষ। প্রথম পক্ষ বেহুলা গত হবার পর যমুনাই তার কাছে স্রোতে ভাসা পাতার মত এসে আটকে গেল। কেঁদে-কেটে সে বলল, দেশ-দুনিয়ায় আমার কেউ নাই,

তুমি আমাকে খেদিয়ে দিও না, আমি তুমার কাছে কিছু চাই না, শুধু তুমি আমাকে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই দাও। আমি বেইমান নই গো যে পাত ফুটো করে পালাব। যমুনার শরীর-স্বাস্থ্য দেখে মনে ধরেছিল গদাধর মুর্মুর। শোকের ঘা শুকোতে তার এমন মলমের দরকার ছিল। কেউ যদি ঘরে এসে খাঁচায় ঢুকতে চায় তাহলে তাকে খাঁচায় পুরতে মানা কোথায়? যমুনার তেঁতুল ঘষা পেতলের মত ঘষামাজা শরীর, শীতের দিনে সেই গতর থেকে সর্ষে ফুলের চিকনাই ঠিকরে বেরোচ্ছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে গদাধর মুর্মুর আটকে গিয়েছিল কথা। যমুনার সঙ্গে বেহুলার কোন তুলনায় চলে না , বেহুলা যদি কলার ভেলা হয়, যমুনা হল গভীর জলের উপর ভাসমান মোটর বসান জাহাজ। যমুনার চোখের যাদুটোনায় সে কেন, কঠিন পাহাড়ও টলে যেতে বাধ্য। কথায় কথায় সম্পর্কের জট খুলে বেরিয়ে পড়ল, যমুনা তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। সে আগে থেকে চিনত বেহুলাকে। বেহুলা তার গাঁ-সম্পর্কে দিদি হয়। গদাধর মুর্মু সেই ভর দুপুরে যমুনাকে ফিরিয়ে দিতে পারল না, ফাঁসে লটকান ডুরপাখিকে সে ঘরে নিয়ে এসে জায়গা দিল। পাড়া-পড়শীরা সাবধান করে বলল, কাজটা ভাল করলি না, গদাধর! তোর তো ঝাড়া হাত পা নয়, তোর দু-দুটো ছেলে মেয়ে আছে। যারে তুই ঘরে রাখলি সে যদি ওদের না দেখে?

এই প্রশ্নটা গদাধর মুর্মুর মনে সেই প্রথম দিন থেকে বয়িরকুলের কাঁটার মত বিঁধে ছিল, কিন্তু সে তখন টোপ গিলে ফেলেছে, আর উগরাতে পারে না। উগরালে পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরনোর কষ্ট হবে। তার দোনোমনো ভাব দেখে যমুনা অভয় দিয়ে বলেছিল, তুমার কুনো ভয় নাই গো, আমি হাঁড়ি ভাঙতে আসিনি, আমি এসেছি হাঁড়ি ভরাতে। তুমার ছেলেমেয়ে সে তো আমার ছেলেমেয়ে। ভগবান আমাকে সুখ দেয়নি। তুমার সঙ্গে থেকে আমি সুখী হবো।

লাখ কথার এক কথা, এরপরে আর কোন কথা চলে না। যমুনার ঘাম জবজবে লাবণ্য ভেজা মুখের দিকে তাকিয়ে গদাধর মুর্মু বলেছিল, থাকো, যত দিন মন চায় থাকো। তুমি না চলে গেলে আমি তুমারে খেদিয়ে দিব না। আমার ঘরে তুমার ভাত কাপড়ের অভাব হবে নাই। আমার বিঘা তিনেক ধানী জমিন আছে। দুটো গোরু পাঁচটা ছাগল আছে। ঝাঁকা ভরতি মুরগি আছে। তুমি হাঁড়িয়া বানিয়ে ভর পেট খেও। আমি তুমার হাঁড়িয়া বাটি কুনো দিন কেড়ে নিব না। এছাড়া আমি হলাম গিয়ে গরমিন্টের চাকর। মাস গেলে মাহিনা পাই। মনে করতে পাবো, আমার কুনো অভাব নেই!

যমুনা গাঁ ছেড়ে এসেছিল গদাধর মুর্মুর সব কিছুর খবর নিয়ে। ভিন গাঁয়ে তার আগে একবার সাদি হয়েছিল। ঘরের মানুষটা তার অবুঝ মাতাল। যমুনার গর্ভ ভারী হল না বলেই তিন বছরের মাথায় তাকে ছেড়ে দিল। মুখ ভরা গাল দিয়ে বলেছিল, খবরদার আর আমার ঢিপেয় আসবিনে। যে কলগাছে থোড় হয়

না, সে গাছ সাজিয়ে রেখে কী হবে? গাছ হলে কেটে ফেলতাম, তুই মানুষ বলে পারলাম না। গায়ে পাপ লাগিয়ে আমি কেন মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁটব? বিটা ছেলে আমি, হাত উঠিয়ে ডাকলেই কত মেয়েমানুষ দানা খেতে ছুটে আসবে। অপন কি মেয়েছেলের অভাব?

যমুনার বর বিয়ে করেছে দু বছর হল। ভাঙা মন নিয়ে বাপের ঘর আগলে এতদিন সে গায়ে-পড়া উকুনের মত পড়েছিল শত অপমান সয়ে। সুযোগ আসতেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গদাধর মুর্মুও বোকা মাছের মত টোপ গিলে নিল তার।

দিন গিয়েছে, ঘুরে এসেছে বছর। গদাধর মুমুর জীবন বয়ে গিয়েছে সুখী পাহাড়ী নদীর মত। সরকারি কাজে তাকে প্রতিদিন চলে যেতে হোত মোরাম ফেলা পথ ধরে শহরে। যমুনা তার জন্য পথ দেখত রোদ ঢললে। গদাধর মুর্মু কোনদিন ফিরত, কোনদিন আবার ফিরত না। যেদিন কাজ বেশি থাকত শহরে, সেদিন সে চোলাই মদ টেনে শুয়ে থাকত অফিসের বারান্দায়। নেশা করলে তার নড়াচড়ার কোন ক্ষমতা থাকত না। পুরো শরীর মিশে যেতে চাইত মাটির সাথে। ঘরে না ফিরলে রাগারাগি করত যমুনা, ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমানী গলায় বলত, দিদি মরেচে এই ঘরে রাতে আমি তার সপন দেখি। দিদির সংসার আমাকে কেনে ছেড়ে দিবে? তুমি ঘর না এলে আমার চোখে নিদ্ আসে না। দিদির ভয়ে আমার দু-চোখের পাতা এক হয় না গো। আমার খালি মনে হয়, দিদি আমাকে গলা ঘুঁটে মেরে ফেলবে। কত রাতে সে আমার বুকে চড়ে বসেচে। আমার দম এটকে গিয়েচে। আমি আর শ্বাস নিতে পারচি না ভয়ে। এভাবে চললে দেখবা, আমিও একদিন মরে কাঠ হয়ে পড়ে আচি।

—এ তুমার মনের ভুল। গদাধর মুর্মু বোঝাতে চাইত মরা মানুষ কুনোদিন জ্যান্ত হয় না। বেহুলাকে আমি পুঁতে দিয়েচি মাটির তলায়। এত দিনে সে পচে গলে সার হয়ে গিয়েচে।

—তুমি বললে আমি মানব না। যমুনার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে, তুমার এ ঘরে ভূত প্রেত আছে গো। এ টিপায় আমি আর থাকব না। তুমি আমাকে টেউনে নিয়ে চল। আমি সেখানে শুকিয়ে থাকব সেও ভাল, তবু এখানে আর এক দণ্ড থাকব না।

যমুনা তার জেদ আঁকড়ে পড়ে থাকল মাসের পর মাস। বছর ঘুরে গেল তবু ফিকে হল না তার জেদের রঙ। তার ধ্যান-ধারণায় বেহুলা সচল নারী হয়ে পুরো গাঁ ঘুরে বেড়ায়। একদিন আঁধার ঘরে হাঁড়িয়ার হাঁড়িতে বাখর বড়ি মিশাতে গিয়ে যমুনা যেন স্পষ্ট শুনল বেহুলার ক্রোধী গলা, তুই কেনে এসেচিস আমার জেগেয়? যা চলে যা, নাহলে তোর সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি যা পাইনি, তুই তা পেলে মাথায় খুন চড়ে যাবে। তুই বাঁচতে পারবিনে যমুনা, তুই পালা।

সারাদিন খেটেখুটে এসে একই বকর বকর শুনতে ভাল লাগত না গদাধর

মুর্মুর। সংসারে শান্তি না থাকলে হাজার টাকা কামিয়েও কোন লাভ নেই। যমুনার মুখ থেকে কে যেন শুষে নিয়েছে হাসি, সে আর হাঁড়িয়া বানায় না, রাঁধাবাড়া করে না। মুখ শুকিয়ে দুয়ার গোড়ায় বসে থাকে সর্বদা। তার রুগ্ণ চোখের সজল দৃষ্টিপাতে গদাধর মুর্মুর মন গলে যায় হাঁড়িয়া রসে ডুবান বাখর বড়ির মতো। ঘর-শান্তির জন্য পুজাপাঠ করে সে। বলি দেয় লাল মুরগা। যজ্ঞ করায় নিজের উঠোনে। গুণিন মন্ত্র ফুঁকে বলে, এ টিপায় আর বসবাস চলবে না। তোর প্রথম পক্ষের কু'নজর এখানে ঠিকরে বেড়ায়। যে কুনোদিন বিপদ ঘটে যেতে পারে তোদের। সাবধান, বহুৎ সাবধান। নাহলে দুটা মাথা সে নেবেই নেবে।

গদাধর মুর্মুর মুখ চুন সাদা, দু'টা মাথা কার কার?

—একটা তোর দ্বিতীয় পক্ষের, অন্যটা তোর মেয়ের। গুণিনের ঠোঁট শক্ত হয়ে ওঠে।

—ওদের দুষ কুথায়? গুণিনের মুখের উপর ঝুঁকে পড়তে চায় গদাধর মুর্মু, ভয়ে ভয়ে সে শুধায়, তাহলে উপায় বাতলে দাও। অশান্তি মনে পুযে তো বসবাস করা যায় না। এটা আমার ভিটেবাড়ি, এ সব ছেড়ে আমি যাব কুথায়?

—হ, হ, ঠিক কথা। প্রভাবশালী গুণিন তার কাঁচা পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে ডানে-বাঁয়ে মাথা ঝোকায়, টানা গলায় বলে, টিপাবাড়ি বেচে দে, ইখানে তুর সুখ লিখা নেই। এখানে থাকলে তোর সর্বনাশ হয়ে যাবে।

গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র চাকুরিয়া হলো গদাধর মুর্মু। সে সুখে আছে অনেকের চেয়ে। যমুনা তার শ্রীহীন সংসারের ফুল ফুটিয়েছে সুখের। এমন সুখের দৃশ্য দেখে অনেকেরই চোখ টাটায়। কেউ সুখে থাকুক, অনেকেই চায় না। বিপদগ্রস্ত গদাধর মুর্মু নিজের ভিটেবাড়ি বেচে দিতে নারাজ। গাঁ ছেড়ে সে অন্য কোথাও সুখ পাবে না। এখানে তার পূর্বপুরুষ কবরের নীচে শুয়ে আছে বছরের পর বছর। এখানেই বেহুলা শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ল। মরার সময় তার চোখে কোনরকম নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়নি। রোগ তাকে মাটির নিচের সুখের বিছানায় নিয়ে গেল। গাঁয়ের মুখিয়া মারকন্ড। সব শুনে সে বলল, গুণিনের কথা ফেলা যায় না। গুণিন যখন বলেচে, তখন তোকে কিছু একটা করতেই হবে। আগে জান, পরে ভিটেমাটি। এক কাজ কর, ভিটেমাটি তুই বেচে দে।

কু'কথা হাওয়ার বেগে ছোটে। এক মুখ থেকে আরেক মুখে কথা দাবানলের ক্ষিপ্রতায় ছড়িয়ে পড়ে। সব কথা কানে আসে যমুনার। টিকিয়ারও বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে। তারও ডাগর চোখে বিছিয়ে যায় ভয়। সে গদাধর মুর্মুর মুখের দিকে তাকিয়ে খুবই অসহায় স্বরে বলে, বাপ গো, আমি আর এ টিপেয় থাকব না। এখানে থাকলে আমার গা ছমছম করে। মা যেন রোজ রাতে আমার নাম ধরে ডাকে। আমি একদিন ফুটফুটিয়া জ্যোৎস্নায় তাকে স্পষ্ট দেখেচি। তার দুচোখ থেকে আগুন ঠিকরাচ্ছে।

পুরো গাঁয়ে কারা যেন ছড়িয়ে দিয়েছে গুজবের আগুন, গদাধর মুর্মুর কানের পর্দায় ঘা মারে নানান মানুষের মনগড়া কথাগুলো। চিন্তার তার শেষ নেই। বাপ-ঠাকুরদার জমিজমা, ভিটেবাড়ি বেচে সে টাউনে গিয়ে ঠাঁই পাবে কী ভাবে? যমুনা তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে রাগে-ক্ষোভে। তার মনে সব সময় শুধু একই চিন্তা। টিকিয়ার সঙ্গে সে সব সময় চাপা গলায় কথা বলে। টিকিয়া এখন তার মেয়ে নয়, যেন বন্ধু। ঘরে ফিরে এলে গদাধর মুর্মু শান্তি পায় না এক মুহূর্ত। এক সন্ধ্যায় গুণিন আবার ফিরে আসে। তার গায়ে লাল কাপড় জড়ানো। কপালে সিঁদুরের লম্বা তিলক। গলায় ছোট বড় হাড়ের মালা নাভি পর্যন্ত নামানো। সে এসে গদাধরকে ডেকে নিয়ে যায় আড়ালে। ফিসফিসিয়ে বলে, এই অমাবস্যায় তোর বিপদ আসচে, সাবধান।

যমুনা কী করে যেন শুনে ফেলে গুণিনের কথাটা, সে কেঁদে-কেটে বলে, ওগো চলো, আমরা ইখান থিকে পেলিয়ে যাই। মেয়ে তুমার ডাগর হয়েচে, তারে ডাইনে কাটলে, কে বাঁচাবে।

বিমর্ষ গলায় গদাধর মুর্মু শুধোয়, আমার জমি-জমা, ভিটেবাড়ি তার কী হবে? আমি কেনে ডরপুক শেয়ালের মত পালাবো। তাছাড়া এই জমিজমা সব কে কিনবে?

—মুখিয়া তো কিনতে চেয়েচে। তাকে সব বেচে দাও। যমুনা জোর গলায় বলে, জান বাঁচলে অমন জমি ঢের হবে। তুমি এসব নিয়ে আর ভেবো না।

—মুখিয়া যে দাম দিয়েছে সেই দামে জলও বিকোয় না। গদাধর মুর্মুর গলায় জেদ ফুটে ওঠে, আমি পারব না, তাতে যা হয় হোক। আমি এর শেষ দেখবো।

—তাহলে তুমি থাকো তোমার ভিটেবাড়ি আঁকড়ে, আমরা চলে যাব। যমুনা তার নিজের গোঁ থেকে একচুল নড়বে না। গদাধর মুর্মু তাকে হাজার বোঝাবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে বসে থাকে ঘরের দাওয়ায়। দিনের বেলাতেও যমুনা ঘরে ঢুকতে ভয় পায়। টিকিয়াকে সাথে নিয়ে সে ঘরে ঢোকে। হাতে থাকে বাতি উস্‌কানো লম্ফো। টিকিয়ার পা কাঁপে, চোখের তারায় মিশে যায় ভয়। নিজের বাপকে সে ঘেন্না করতে শেখে। ভিটেবাড়ির মায়া যে কি জিনিস এটা তার বোঝার ক্ষমতা হয় না। সে দিনরাত দুষতে থাকে তার বাপকে। গদাধর মুর্মুর ছোট ছেলে বসন্ত চলে গিয়েছে তার মামুঘর। সেখানকার ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে সে। মাসে মাসে গদাধর গিয়ে তাকে টাকা দিয়ে আসে। ছেলেকে উৎসাহ দিয়ে বলে, মন দিয়ে পড়া-লিখা শিখবি। আমি মূর্খ মানুষ বলে লোকের কথার মার-প্যাচ বুঝিনে। সবাই আমাকে ঠকিয়ে নেবার চেষ্টায় ঘোরে। পড়া-লিখা শিখলে কি দু-চক্ষে অত আন্‌ধার দেখতাম?

গদাধর মুর্মু গিয়েছিল তার পুরনো শ্বশুরঘর। সম্পর্কটা পচা সুতোর নয় তাই বেহুলা চলে যাবার পরও ছিঁড়ে যায়নি। বুড়া শ্বশুর-শাশুড়ি এখনও বেঁচে আছে। জামাইকে কাছে পেয়ে তারা আব্দার ভরা গলায় বলল, আর তো আস না বাপ, এসেছ যখন আজ রাতটা থেকে যাও। নাতিটা আমাদের কাছে থাকুক।

ও এখানে থিকে পড়া-লিখা শিখুক। তুমি মাঝেমধ্যে এসে খোঁজ-খবর নিয়ে যেও। তুমি এলে মেয়ের দুখ আমরা ভুলে যাব।

রাতটা শ্বশুরঘরে কাটিয়ে দুপুরে ঘরে ফিরে ছিল গদাধর মুর্মু। গাঁয়ের তেঁতুলতলায় এসে তার মন কু'গেয়ে উঠল। বারবার নেচে উঠল চোখ জোড়া। ঘরে গিয়ে সে দেখল, ফাঁকা ঘর। দবজা হাট খোলা। একটা নেড়ি কুকুর হাঁড়িয়া-হাঁড়িতে মুখ ঢুকিয়ে চাটছে। ছাগলগুলোর দড়ি খোলা। মুরগিগুলো ভয়ে উড়ে গিয়ে বসেছে লাউয়ের মাচায়। ঢ্যামনা সাপ দেখা কাকের মত তারা গলা ফাড়িয়ে ডাকছে। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠতেই গদাধর মুর্মু মেয়ের নাম ধরে ডেকে উঠেছিল জোরে। একবার নয়, পরপর বেশ কয়েকবার। টিকিয়া সাড়া দেয়নি তার ডাকে। যমুনাকেও দেখতে পায়নি সে। মা-বিটিতে ওবা অসময়ে গেল কোথায়? কুয়োয় হয়ত জল আনতে গিয়েছে। কুয়োতলা অব্দি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছিল গদাধর মুর্মু। গাঁয়ের খনখনে বুড়িটা তাকে বলল, তুমার বউকে দেখলাম নদী পেরিয়ে মেয়ের হাত ধরে টেউনের দিকে চলে যেতে। আমি শুধালাম, কুথায় যাচ্ছিস বউ? সে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, ইটভাটায়। তার সাথে তুমার মেয়ে টিকিয়াকেও দেখলাম।

সব শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল গদাধর মুর্মু। সাজানো সংসার এভাবে যে ভেঙে যায় সে জানত না। বেহুলা মরে গিয়েও তাকে সুখ দিল না। কী কুক্ষণে তাকে যে ঘরে তুলেছিল! ফাঁকা ঘরে হু হু বাতাস খেলে বেড়ায়। মেয়ে-বউয়ের খোঁজে সে যখন কুয়োতলা ছাড়িয়ে মাঠের দিকে হাঁটছে তখনই পেছন থেকে তাকে ডাক দেয় গ্রামের মুখিয়া। একটা কেঁদুপাতার বিড়ি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, কুথায় যাচ্চিস রে গদাধর?

গদাধর মুর্মুর ঠোঁট থেকে একটা কথাও বেরল না। বউ-বিটি পালিয়ে গিয়েছে একথা কি বুকের ছাতি ঠুকে বলা যায়? মুখিয়া আন্দাজ করে বলল, তুর বেপদের কতা আমি সব জানি। বেপদের দিনে ঘাবড়াস নে। মন ঠান্ডা রেখে কাজ কর। গুণিন যা বলেচে তা তো মিছে হবার নয়। তোর ঐ ডাইন চরা ভিটেবাড়ি কেউ নিবে না। আমি যা দাম দিয়েচি সেই দামে দিয়ে দে। ঠগবিনে। দাঁতে দাঁত ঘষে তাতা পাথরের মত কঠিন শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গদাধর মুর্মু। মুখিয়া গায়ে পড়ে বলে, তোর বউ-বিটি পালাল, তারা আর ফিরবে না। ওরা ইটভাটার কাজে চলে গেল। তোর ভাঙা সন্‌সার আর জোড়া লাগবে না। ওরা বলেচে মরে গেলেও এ গাঁয়ে আর ফিরবে না। তোর ভিটে বাড়িতে ডাইন চরে, ভূত-প্রেত নাচাকুঁদা করে।

গদাধর মুর্মুর ঠোঁট শুকিয়ে যায়, কোনমতে ঢোক গিলে সে বলে, ওদের তুমি আটকাতে পারলে না মুরুব্বি? তুমি কেমন মানুষ গো?

মুখিয়া পানসে হেসে বলল, আমি তাদের আটকাবার কে? তারা তো ঝড়। ঝড়ের মত চলে গেল।

সাংগির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কত কথা মনে পড়ে গেল গদাধর মুর্মুর। গামছায়

ঘাড়-গর্দানের ঘাম মুছে সে বলল, ওরা যে কুথায় গেল, আমি কিছু বুঝতে পারচিনে। দিনকাল খারাপ, বিপদ-আপদ ঘটে গেলে তখন আর থৈ পাবে না।

সাংগি ভবঘুরে মানুষ। সে দিন আনে দিন খায়। কারোর সাতে পাঁচে থাকে না। সব শুনে সে বলল, যাচ্চিস যা, তবে গিয়ে কুনো ফায়দা হবে না। তোর বউ-বিটি বদি ইটভাটায় যায় তাহলে ওদের তুই খুঁজে পাবি। যদি অন্য কোথাও গিয়ে থাকে তাহলে ওদের তুই টিকি খুঁজে পাবি না। ইটভাটার কাজেও অনেক ঝামেলা। অনেক সময় ইটভাটা মেয়েমানুষকে পুড়িয়ে ছাড়ে।

সাংগির কথায় চমকে উঠল গদাধর মুর্মু। টিকিয়ার উপর তার টান মাটির সাথে গাছের টানের চেয়েও প্রবল। যমুনা এই গরমের দিনে তার কাছে ছিল শীতল জল। ওদের ছেড়ে একা একা সে কী ভাবে বাঁচবে? মাটি ছাড়া তো গাছ বাঁচে না, হাওয়া ছাড়া কি ঢেউ ওঠে জলে? একটা বিড়ি ধরিয়ে গদাধর মুর্মু আর সময় ব্যয় করল না। মনে মনে সে ভাবল, নদী পেরিয়ে প্রথমে সে যাবে অফিসে। দিন দশেকের ছুটি নিয়ে সে বউ-বিটিকে খুঁজবে। ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনবে সে। তারপর জলের দামে ভিটেবাড়ি বিক্রি করে দেবে মুখিয়ার কাছে। গাঁয়ের পাট চুকিয়ে সে চলে যাবে অন্যত্র।

দশ দিন সময় পৃথিবীর দশ দিক ঘুরে আসার জন্য যথেষ্ট নয়। হেঁটে হেঁটে হাঁপিয়ে উঠেছিল গদাধর মুর্মু। পথের ধুলো তার পা ছাপিয়ে হাঁটু ছুঁয়েছে। ইটভাটায় ঘুরে বেড়াল সে তবু টিকিয়া আর যমুনার দেখা পেল না। মনের দুঃখে মাথা ঝুঁকিয়ে ঘরে ফেরার পথ ধরল সে। নদী পেরিয়ে পাড়ে উঠতেই তার সাথে আবার দেখা হল সাংগির। ওর মাথায় কাঠের বোঝা, হাতে কুড়ুল। পথ ক্লান্ত গদাধর মুর্মুকে সাংগি দাঁড়াতে বলল মহুয়া গাছের ছায়ায়। তারপর একটা বিড়ি এগিয়ে দিয়ে সে চাপা গলায় বলল, কী রে, বউ-বিটিকে খুঁজে পেলি?

গদাধর মুর্মু অবশ গলায় বলল, না। কত খুঁজলাম তবু ওদের দেখা আমি পেলাম না। কে জানে, ওরা কুথায় গিয়েচে? গলা ধরে এল তার। সাংগির মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, যেখানেই থাকুক, ভাল থাকুক ওরা। আমি আর ওদের কুথায় খুঁজব এত বড় দুনিয়ায়? আমি আর পারচি নে। সাংগি মাথার বোঝা নামিয়ে গদাধরের মুখোমুখি বসল. সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। পৃথিবী গোল, একদিন ঠিক দেখা হবেই হবে।

—আমি সে আশা ছেড়ে দিয়েচি। এবার ভাবচি ভিটেবাড়ির আশা ছেড়ে দিয়ে টেউনে পেলিয়ে যাব। ঐ ডাইনচরা টিপের আমি একা থাকব কী করে?

—বাপ ঠাকুরদার ভিটেবাড়ি ছেড়ে দিবি? একথা বলতে তোর লাজ লাগল না? সাংগির গলার রগ ফুলে উঠল নিমেষে। গদাধর মুর্মুর হাত ধরে ঝটকা টান মেরে সে বলল. চল, আমার সাথে। আমি তোকে গুণিনের কাচে নিয়ে যাব। আজ একটা ফয়সালা হওয়া দরকার।

—না-না, আমি আর সেথায় যাব না। ডানে-বাঁয়ে মাথা হেলিয়ে চিৎকার

করে উঠল গদাধর মুর্মু, ছেড়ে দাও, আমি যাব না। ওর কাছে গেলে ভয়ে কলিজা শুকিয়ে যায় আমার। আমার বুদ্ধি তখন কাজ করে না।

—কলিজায় দম পুরে রাখ।

—দম পাইনে গো! বিপন্ন চোখে তাকাল গদাধর মুর্মু।

—তুই না মরদ মানুষ?

—হু-হু—আমি মরদ। খনখনে গলায় চেঁচিয়ে ওঠে গদাধর মুর্মু।

—তোর কি শিরদাঁড়া নেই? বাঘের গলায় হুঁকরে উঠল সাংগি।

—আচে গো, আচে। শিরদাঁড়ায় হাত দিয়ে গদাধর মুর্মু নিজেকে খুঁজে পেতে চাইল। সাংগি চড়া গলায় বলল, আমি বুড়া হলাম, তবু ডাইন-প্রেত কুনোদিন মানি নাই। তুই তো সেদিনের ছেলে, তুর অতো ডর কিসের?

ভেঙে পড়া গদাধরকে টানতে টানতে নিয়ে যায় সাংগি। রাগে ওর চোখ দুটো চিতা বাঘের মত জ্বলছিল। বনবাদাড়, পাথর-ঢেলা পেরিয়ে ওরা একটা হাঁড়িয়া ঠেকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। উঁকি-ঝুঁকি মেরে সাংগি বলল, গুনিন ব্যাটা মুখিয়ার সাথে হাঁড়িয়া খেতে এসেছে। তুই চুপচাপ বেড়ার পাশে দাঁড়া। দেখি ওরা কি করে? আজ ওদের পেলিয়ে যেতে দিব না।

চার বাটি হাঁড়িয়া খেয়ে বুড়া গুনিন আর মারকন্ড মুখিয়া আগু-পিছু বেরিয়ে এল পথে। সাংগি কাঠের বোঝাটা ওদের পায়ের কাছে ফেলে দিল ইচ্ছে করে। গুনিনের হাত শক্তভাবে চেপে ধরে বলল, তুমার তুকতাক, তন্ত্রমন্ত্র, পূজা-পাঠের কথা আমি ঢের শুনেচি। অনেক মুরগা তুমার ঐ বুড়া পেটে ঢুকেচে। আমার কাঠের বোঝাটা তোমার ঐ তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে উঠিয়ে দাও দেখি বীরবাহাদুর? সাহায্যের জন্য গুনিন ফ্যাকাসে চোখে মুখিয়ার মুখের দিকে তাকাল। মুখিয়া গলা ঝেড়ে নিয়ে ফুঁসে ওঠা গলায় বলল, আবার তুমি মদ খেয়েচো? পথ ছাড়ো। আমাদের যেতে দাও। নাহলে এর ফল কিন্তু ভাল হবে না। সাংগি বলল, আগে আমার কাঠের বোঝাটা ওঠাও, তারপর। বুক চিতিয়ে সে পথ আগলে দাঁড়াল. যদি কাঠের বোঝা না ওঠাতে পার তাহলে বুঝব তুমাদের শিরদাঁড়া নেই. তুমরা লোক ঠকানোর খুঁটা। তুমাদের তন্ত্রমন্ত্র সব ঝুটা। মুখিয়া ঠেলা মেরে সরিয়ে দিতে চাইল সাংগিকে। হাতের টাঙ্গি ঝগিয়ে সাংগি বলল, তুমাদের দুটারে আজ যেতে দিব নাই। ক্ষেমতা থাকলে ঠেলে ফেলে চলে যাও। তবে যাওয়ার আগে বলে যেতে হবে, গদাধরের বউ-বিটি কুথায়? ওদের তুমরা কুথায় লুকিয়ে রেখেছো বলতে হবে এক্ষুনি। না হলে তুমাদের দুজনকে আমি মেরে নদীর ভেজা বালিতে পুঁতে দিব। আমার নাম সাংগি। আমি কারো লাল চক্ষুকে ডরাই না।

বেগতিক দেখে গুনিন খড়ি কাটতে বসল মাটিতে। কী সব মন্ত্র আউড়ে সে করুণার চোখে গদাধর মুর্মুর দিকে তাকাল। গদাধর মুর্মু কাতর হয়ে বলল, বলে দাও গো, আমার বউ-বিটি কুথায়? তুমি ওদের হদিশ দিতে পারলে আমি তুমাকে দুটা লাল মুরগা খুশ হয়ে খেতে দিব। বলো, ওরা কুথায়?

শূন্যে ধুলো উড়িয়ে দিক নির্দেশ করে দিল গুণিন, তারপর টানা টানা গলায় বলল, ওরা পুব দিকে গিয়েছে। আর ফিরবে না। তুই ওদের আশা ছেড়ে দে।

সাংগি বাঘের ক্ষিপ্রতায় চোখের নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়ল গুণিনের উপর, ঠেলা মেরে তাকে ধরাশায়ী করে পা ধরে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে টেনে নিয়ে গেল অনেক দূর। চিৎকার করে বলল, বল, গদাধরের বউ-বিটি কুথায়? যদি না বলিস তোরে আমি টাঙ্গি দিয়ে ফেড়ে ফেলব। তোর মুখিয়া বাপও তোকে বাঁচাতে পারবে না! পাপের আমি শেষ দেখে যাবো আজ।

প্রাণের ভয়ে কঁকিয়ে কেঁদে উঠল গুণিন। হাতজোড় করে বলল, আর মেরো না গো, আমি সব বলচি। গদাধরের বউ-বিটিকে মুখিয়া আমার ঘরে নজরবন্দী করে রেখেচে। ওদের কুনো দোষ নেই গো, ওরা তো ঘরে ফিরতে চায়। দিন রাত কেঁদে কেটে ওদের আর শরীলে কিছু নাই। গুণিনের কথা শেষ হল না, তার আগেই প্রাণের দায়ে দৌড় লাগাল মুখিয়া। পাথর ছড়ানো পথে কিছু দূর ছুটে গিয়েই মুখ থুবড়ে হুমড়ে পড়ল সে। গদাধর জীবনে যা করেনি, তাই করল সে। ছুটে গিয়ে মুখিয়ার বুকের উপর চড়ে বসল আক্রোশে। চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে শুধোল, বল, আর আমার ভিটে বাড়ির দিকে নজর দিবি? তোর চক্ষু দুটা আমি উপড়ে নিব। কই ডিমা কাড়, কাড় ডিমা। চোখ বন্ধ করে মুখিয়া মাটিতে মিশে যেতে চাইল ভয়ে। গদাধর মুর্মু তার দু'চোখে আঙুল ঢুকিয়ে গেলে দিতে গেলে সাংগি তাকে ফিরিয়ে আনে বাস্তবে, এ পাপ কাজ করিস নে। ওকে ছেড়ে দে, ব্যাটা। ওকে অন্ধ করে দিলে এই পাথর দেশে ও ঠোক্কর খাবে পদে-পদে। তার চেয়ে ওকে চোখ দুটা নিয়ে বাঁচতে দে। যে চোখ দিয়ে ও তোর সর্বনাশ দেখতে চেয়েছিল, সেই চোখ জোড়া দিয়ে ও তোর সুখ দেখুক। তার চেয়ে চল, গুণিনের পা দুটা আমরা দুমড়ে-মুচড়ে ভেন্‌গে দিই। ওর পা দুটো বড় খতরনাক। ঐ পা দিয়ে ব্যাটা গাঁ-বস্তি চযে বেড়ায়। মানুষের সর্বনাশ করে। পা না থাকলে ও আর যাবে কুথায়?

গদাধর মুর্মু ভেবেছিল, সাংগি হয়ত ভয় দেখানোর জন্য কথাগুলো বলছে। কিন্তু হাড় ভাঙার শব্দের সঙ্গে সে আর্তনাদের শব্দ শুনতে পেল। একবার নয়, পর পর দু'বার। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল গুণিন। তার মুখে অস্ফুট একটা ধ্বনি, জল, টুকে জল।

সামনে তিরতিরে স্রোতের নদী। কলকল জলের শব্দ আছড়ে পড়ছিল কানে। নদী অব্দি হেঁটে যাবার ক্ষমতা ছিল না গুণিনের। গদাধর মুর্মু গামছা ভিজিয়ে জল নিংড়ে দিল গুণিনের মুখে। গুণিনের চোখের জলের সাথে পিপাসার জল মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

কাঠের বোঝা মাথায় তুলে নিয়ে সাংগি দেশ শাসকের গলায় বলল, এ মুখিয়া, তোর পাপকে তুই কাঁধে নে। দেখ, পাপের বোঝা কত ভারী হয়।

গুণিনকে কাঁধে তুলে নিতেই মুখিয়া টের পেল পাপ ভূমির চেয়েও ভারী।

# দাগ

বাড়িটার সামনে যেটুকু ঘাস আছে এই বর্ষায় তা যেন চনমনে সবুজে ডোবানো। সীমা আগে ঘাসের ডগায় হাত ছুঁইয়ে ফিরে যেত তার ছোটবেলায়, সন্দীপ মুগ্ধ চোখে দেখত। সীমা ঠোঁট ভরিয়ে বলত, জানো, দুর্বোঘাসের গোড়া খেতে ছোটবেলায় আমার খুব ভাল লাগত। নারকেল শাঁসের মতো কচকচ শব্দ হত চিবালে। মুখের দু'ধারে জমে যেত সাদা দুধের মতো ফেনা। মা দেখতে পেলে খুব বকত। বলত, ওগুলো খেতে নেই।

সন্দীপ হাঁ-করে শুনত সীমার কথা। সামান্য ঘাস নিয়ে মানুষের জীবনে যে এমন গল্প থাকে, তা তার কাছে অজানা। এই চাওড় বাঁধা ঘাসগুলো অনেকদিন আগেই উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল সে, সীমা তা হতে দেয়নি, বরং পাকা গিন্নির গলায় বলেছে, বাড়ির সামনে ঘাস থাকলে মনটা সবুজ থাকবে সবসময়। একদিকটায় গাছপালা কম। সবুজ বলতে তো ওই ঘাসটুকু!

ফুলগাছ নয়, প্রখর গ্রীষ্মে পালং শাকের খেতে জল ছিটোনোর মতো ঘাসের উপর জল ছিটাত সীমা। সন্দীপ তার এই পাগলামি দেখে হাসত, টিপ্পনী কাটত, আর রগড় করে বলত, তোমার বোটানি নিয়ে পড়া উচিত ছিল। আর্টস পড়ে তুমি তো সারা জীবন একটা কবিতাও লিখলে না, অথচ তোমার যা ভাবুক মন কবিতা লিখলে জীবনানন্দের পরে তোমার নাম আসত।

সন্দীপের ঠাট্টা গায়ে মাখত না সীমা, সে অন্যভাবে ঘুরিয়ে দিত প্রসঙ্গ, টানা চোখে অভিমানের রেণু মিশিয়ে বলত, ঘাসে পা দিয়ে ভোরবেলায় হাঁটতে তোমার ভাল লাগে না? আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলো? বানিয়ে বললে আমি ঠিক বুঝে ফেলব।

সীমার প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা ঘাসগুলো জিমির খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তুয়া কেজি ওয়ানের ছাত্রী, তার কচি চুলগুলো ঘাসের চেয়েও নরম। তার কোলে শোভা পায় সাদা ফুটফুটে খরগোস জিমি। সীমা ঘাস ছিঁড়ে দেয় তার মুখের কাছে, আহ্লাদী গলায় বলে, আয় জিমি, খেয়ে নাও, খেয়ে নাও বলছি। দুষ্টুমি করলে আর তোমাকে ঘরের বাইরে আনব না। তারপর তুয়াকে বলে, জিমিকে কোল থেকে নামিয়ে দাও। ও একটু হাঁটবে। আহা, বেচারি সারাদিন ঘরে থাকে। ওর এনটারটেনমেন্ট বলতে কিছু নেই।

তুয়ার কোল থেকে নেমে জিমি একছুটে চলে যাবে রাস্তার উপর। রাস্তা পেরিয়ে সে চলে যাবে ঝোপটার কাছে। সেখানে বাথরুম সারবে সে। তারপর ছুড়ে দেওয়া সাদা উলের বলের মতো লাফাতে লাফাতে ফিরে আসবে সীমার পায়ে কাছে।

সন্দীপ তিন মাস ধরে দেখছে এ দৃশ্য। ক্যালেন্ডারের ছবি নয়। সুখী পরিবারের নিটোল মধ্যবিত্ত দৃশ্য। ক্যামেরায় ধরা আছে এই ছবি, বিভিন্ন ভঙ্গিমায়, রকমারি সাজে। সবগুলো দৃশ্যে জিমির উপস্থিতি সাদা ভাতের চেয়ে নয়নলোভন।

ওর অফিস থেকে সবাই এসে দেখে গিয়েছে জিমিকে। জিমির প্রশংসায় সীমা বাঁধনহারা, তুয়ার উজ্জ্বল চোখ দুটো বিস্ময়ে নতুন কাচের গুলি।

জিমির গুণের শেষ নেই। সে একটা মামুলি খরগোস হলেও তার বুদ্ধিমত্তা পাকা বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে কম নয়। জিমি সিরিয়াল দেখে সোফায় বসে। সাঙো চা খায় মুখ ডুবিয়ে। নরম বিছানা ছাড়া তার ঘুম হয় না। কোনওদিন সে বিছানা নোংরা করে না। ঘরের কোনটা বাথরুম সে জেনে গিয়েছে। অনাদরে ঝুড়িতে কচি ঢ্যাঁড়শ কিংবা টাটকা পুঁইশাক থাকলেও সে ছুঁয়ে দেখে না। চুরি করে খেতে তার অনীহা। জিমির অভিমানবোধ তীব্র, বকুনি দিলে সে তুয়ার চেয়েও অভিমানী, সোফার এককোণে বসে ঠোঁট ফোলায়। কেউ ... জন্য সবার দয়া করুক এটা সে কামনা করে।

জিমি আসার পর থেকে তুয়া আর সীমার কাজ বেড়ে গেছে হাজার গুণ। এত কাজের চাপ তবু বিরক্তি নেই ওদের চোখে মুখে। বরং ওরা বেশ হাসিখুশি। টিভি দেখে, জিমিকে নেড়েঘেঁটে ওদের সময় চলে যায় দিব্যি।

কচি ঘাসগুলো ছিঁড়তে মায়া হয় সীমার। তুয়া তাকে উৎসাহ দিয়ে বলে মা, জিমির খাবার কিন্তু মোটে ঘরে নেই। ... এব ... ছিঁড়ে রাখতে।

—তোমার বাবার বড্ড ... সীমার ... মুখে ... বিরক্তি, ঘাসগুলো আছে বলেই তো জিমি এখনও বেঁচে আছে; ... তরতাজা!

তুয়া না বলেই ... ... সন্দীপ অফিস থেকে ফিরে এলে সীমা চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলল, জানো, জিমি আজ একটা অদ্ভুত সার্কাস দেখাল। সোফা থেকে এক লাফ দিয়ে ও উঠে বসল ডাইনিং টেবিলে। কাঁটা চামচ দিয়ে ও ... ফেলল। আমি ভাবতে পারছি না এই জিমির ছোটবেলা বস্তিতে কেটেছে।

সন্দীপ না হেসে পারল না। জিমির জীবনবৃত্তান্ত নাটকীয়। পদ্মর মা, যে কিনা এই বাড়িতে কাজ করে—জিমির ছোটবেলা কেটেছে তাদের ঘরে। ওখানে জিমির খাওয়া-দাওয়া ভাল হত না, সেবা যত্নের অভাব ছিল যথেষ্ট। ওরা ওকে কোনদিন পাউডার মাখায়নি, খুব কম দিনই কার্বলিক সাবান মাখাত, টাটকা ঘাসের বদলে খেতে দিত বাসি ভাত। জিমির শোওয়ার জন্য বরাদ্দ ছিল একটা ছেঁড়া চট, যে চটের উপর আগে দখল ছিল একটা ঘেয়ো কুকুরের। চট কেড়ে নিয়ে বস্তির কুকুরগুলোর শত্রু হয়েছিল জিমি। সে যদি এ বাড়িতে না আসত,

অর্থাৎ পদ্মর মা যদি তাকে কোলে করে এ বাড়িতে না ছেড়ে যেত, তাহলে এত দিনে জিমি ঢুকে যেত কুকুরের পেটে। পদ্মর মা তাকে নির্বাসন দিয়ে তার জান ও মান বাঁচিয়েছে।

জিমির মনে এখন কোনও দুঃখ নেই, সে ডোবা থেকে সমুদ্রে এসে পড়েছে। বাসিভাত ছেড়ে কচি ঘাস খেতে খেতে সে লেজ নাড়ে। তুয়া তার পুতুলখেলার প্লাস্টিকের বাটিটায় জল ভরে দেয়, খাও জিমি, খাও। আমি তোমাকে আর জল এনে দেব।

জিমি আসার পর সন্দীপের কাঁধটা অনেক হাল্কা মনে হয়। আগে তুয়া তাকে বলত, বাপি, তুমি আমাকে বেড়ু করতে নিয়ে চলো। তুয়াকে বেড়াতে না নিয়ে গেলে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। সীমা কঠিন গলায় বলত, সারাদিন তো অফিসে থাকো, ঘরে আসলে মেয়েটার দিকে একটু নজর দাও। খবরের কাগজ পরে পড়বে, যাও ওকে একটু স্কুটারে করে ঘুরিয়ে নিয়ে এসো। সারাদিন ঘরে থেকে থেকে মেয়েটা আমার শুকিয়ে গেল।

তুয়ার খেলার সাথীর বড় অভাব। আশেপাশের ফ্ল্যাটগুলোতে তুষার বয়সী কেউ নেই। ওকে খেলতে গেলে বস্তির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতে হয়। সামনের বস্তিটায় হাজারগণ্ডা তুয়ার বয়েসী ছেলেমেয়ে। ওরা দিনরাত শালিখ পাখির মতো কিচির-মিচির শব্দ তুলে খেলতে থাকে। তুয়া জানালার শিক ধরে হা করে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে। ওর ডাগর চোখে জেলখানার ছায়া। মাত্র ক' মাসে তুয়ার চোখ থেকে মুছে গিয়েছে ব্যথা-অভিমানের কালো ছায়া, তুয়ার চোখে-মুখে এখন কোজাগরী জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা। সীমাও আগে তুলনায় অনেক নরম, শান্ত। এখন আর ঘন ঘন বলে না, চলো ধোসা খেয়ে আসি স্টেশন বাজার থেকে। বরং তার বক্তব্য অন্যরকম, ধোসা খেলে আমার অ্যাসিড হয়। ওরা যা ঝাল দেয়, পেট জ্বালা করে। ... তুমি বরং ঘুরে এসো। সবাই চলে গেলে জিমিকে কে দেখবে?

জিমি আসার আগে সন্দীপের মা এসেছিলেন একমাসের জন্য। সীমা ভাল মনে তাকে মেনে নিতে পারেনি। অফিস থেকে ফিরে সন্দীপ অনেকদিন সীমার চোখে অসন্তোষের আগুন দেখেছে। ওই আগুন নিভাতে গেলে সংসারে আগুন ধরে যাবে— এটা সন্দীপ জানত। 'বোবার শত্রু নেই' এই রণনীতি সে বেছে নিয়েছিল নিজেকে অশান্তির আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য। সীমা প্রায় দিনই বলত, ঘরে একটা এক্সট্রা মানুষ থাকলে প্রাইভেসি নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া তুয়ার পড়াশোনা নষ্ট হয়।

—মা তো এক্সট্রা নয়, মা তো এই সংসারের একজন। সন্দীপের চোখে মুখে টক টক করত রাগ, এই এত বয়সে মাকে একা গ্রামের বাড়িতে রাখা যায় না। সেটা অনুচিত।

—আমি কি বলেছি মাকে তাড়িয়ে দিতে। আগুন ঠিকরাত সীমার চোখে,

তোমার মতো মাতৃভক্ত ছেলেকে আমার সাহস হবে না এসব কথা বলতে। তুমি যা ভাল বোঝ করো। তবে তুয়া ক্লাসে স্ট্যান্ড করতে না পারলে আমাকে দোষ দেবে না।

সন্দীপের মা এক মাসও থাকেননি, তাকে চলে যেতে হল। সীমা একদিন আতঙ্কিত গলায় সন্দীপকে আড়ালে ডেকে বলল, আমি আর এখানে থাকব না, তুমি আমাকে সোদপুরে রেখে আসবে চলো। তুয়া অনেকদিন তার মামার বাড়ি যায়নি। আর আমারও ভাল লাগছে না!

—কেন কী হল আবার? সন্দীপ শুকনো গলায় শুধোল, মা কি তোমাকে কিছু বলেছে?

—মা কেন আমাকে বলতে যাবে, আমি মায়ের কে হই? সীমার চাকু শানানো কথা, তুমি মাকে নিয়ে থাকো। পারলে মাকে একটা স্কিন স্পেশালিস্ট দেখিও।

—কেন, মায়ের স্কিনে আবার কী হল?

সীমা গলা আরও নীচু করে বলল, মায়ের ডান পায়ের গোড়ালির কাছে সাদা একটা দাগ আছে, দেখেছ? ওই সাদা দাগটা ডেঞ্জারাস। ওটা অরডিনারি স্পট নয়। আমার বাবা ডাক্তার। আমি জানি ওটা কীসের দাগ। সব জেনে-শুনে তুয়াকে নিয়ে আমি আর এখানে এক মুহূর্ত থাকব না।

সন্দীপ মাকে ডাক্তার দেখিয়ে রেখে এল গ্রামের বাড়িতে। ডাক্তার অভয় দিয়ে বলেছিলেন, হোয়াইট স্পটটায় ভয় পাবার কিছু নেই। আপনি যা সাসপেক্ট করছেন, এটা তা নয়। আমি একটা মলম দিচ্ছি। মাসখানেক লাগালেই সেরে যাবে।

সাদা খরগোসটাকে দেখলেই মায়ের সেই সাদা দাগটার কথা মনে পড়ে যায় সন্দীপের। গ্রামের বাড়িতে মাকে রেখে আসার সময় সন্দীপের বুক ভেঙে যাচ্ছিল কষ্টে। ফিরে আসার দিন সীমা উদ্বেগভরা চোখে তাকিয়েছিল, জামা-প্যান্ট খুলে বাথরুমে রেখে এসো। ওগুলো আমি ডেটলজলে ধুয়ে দেব। আর শোন, ভাল করে হাতে-পায়ে সাবান দেবে। ঘরে ছোট মেয়ে আছে। তার মুখ চেয়ে তোমার এসব করা দরকার। সন্দীপ না থাকতে পেরে বলেছিল, মায়ের রোগটা আদৌ ছোঁয়াচে নয়। তোমার এত ভয় না পেলেও চলবে। ডাক্তার বলেছেন, একমাসের মধ্যেই ওটা মিলিয়ে যাবে।

—মিলিয়ে গেলেই ভাল! কথা না বাড়িয়ে সীমা মুখ ফুলিয়ে চলে গিয়েছিল রান্নাঘরে।

সাদা খরগোসটার ভাগ্য তার মায়ের চেয়েও ভাল। সন্দীপের অন্যমনস্ক মনে কথাগুলো ছলকে ওঠে। দীর্ঘশ্বাসে বুক পুড়ে যায় তার। সীমা শিক্ষিত মেয়ে, তাকে সে বোঝাতে পারল না। মা কি বুঝতে পেরেছে সীমার দুর্ব্যবহার? বড়রা তো চিরদিন ছোটদের ক্ষমা করে দেয়। মা নিশ্চয়ই সীমাকে ক্ষমা করে দেবে।

চশমার কাচ মুছে নিয়ে সন্দীপ দূর আকাশের দিকে তাকাল। চোখের কোণ ভিজে উঠেছে নিজের অজান্তে। বারবার করে মনে পড়ছিল, মায়ের মুখ। ওই সবুজ ঘাসগুলোর চেয়েও স্নেহশীলা তার মা। একই আকাশের নীচে মাটির ঘরে বেঁচে আছে এখনও। মাসের প্রথমে সন্দীপ মাত্র কয়েক শ' টাকা এম. ও করে—এই তার দায়িত্ব। সীমা ভুল করেও বলে না, যাও, একবার মায়ের কাছ থেকে ঘুরে এসো। তুমি গেলে মা মানসিক শক্তি ফিরে পাবে।

টিভির পর্দায় সীমার চোখ আটকে গেছে। তুয়ার এখন স্কুল ছুটি। সে জিমিকে নিয়ে খেলছে। সন্দীপ অনেকদিন পরে পুরনো অ্যালবামটা খুলে বসেছে। সবই পারিবারিকচিত্র। ভুর ভুর করে উঠে আসছে অতীত দিনের গন্ধ। চেনা মাঠ, চেনা গাছপালা। হারিয়ে যাওয়া মুখের মিছিলে ঠাসা ওই অ্যালবাম। সন্দীপ ক্রমশ ডুবে যাচ্ছিল স্মৃতির পুকুরে।

টিভিতে একটা ডিটারজেন্ট পাউডারের বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে। ছুটে আসছে সাদা ধবধবে খরগোস। নরম, তুলতুলে কী মিষ্টি তার চেহারা। টিভির শব্দ ছাপিয়ে তুয়া চিৎকার করে কাঁদছে, মা, মাগো, জিমি আমাকে কামড়ে দিয়েছে।

—ইস, তাই তো! সীমার মুখ ফ্যাকাসে, রক্তহীন; মেঝে বসে পড়ে সে তুয়ার পা-টা টেনে আনল কোলের কাছে। সন্দীপ কিংকর্তব্যমূঢ়। পাশের ফ্ল্যাটের রামবাবু পশু-বিশারদ। তিনি বলেছিলেন, খরগোস কুকুরের চাইতে কম [illegible] নয়। যাদের দাঁত আছে, তাদের থেকে সাবধান থাকুন।

সীমার চোখে জল। রামবাবুকে ডেকে আনল সন্দীপ। রামবাবু ভ্রূক্ষেপহীন কণ্ঠে বললেন, আমি তো আগেই অ্যালার্ট করেছিলাম। আপনারা তো আমার কথা শোনেননি। এখন হাসপাতালে নিয়ে যান। তার আগে ওই অসভ্যটাকে লাথি মেরে তাড়ান।

তুয়ার কিছু হয়নি। মাত্র সাতদিনে তার পা শুকিয়ে খোসা উঠে গেল। জিমির এখন ঘরে ঢোকার অনুমতি নেই। সে মশলা পেষার জায়গাটাকে শোবার জায়গা করে নিয়েছে। তুয়া তাকে আর জল দিতে যায় না। অথচ জিমি তুয়াকে দেখলে [illegible] আগ্রহ দেখে চিৎকার করে ওঠে আনন্দে। সীমা জিমির চেহারা [illegible] দেখলে জ্বলে ওঠে। সে পদ্মর মাকে প্রায় বলে, তোমার ওই কালকেউটে আমার তুয়াকে কামড়েছে। বেইমান, এক নম্বরের বেইমান। ওকে তুমি নিয়ে যাও। আমি আর ওকে ঘরে রাখব না।

—অবলা জীব, ওর উপর রাগ করলে কী চলে? পদ্মর মা বোঝাতে চায় জেনে শুনে কি কামড়েছে। নিশ্চয়ই তুয়া দিদিমণি ওকে কিছু বলেছিল।

—তোমার যত কথা! সীমা মুখ ঘুরিয়ে নেয়, গাঁইয়া.. একেবারে গাঁইয়া! কুকুরের পেটে ঘি ভাত সহ্য হবে কেন? সোফা ছাড়া ঘুমোত না লাটের বাঁট! ওটাকে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

সন্দীপ মাঝখান থেকে ফোড়ন কাটল, থাকুক না জিমি, ও বাইরের বারান্দায়

থাকবে। ঘরে না ঢুকলেই তো হল। দূর থেকে দুটো চাল দিয়ে দেবে। ব্যস, মিটে গেল ঝামেলা।

—না, না, আর নয়। হাঁপাতে হাঁপাতে সীমা বলল, রামবাবু কী বলেছেন জানো? খরগোসের লোম বাচ্চাদের পেটে গেলে মারাত্মক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া খরগোসের থেকে নানান ছোঁয়াচে রোগের জন্ম হতে পারে। ওদের গায়ে এক ধরনের পোকা হয়, যেগুলো মানুষের গায়ে বসলে রক্ত চুষে নেয়। এত রিস্ক নিয়ে আমি খরগোস পুষব না। আমার কাছে সবার আগে আমার সংসার। সংসারের ক্ষতি হলে আমি কারোর সঙ্গে আপস করব না। আমি যে মিথ্যে কথা বলছি না, এর প্রমাণ তুমি আগেও পেয়েছ।

জিমি আবার স্বস্থানে ফিরে গেল, পদ্মর মা-ই ওকে কোলে করে নিয়ে গেল বস্তিতে। আবার একা হয়ে গেল তুয়া, সীমা। রেল বাজারে ধোসা খেতে যাওয়ার বায়না বাড়ল আবার। সীমা বলল, চার দেওয়ালের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছি। চলো না, কোথাও ঘুরে আসি।

—তাহলে মার কাছ থেকে ঘুরে আসি চলো। সন্দীপ উৎসাহিত হয়। সীমা থেঁতলে যাওয়া শামুক-মুখ করে বলল, না, না, ওখানে আমি আর যাব না। মায়ের সেই পায়ের দাগটা এখনও তো মেলায়নি। জেনেশুনে ওখানে তুয়াকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

সন্দীপ খুব হতাশ হল; তবু সে জোর গলায় বলল, অনেকদিন আগেই দাগটা মিলিয়ে গিয়েছে, মা আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে।

—মা মিথ্যে কথা লিখেছেন। সাদা দাগ সহজে মেলায় না। সীমার দু-চোখ জুড়ে ভয়।

বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে সন্দীপ প্রতিদিনের মতো অন্যমনস্ক। পূর্ণ চাঁদের আলো জানলা টপকে গড়িয়ে পড়েছে বিছানায়। আদর করার মতো হাওয়ায় কাঁপছে পাতলা পর্দা। সীমার চোখেও সেই অস্থির কাঁপুনি। সন্দীপের কোমর দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সীমা বলল, তুয়া বড় একা। ওর খেলার কোনও সঙ্গী নেই। তুমি যদি চাও তো আমি আর একবার রিস্ক নিতে পারি। সন্দীপ চমকে উঠল, সীমার শরীর থেকে হাত উঠিয়ে নিয়ে ভয়ার্ত গলায় বলল, সেকেন্ড টাইম সিজারের রিস্ক নেওয়া উচিত হবে না। তুয়ার সময় ডাক্তার আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন। রিস্ক নিয়ে আমি তোমাকে বিপদে ফেলতে চাই না।

চাঁদের আলো গলে পড়ে বিছানায়। তারা-নক্ষত্রে ভরা মেঘহীন স্বচ্ছ আকাশ। ওই অত রাতে গাছের আড়ালে বসে থাকা একটা রাতজাগা পাখি ডেকে ওঠে। কৃত্রিম ভয়ে সীমা সন্দীপের লোমশ বুকের কাছে মুখ নিয়ে যায়। শরীরের গন্ধ ভুরভুরিয়ে উঠে আসে অন্য শরীরে। নিঃশ্বাস ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়ে বিছানায়, সীমা পাশ ফিরে শুয়ে একাকী ফোঁপাতে থাকে। সন্দীপ দিকভ্রষ্ট

নাবিক। কী তার করণীয় বুঝে উঠতে পারে না। সীমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, স্বার্থপর। সবাই স্বার্থপর। কেউ কারোর মন বোঝে না।

সীমা ফোঁপাতে থাকে। তার নগ্ন পিঠে বিদ্যুৎরেখার মতো তীক্ষ্ণ একটা রেখা। কড়ি আঙুলের মতো মোটা সেই দাগের দিকে তাকিয়ে সন্দীপের চোখের তারা কেঁপে ওঠে বারবার। ভয় পায় সে। সীমার মসৃণ পিঠে চকের দাগ কবে আবার ফুটে উঠল! ধীরে ধীরে হাতটা সীমার পিঠের কাছে নিয়ে গেল সন্দীপ। ব্ল্যাকবোর্ডের দাগ মোছার মতো আলতোভাবে মুছতে চাইল ওটাকে। সীমা প্রতিক্রিয়াহীন। ফোঁটা ফোঁটা ঘামের বদলে সে কেমন সিঁটিয়ে থাকলে বিছানা আঁকড়ে। সন্দীপ একসময় ক্লান্ত হয়ে সীমার মুখটাকে ঘুরিয়ে নিল নিজের দিকে, ব্যাকুল হয়ে শুধোল, তোমার পিঠে ওটা কিসের দাগ? কই আগে তো ছিল না ওটা?

সীমা আকাশ থেকে পড়ল, দাগ! আমার পিঠে? হতেই পারে না।

ড্রেসিং টেবিলের কাছে চলো। সন্দীপ বলল, ছোট আয়না দিয়ে আমি তোমাকে পিঠের দাগ দেখিয়ে দেব।

ভয়ে চুপসে গেল সীমা, বিড়বিড় করে বলল, দাগটা কি মায়ের পায়ের দাগটার মতো? দাগটা কি খরগোসের লোমের চেয়েও সাদা?

—হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হচ্ছে। সন্দীপের দ্বিধাহীন জবাব, সরে এসো তো, আমি চিমটি কাটছি। দেখো তো লাগে কিনা—

সীমা পিঠ পেতে দেয় সন্দীপের সামনে। ওর সারা শরীর ভয়ে কুঁকড়ে গেল নিমেষে। ঘরের টিউবটা জ্বেলে দিয়ে সন্দীপ নিবিষ্ট চোখে দেখতে থাকে দাগ। একবার তার মনে হয়, মায়ের অপমানের বদলা নিতে, কিন্তু পারে না। সীমাকে বুকের কাছে টেনে এনে বলে, ভয় নেই, আমি তোমাকে তাড়িয়ে দেব না। মা আমাকে সে শিক্ষা দেয়নি। গলিত জ্যোৎস্নায় সীমার বিভ্রান্ত, অনুতপ্ত চোখের জল ঝরে পড়ে।

# নদী বিষয়ক সীমারেখা

াঁচ রাস্তা পেরলেই আকাশটা নীল ভাসমান ভেলার মত ভেসে ওঠে চোখের ামনে। শুভ্র দু'চোখে মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে থাকে সেই দিকে। রাতভর সে ্মাতে পারেনি উত্তেজনায়। জাকিরভাই সিগারেট ধরিয়ে বলেছিলেন, জানো ভ্র, আমার কোনো সীমারেখা ভাল লাগে না। মহৎ কিছুর জন্য চর্চা-অনুশীলন রকার, দরকার সংযমের। এই যে আমরা লেখালেখি করছি, এর পেছনে যে ্গ্ধতা আমাদের মনে কাজ করে তা কোন সীমারেখার ধার ধারে না। কেউ না লেও আমরা লিখব। 'পেন ইজ মাইটার দ্যান সোর্ড' কথাটা এখনও খাটে।

জাকিরভাই বাংলাদেশের ডাক্তার, ভারতবর্ষে ঘুরতে এসে মনটাকে রেখে ।সেছেন স্বদেশে। তবু তার কথা-বার্তায় এত আন্তরিকতা যা শুভ্রর দু'চোখে াঁকে দেয় সরল স্নিগ্ধতা। জাকিরভাই লিটিল ম্যাগাজিন নিয়ে মেতে আছে। াহিত্য ওদের রক্তের মধ্যে জোয়ার আসা নদীর মত টগবগান।

কলকাতায় জাকিরভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল শুভ্রর এক সাহিত্যানুষ্ঠানের ।-বিরতির সময়। এক সম্পাদক বন্ধু আলাপ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ইনি াকির। বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। ছোট গল্পকার। একদম প্রথম আলাপেই ভ্রর মন কেড়ে নিয়েছিলেন তিনি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছিল শুভ্র, একবার াসুন না কটা দিন আনন্দ করা যাবে। কি আসছেন তো?

—আপনার বাসাটা কোথায়? জাকিরভাই প্রশ্ন করেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে, ারপর বিনিময় হয় ঠিকানার। বিহারের এই ছোট্ট শহরে পা দিয়ে জাকিরভাই ার অপুর যে ভাল লেগেছে এটা তাদের চোখ-মুখ দেখে অনুভব করে শুভ্র।

হাঁটতে হাঁটতে জাকির ভাই বললেন, শুভ্র নামের অর্থ হল সাদা। আজকাল প্রকৃত 'সাদা' জিনিস পাওয়া যায় না। তবে এখনও দুধের রঙ সাদা, কিছু কিছু ানুষের মন সাদা। জুঁই-টগরের মত কিছু কিছু সাদা ফুল এখনও ফোটে। জাকিরভাই একটা ঝুপড়ির সামনে গিয়ে থামলেন, এখানে হাঁড়িয়া বিক্রি করছিল মাঝ বয়েসী এক মহিলা। এদৃশ্য তার কাছে নতুন। চোখে বিস্ময় মাখিয়ে তিনি শুধালেন, কী হচ্ছে এখানে?

শুভ্র বলল, মেয়েটা হাঁড়িয়া বিক্রি করছে। যারা বসে আছে চটের উপর তারা সব হাঁড়িয়া খেতে এসেছে। হাঁড়িয়া এখানকার খুব কমন ড্রিংকস্। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষরা অনেকেই হাঁড়িয়া খেয়ে সকালের টিফিনটা সেরে নেয়।

—খুব আশ্চর্য তো! অপু বলল, আমি হাঁড়িয়ার কথা পড়েছি বইতে, কিন্তু কোনদিন দেখিনি। আচ্ছা শুভ্রদা, আমরা কি ওখানে যেতে পারি না?

—হ্যাঁ, অবশ্যই যেতে পারি। শুভ্র বলল, ওখানে গেলে হাঁড়িয়া না খেলে ওরা হয়ত কিছু মনে করতে পারে। তবে যেতে যখন মন চাইছে, যাওয়াই ভাল। মনকে কষ্ট দেওয়া কারোরই উচিত নয়।

কলকাতায় সেবার হোটেলে রাত্রি কাটানোর সময় অনেকেই মদ খেয়েছিলেন সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে। বাংলা সাহিত্য নিয়ে সবাই যে কম বেশি চিন্তিত সেদিন মদের গ্লাসে তার ছবি দেখেছিল শুভ্র। অনেকেই জাকিরভাইকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, একটু খান না, এক জায়গায় দুরকম ফল ভাল দেখায় না।

সেদিন সবিনয়ে জাকিরভাই ওদের এড়িয়ে গিয়েছিলেন, হোটেলের লনের এক পাশে দাঁড়িয়ে শুভ্রকে কাছে ডেকে বলেছিলেন, দেখুন কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে আকাশে। মেঘগুলো বেগবান ভেড়ার বাচ্চার মত। এই চাঁদ, এই আকাশ আমাদের নাটোরেও দেখা যায়। মানুষের সীমারেখা আকাশকেও ভাগ করে দিয়েছে, কিন্তু সত্যিই কি তা পেরেছে?

জাকিরভাইয়ের প্রশ্নটায় ছিল আবেগের শুভ্র মিশ্রণ, শুদ্ধ সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বলল, আকাশের চাঁদ তো সবার। সেখানে সীমারেখার কোন প্রশ্ন উঠে না।

হাঁড়িয়াভাটিতে ওরা তিনজন যখন ঢুকে এল তখন সেই আলোছায়া পরিবেশে বসে থাকা ঢিলেমী চোখের মানুষগুলো একটু সচকিত হল এবং ঈষৎ সন্দেহ মিশিয়ে ওদের দিকে তাকাল। মাঝবয়েসী মহিলাটি ভেজা কাপড়ে হাত মুছে নিয়ে এগিয়ে এল সামনে, ভাঙা হিন্দি আর বাংলায় শুধোল, বাবুদের কি হাঁড়িয়া চলবে? যদি চলে তাহলে ওখানে গিয়ে বসুন। আমি তিন বাটি হাঁড়িয়া ছেঁকে দিচ্ছি। মহিলার কথা-বার্তায় বাণিজ্যিক মনোভাব। শুভ্র সবিনয়ে বলল, আমরা এখানে হাঁড়িয়া খেতে আসি নি। এরা দুজন আমার বন্ধু। এখানে এসেছেন বেড়াতে। আমি এখানেই থাকি। চাকরি করি।

কিছুটা আশ্বস্ত হল মহিলা, চোখ থেকে সন্দেহ সরিয়ে রেখে বলল, তাহলে কী সেবা করতে পরি বলুন? আমার এখানে এসে খালি মুখে ফিরে যাবেন তা তো হয় না। হাঁড়িয়া না খান, অন্তত এক গ্লাস করে জল খান।

ঝকঝকে, পরিষ্কার অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে জল ভরে এগিয়ে দিল মহিলা। জাকিরভাইয়ের তেষ্টা লেগেছিল, তিনি পরস্পর দু গ্লাস জল খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন মাটিতে। শুভ্রকে বলল, এখানকার ছায়া সুনিবিড় পরিবেশ ছেড়ে উঠতে মন করছে না। তবু যাওয়া যাক কী বলুন, আমাদের তো নদীর কাছে যেতে হবে।

—আপনি তো নদীর দেশ থেকে আসলেন, তবু নদী দেখায় এত ঝোক কেন আপনার? শুভ্রর প্রশ্নে জাকিরভাই হাসলেন, নদী দেখতে আমার ভাল লাগে সেইজন্য। তাছাড়া নদীর রূপ আমার মনে হয় সব জায়গায় আলাদা আলাদা।

জলের রঙও আলাদা। স্বভাব-চরিত্র সব আলাদা। দু'ধারের দৃশ্যাবলীও আলাদা।

শুভ্রর ভাল লাগল কথা শুনে, সে কিছুটা গর্বিত ঢঙে বলল, পাহাড়ী নদীর সৌন্দর্যই আলাদা, আপনাদের ওদেশের নদীর সঙ্গে এখানকার নদীগুলোর কোন মিল খুঁজে পাবেন না। আপনার কথাই ঠিক—এখানকার নদীর জলও আলাদা। নদীর ধারের মানুষগুলোও ছবির মত সুন্দর। ওদের মত সরল সাদাসিধে মানুষ খুব কম দেখতে পাবেন আপনি।

মোরাম ফেলা রাস্তা নদীর দিকে চলে গিয়েছে এঁকেবেঁকে। মাটির ঘরের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে পাকার বাড়ি। আদিবাসীদের নিকোন উঠোনে ধানের গোলা, মসৃণ দেওয়ালে ছবির মত আলপনা। দূর থেকে তা দেখে জাকিরভাইয়ের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ওদের আর এক সঙ্গী অপু বলল, এত সুন্দর রঙ ওরা কোথায় পায়?

শুভ্র হাসল, রঙের পাহাড় আছে এখানে। প্রকৃতি ওদের রঙ দেয়। বুধবারের হাটে রঙ কিনতে পাওয়া যায়। দেশে ফেরার সময় আপনি রঙ কিনে নিয়ে যেতে পারেন।

জাকিরভাই বললেন, এ গ্রামে আপনার কি কেউ জানাশোনা আছে?

শুভ্র ঘাড় নাড়ল, এ গ্রামে আমাদের অফিসের দু-জন চৌকিদার আছে। ওরা পাহাড়ের উপরের প্যাসিভ-রিফ্লেক্টর পাহারা দেয়। যাবেন ওদের বাড়িতে? মুখের কথা শেষ হয়নি শুভ্রর, তার আগেই দেখা হয়ে গেল ভীষনাথের সঙ্গে। ভীষনাথের নামটাই ভীষণ, চেহারাটা অতি সাদামাটা। সে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মুখে আপ্যায়নের ঝংকার তুলে বলল, চলুন বাবু, গরীবের ঘর থেকে ঘুরে আসবেন।

ওর ডাকে সাড়া না দিয়ে পারল না ওরা।

ভীষনাথের মাটির ঘর, মাথার উপর খাপরার ছাউনী। দেওয়ালে ফুল-লতা-পাতা আঁকা সাদা রঙ দিয়ে। উঠানের এক পাশে একটা আতাগাছ। কুসুমগাছের ছায়ায় খাটিয়া পেতে ভীষনাথ বলল, বাবুরা বসুন। আমি চায়ের ব্যবস্থা করি।

—না, না এই গরমে আর চায়ের দরকার নেই। শুভ্র বলল, চা পরে একদিন এসে খাবো। আজ উঠি।

—তাই কী হয় বাবু, কত দিন পরে এলেন। ভীষনাথ ব্যস্ত হয়ে ওঠে গেল ঘরের ভেতর। শালপাতার তিনটে ঠোঙ্গা বানিয়ে সে ফিরে এসে বলল, নিন ধরুন। চা না খেলে হাঁড়িয়া খেয়ে যান। এগুলো কেনা নয়, আমার ঘরে বানান। এর স্বাদই আলাদা। ভরপেট খেলেও এতে নেশা হবে না, শুধু মাথাটা ঝিমঝিম করবে। আজকালকার হাঁড়িয়াগুলোয় ওরা সব কড়া নেশা হবার জন্য ইউরিয়া মেশায়। আচ্ছা বাবু, আপনারই বলুন, কোন কড়া নেশা কি জীবনের জন্য রোজ-রোজ ভাল? যে নেশা শরীরের ক্ষয় করে, সে তো নেশা নয়, গরল।

শুভ্র বলল, এগুলো ঠোঙ্গা বা দোনা। ঘরের মেয়েরা জংগল থেকে শালপাতা

তুলে এনে নিমকাটি দিয়ে বানায়। দোনা বাজারেও বিক্রি হয়। আমি দেখেছি অনেকে দোনা বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছে। ভীষনাথ হাঁড়িয়া খাওয়ানোর জন পীড়াপীড়ি করল মাত্রাধিক। শেষে হতাশ হয়ে বলল, আপনারা কেন খেলেন ন আমি জানি বাবু। আমরা গরীব, মুর্খ মানুষ। আমাদের ঘরে জল খেলে ে আপনাদের মান-সম্মান যাবে। ঠিক আছে, যা ভাল বুঝুন করুন। আপনারা এ গরীবের সম্মান রাখলেন না!

শুধু শুভ্র নয়, জাকিরভাই আর অপুকে স্পর্শ করল ভীষনাথের নিখা অভিমান। শুভ্র মধ্যস্থতার জন্য বলল, ভীষনাথ, তুমি দুঃখ পেও না। হাঁি আমাদের তিনজনের কেউ-ই খাই না। তবে তুমি যখন বলছ, আমারা তিনজে তিন ফোঁটা হাঁড়িয়া খাব। এক ফোঁটা হাঁড়িয়া খাওয়া, আর দোনার সব হাঁড়ি খাওয়া এক কথা নয়। তবু তোমার সম্মান আমরা রাখব। তোমাকে আমরা দুঃ দিতে চাই না।

শুভ্র হাতের চেটোতে হাঁড়িয়া নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল। তার দেখাদেখি জাকি ভাই আর অপু ঠোঁটে ছোঁয়াল ঘোলা পানীয়। ঝাঁঝাল ঘ্রাণ ঢুকে গেল বুকে ভেতর। শুভ্র রসিকতা করে বলল, এটা হল আমাদের এখানকার জনজীবনে আদি ঘ্রাণ। আপনাদের স্মৃতিতে ধরা থাকুক এই দৃশ্য। জীবনে কোন কিছু ফেলবার নয়। যা অতি তুচ্ছ, তার ভেতরেও লুকিয়ে থাকে জীবনের স্পন্দ সৌন্দর্য।

জাকিরভাই বললেন এ-ও এক অনন্য স্বাদ। এখানে না এলে এই বিচি জীবন আমার জানা হোত না। মানুষ যত দিন বাঁচে, তত দিন শেখে। মানুষে শেখার কোন শেষ নাই।

শূন্য আকাশে একটা মেছোছিল উড়ছিল পাক দিয়ে, তার চিকন ছা ধানক্ষেতের উপর সচল কোনো দ্রুতগামী যান। ভীষনাথ হাঁটু মুড়ে বস আমাদের খাটিয়ার সামনে, নিজের হাতে বাঁধা বিড়ি বের করে বলল, বাবু যদি কিছু মনে না করেন তাহলে কাঁচা পাতার বিড়িতে দু-টান দিয়ে দেখুন জংগল থেকে আমার বউ পাতা পেড়ে আনে, আমি মশলা হাট থেকে কি আনি বিড়ি বাঁধার জন্য। ভীষনাথের বিড়ির আকৃতি বাজারে যে ধরনের বি চালু আছে তার চেয়ে একটু মোটা। তবে আগুন ধরালে ভস্‌ভসিয়ে ধোঁয়া বের পুরো মুখ কড়া তামাকের গন্ধে হয়ে যায় তেতো। জাকিরভাই বিড়ি খান ন তিনি সবিনয়ে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, আজ আপনি আমার কাছ থেকে একা সিগারেট খান।

লম্বা সিগারেট হাতে নিয়ে ভীষনাথ অবাক চোখে তাকাল, তারপ সিগারেটের মুখে অগ্নি সংযোগ করে হুসহাস টানতে লাগল মনের আনন্দে ভীষনাথের লেংটা ছেলেটা এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে পেট চাপড়াতে চাপড়ে

ঢুকে গেল ঘরের ভেতর। চিৎকার করে বলল, মা, এ মা দেখ-দেখ, বাপ না সিগারেট টানছে।

নদীর দিকে যাওয়ার পথে অদ্ভুত একটা দৃশ্য নজরে পড়ল শুভ্রর, উঁচু করা মাটির ঢিপির চারপাশে একজন প্রৌঢ় মহিলা মৌন শরীরে মাটির প্রদীপ হাতে ঘুরছিল ক্রমাগত। এমন মৌনতাপূর্ণ দৃশ্য শুভ্র এর আগে কোনদিন দেখেনি, সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা তেঁতুলগাছের ছায়ায়। তখন ভীষনাথের চোখে-মুখে ফুটে উঠল বিচিত্র ধরনের অস্বস্তি, সে ফিসফিস করে বলল, বাবু, চলে আসুন, এখানে দাঁড়ানো আমাদের উচিত হবে না।

শুভ্র প্রশ্ন করল, মহিলাটি প্রদীপ হাতে নিয়ে কী করছে ওখানে? ভীষনাথ চাপা স্বরে বলল, কালরাতে ঐ বউটার তের বছরের ছেলে মারা গিয়েছে অসুখে। গুণিন-কবিরাজ কেউ ওর ব্যামো সারাতে পারেনি। ছেলেটাকে ডাইন কেটে ছিল!

—কী বলছো কী ভীষনাথ, আজকালকার যুগে আবার ডাইন আছে নাকি? শুভ্রর গলা থেকে ঝরে পড়ল আশ্চর্য শব্দমালা। ভীষনাথ তার এই উদ্বেগকে কোনরকম গুরুত্ব না দিয়ে বলল, ডাইন গাঁয়ে লুকিয়ে-ছাপিয়ে আছে। সামনা-সামনি না হলে কেউ তো বিশ্বাস করে না।

—তুমি কি নিজের চোখে ডাইন দেখেছো? শুভ্রর প্রশ্নে খুশি হল না ভীষনাথ; সে পুরোপুরি এড়িয়ে গেল প্রশ্নটা, তারপর মুখ নীচু করে আপন মনে হাঁটতে লাগল নদীর দিকে। জাকিরভাই-এর মুখে কোন কথা নেই। অপু বলল, কাগজে আমি প্রায়ই ডাইনী হত্যার কথা পড়ি। প্রতিটা হত্যাই নৃশংস। প্রায় সবই আপনাদের এদিককার ঘটনা। কাগজে যা পড়ি, এখানে এসে মনে হচ্ছে তার অনেকটাই সত্যি।

ডাইনী প্রসঙ্গটা ভীষনাথের ভাল লাগছিল না একদম, দলের মধ্যে থেকেও সে অনেকটা কোণঠাসা। ভীষনাথের অস্বস্তির কারণ বুঝতে পেরে প্রসঙ্গ বদলাল শুভ্র, জানেন জাকিরভাই, আর ক'পা হাঁটলেই আমরা নদীর ধারে পৌঁছে যাব। আমার যখন মন ভাল থাকে না, তখন আমি নদীর কাছে আসি। আমার গল্প-উপন্যাসে এই বিনজয় নদীর কথা আমি বহুবার লিখেছি। এর চারধার এত মনোরম, এখানে আসলে আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে না। দূরের পাহাড়টাকে দেখে মনে হয়, সে যেন নদীর পাহারাদার।

জাকিরভাই সব শুনে বললেন, কলকাতার গঙ্গার চারধারটা বড় নোংরা আর ঘিঞ্জি। আমি একদিন গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এত প্যাচপেচে কাদা আর নোংরা আবর্জনায় ভর্তি যে ভাল লাগল না, ফিরে এলাম।

—আপনাদের ওদেশের পদ্মাও কি আমাদের গঙ্গার মত? জাকিরভাই কোন মন্তব্য করলেন না, নীরব চোখে দূরের দিকে তাকালেন। আমি গর্ব করে বললাম, বিনজয়ের দু'পাড় ছবির মত সুন্দর। চলুন না, আপনার মন ভরে

যাবে। নদীর পাড়ে দাঁড়ালে সুগন্ধি হাওয়ায় আপনার মাথার চুল এলোমেলা হয়ে যাবে। আপনি তো অনেক নদী দেখছেন, আমার বিশ্বাস—এমন পাহাড়ী নদী এর আগে আপনি আর দেখেননি!

নদীর পাড়ে পৌঁছাতেই বুক ভরে শ্বাস নিল শুভ্র। প্রায় বিশ হাত উঁচু পাড়। দু-পারে অসংখ্য বুনো লতাপাতা ছোটফুলের সমাহার। ওদের মাঝখানে দু-একটা শিশম গাছ। গরমের সময় বলেই নদীতে এখন হাঁটু ডোবা জল: ছোট-বড় পাথরে শরীর ছুঁয়ে জল ছুটেছে দূরের দিকে। জলের মুখে জ্যোৎস্না রঙের গাঁজরা। জাকিরভাই পা টিপে টিপে হেঁটে এলেন জলের কাছে, এক আঁজলা জল হাতে তুলে বললেন. জলের ধর্ম সব জায়গাতেই এক। মানুষের ধর্মও সারা পৃথিবী জুড়ে এক। কিন্তু এতসব কিছু এক হওয়ার পরেও মানুষের যুদ্ধ কেন থামে না বলুন তো?

—বিন্‌জয়ের জল অবিকল যেন তুঁতে গোলা। অপু বলল, এত স্বচ্ছ-নির্মল জল, দেখলেই তৃষ্ণা বেড়ে যায়।

জাকিরভাই প্যান্ট গুটিয়ে নেমে গেলেন নদীর জলে, ভরপেট জল খেয়ে ফিরে এসে বললেন, চলুন, কোথাও ছায়া দেখে বসি। কাছে ডাইরি আছে, আজ আমরা চুটিয়ে সাহিত্য করব।

একটা কুসুমগাছের ছায়ায় ওরা তিনজন গোল হয়ে বসল। অপু একটা স্বরচিত কবিতা শোনাবে ডাইরির পৃষ্ঠা খুলে। এক লাইনও পুরো পড়েনি, এমন সময় নদীর পাড় ছুঁয়ে উঠে এল একটা চোদ্দ-পনের বছরের ছেলে। হাতে তার একটা সাধারণ কাপড়ের ব্যাগ। জাকিরভাই বললেন, কি চাই তোমার?

ছেলেটা বাংলা ভাল বুঝল না, তাই গুটি-গুটি পায়ে সে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে এল। অপু বলল, ও মনে হয় সাহায্য চাইছে। একটা টাকা দিয়ে বিদেয় করুন।

শুভ্র এক টাকার নোট-টা ছেলেটার দিকে এগিয়ে দিতেই হো-হো করে এক চোট হেসে উঠল সে, তারপর কাপড়ের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে হাসি থামিয়ে সে হিন্দিতে বলল, আমি ভিখ্ মাঙতে আসিনি। আমার কাছে দারু আছে, আপনারা খাবেন, সস্তায় দেব?

সে কোনরকম সম্মতির অপেক্ষা না করেই কাপড়ের ব্যাগ থেকে ফটাফট বের করে আনল দেশী মদের বোতল আর কাচের গ্লাস। শুভ্রর চোখ জ্বলছিল রাগে, জাকিরভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় তার কথা আটকে গেল। পাহাড়ী নদীর সৌন্দর্যের উপর এমন কালির ছিটে পড়বে সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

ভীষনাথ ওদের নদীর পাড়ে ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল ক্ষেত দেখতে। ঘেমে-নেয়ে ফিরে এল সে। এসেই হন্তদন্ত হয়ে বলল. বাবুদের আর নদীর পাড়ে হাওয়া খেয়ে লাভ নেই। তাড়াতাড়ি ঘর ফিরে যান! ঐ বাঁকের মুখে আমি দেখে এলাম কারা যেন একটা যুবতী মেয়েকে খুন করে পালিয়ে গেছে। মেয়েটার

পরনে কাপড়-চোপড় কিচ্ছু নেই। আমার মনে হচ্ছে খুন করার আগে ওরা বলাৎকার করেছে মেয়েটার উপর। .....চলুন বাবু। আর দেরি করা ঠিক হবে না। দিনকাল খারাপ, কখন কী হয় বলা যায় না।

মদ বেচতে আসা সেই ছেলেটা কথাগুলো শুনছিল চুপচাপ। গ্লাস আর মদের বোতলটা থলির ভেতর ঢুকিয়ে নিয়ে সে হাঁটা দিল জঙ্গলের পথে। কিছু পরে তাকে আর দেখতে পেল না শুভ্র। জাকিরভাইয়ের মুখে কোন কথা নেই। অপু আশাহত কবিতা-পড়ার যথাযথ পরিবেশ না পেয়ে; শুভ্রর চোখ-মুখ সাদা হয়ে উঠেছে অপমানে। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে ফেরা মেয়েগুলো বোঝা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হাঁটু জলে। শাড়ি হাঁটু সমান তুলে তারা প্রাকৃতিক কর্ম সারল একসাথে। তিনজন সমবয়সী যুবককে দেখে তাদের মুখে খিলখিলান হাসি। ওরা আবার উঠে এল পাড়ে। শাড়ির জল নিংড়ে ওরা হেঁটে যাচ্ছে মেঠো পথ দিয়ে। গলায় বুনো একটা সুর।

একটু আগে জাকিরভাই পেট পুরে জল খেয়েছিলেন বিন্‌জয়ের। তার গলার কাছে ঘেন্নায় ঠেলে উঠল বমি। সুগন্ধি বাতাসে তখন কানাকানি আর ফিসফাস-গুঞ্জন। ধর্ষণের চিৎকার আর দেশী মদের তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধ। সব মিলিয়ে সে এক বিশ্রী পরিস্থিতি। হাঁপিয়ে উঠে শুভ্র জাকিরভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল। অপুর মুখ শুকিয়ে গিয়েছে ভয়ে। ভীষনাথ তাড়া লাগিয়ে বলল, আর দেরি করবেন না বাবু, ফিরে যান। যে কোন সময় বিপদ ঘটে যেতে পারে। নদী কি আর আগের মত আছে? ফেরার পথে শুভ্র নদী নিয়ে একটা কথাও বলল না, তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে স্বপ্নভঙ্গের অপ্রত্যাশিত ছবি।

# মা

তিনখানা গাছের ছায়া পরপর, জমাট বাঁধা মেঘের মত। হলুদ পাতা হাওয়ায় ওড়ে প্রজাপতির মত, বাতাসে ধুলো-বালির আধিক্য। পুকুরপাড়ের নিচে থেকে শুরু হয়েছে বিস্তীর্ণ ধানমাঠ, এখন দোলালাগা ধানগাছে ভাদুনাচের মহড়া। পারুবুড়ির মাথার উপর আকাশ, পা ছাপিয়ে উঠে এসেছে ধুলো। খাটো কাপড়ে বেঁটে গতর পুরো ঢাকে না, তবু বুড়ির পথ চলায় কোনো জড়তা নেই। আয়েসী নিঃশ্বাস গড়িয়ে নামে নাক ছুঁয়ে বুক বরাবর। এত ক্লান্তি, জড়তা আগে ছিল না, শরীর এখন শুধু জুড়োতে চায় গভীর ঘুমে। পা চলে না, মনও বলে না এগিয়ে যেতে। হাঁপু ধরে বুকে, একটু জোরে হাঁটলেই বুকের ভেতর প্রাণপাখিটা ধুঁকতে থাকে অনবরত। পারুবুড়ির বেঁচে থাকাটাই ঝামেলার। দীনুবুড়ো গত হবার পর থেকেই মাথায় ভেঙে পড়েছে আকাশ। খাওয়া-পরার চরম অভাব। পায়ের তলার মাটির সরে যায় দুর্দিনে। যারা আত্মীয়স্বজন তারাও ফিরিয়ে নেয় মুখ। মুখঝামটা মেরে বলে, নিজেরটা নিজে সামলাও। যা দিনকাল পড়েছে, তাতে অন্যের বোঝা কে বইবে বলো? কথা সত্যি। কলিকালে তো 'চাচা আপন পরান বাঁচা'। কেউ কারোর মুখের দিকে তাকায় না ভালবেসে। সবাই যার-যার, তার-তার। এর মধ্যেই বেঁচে থাকার মহড়া, লড়াই। পারুবুড়ি পেরে ওঠে না ওদের সাথে। দীনুবুড়ো চোখ বোজার পর থেকেই ভার আকাশ নেমে এসেছে তার মাথায়, পা দুটো আরাম পায় না কোন সময়। যে বাড়িতে বাসন মাজত বুড়িটা, সে বাড়ির বউটার মুখ যেন খোলা তরোয়াল। চোপে-চোপে কাটে। জ্বালাধরান কথার হুল ঢুকিয়ে দেয় গায়ে। চিমটি কাটলেও গায়ে এতটা লাগত না, এমন জ্বলন তার কথায়। সেই ফর্সাপাবা বউটাই বলল, তোমাকে দিয়ে আর ঘরের কাজ হবে না দয়ালের মা। তুমি বরং একটা কাজ কর—চোখে যখন ভাল দেখতে পাও না, গাঁয়ে গাঁয়ে ভিখ্ মাঙো।

—একথা তুমি বলতে পারলে গো! পায় আর্তনাদের মত গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল কথাগুলো; পারুবুড়ি ছলছলে চোখে বলেছিল, হাতি যখন কাদায় পড়ে চামচিকিতে লাথি মারে। আমার অবস্থাও তাই হয়েছে, মা। আমি কত বড়ঘরের মেয়ে, এখন বাসন মাজি তোমার দোরে। তুমি যা মুখে না আসে তা-তো বলবাই। আমাকে শুনতেও হবে। চামচিকি কি হাতির সাথে কুস্তি লড়ে পারে!

কথা শুনে বাবুঘরের ফর্সা বউটার থোঁতা মুখ ভোঁতা। অপ্রস্তুত চোখে-মুখে রাজ্যের জড়তা। পারুবুড়ি শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, ভেবো না, বাসন মাজতে এয়েচি বলে আমার কোনো মান-সম্মান নেই। আমার ছেলেটা চানাচুর কারখানায় কাজ করে। সকাল হলে বেরিয়ে যায়, ফেরে সাঁঝে। দিন গেলে সে

একাই ত্রিশ টাকা কামিয়ে নেয়। ছেলেটার ক'মাস থেকে বুকের ব্যামো। খুব নেশা করত। এখন হাড়মাস কালি হয়ে তাকে একেবারে চেনা যায় না। বউটা তার লক্ষ্মীমন্ত। সে এখনও সাঁঝকালে বাতের বিদ্‌না জোর হলে আমার পা দাবিয়ে দেয়।

—তোমার যখন এত সুখ তাহলে কেন মরতে পরের দোরে এলে? ফর্সা বউটার ঠোঁটের উপর ঝুলে থাকে বিরাট জিজ্ঞাসা। কিন্তু সাহসে কুলায় না শুধোতে। জেনে-শুনে কেউ আবার জাতসাপের লেজে পা দেয় নাকি? যুগ যে বদলেছে হাড়ে হাড়ে টের পায় বাবুঘরের বউ। ফলে মুখে কুলুপ আঁটা। মনে মনে ভাবে—বুড়িটা কাজ ছাড়লেই বাঁচি। এখন নাই মামার চাইতে কানামামা কখনোই ভাল নয়। দুষ্টু গরুর চাইতে শূন্য গোয়ালই ঢের ভাল।

পারুবুড়িকে কাজ ছাড়াতে হল না, সে নিজেই একদিন দুম করে কাজ ছেড়ে দিল। ফোকলা মাড়িতে হাসির রঙ ছুঁইয়ে বলল, কাল থেকে আমি আর কাজে আসবোনি। আমার গতর আর চলছে না। তাছাড়া খোকাটা আমার ভ্যান-রিক্‌শো কিনেছে ব্যাঙ্কের লোন নিয়ে। সকাল হলে সে রিক্‌শো নিয়ে বেরিয়ে যায়। বউটা ছানাপুনা নিয়ে তারে দুটো জলখাবারও করে দিতে পারে না। আমি মা হয়ে কী করে তা চোখে দেখি বলো তো। আগে তো ঘর, তারপর তো সব।

পারুবুড়ি কাজ ছেড়ে দিল হাসতে হাসতে, তখনও সে জানত না তার কপালে ঝুলে আছে আষাঢ়ের কালো বাদল। মাস ঘুরল না দয়ালের বউ সাধনা বলল, মা, ঘরে বসে থাকলে তুমার বাতের ব্যামো আরো বাড়বে। তার চেয়ে খেজুরপাতা কেটে এনে ঝাঁটা বাঁধো।

—এই বয়সে কি অত কঠিন কাজ পারব গো। বুড়ির ফাঁকা মুখে ঘোরাফেরা করে কথাগুলো, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, অখন অতো মেহনতের কাজ কি আমার দ্বারা হবে গো?

—না হলে সন্‌সার চলবে কী দিয়ে? ঝ্যানঝেনিয়ে ওঠে সাধনার গলা, দুচোখে আগুন ঝরিয়ে বলে, এতদিন যা করেছ—করেছ। এখন আর ওসব চলবে না। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ালে পেটের ভাতের যোগাড় হবে না। এবার থেকে নিজেরটা নিজে খুঁটে খাও। কে তুমাকে রিক্‌শা টেনে খেটে-খুটে খাওয়াবে?

—কেনে আমার দয়াল কি তার বুড়া মাকে দু-মুঠা ভাত দিতে পারবেনি? তার তো গতর পড়েনি এখনও। পারুবুড়ির কথা কানে তোলে না সাধনা বরং পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, ছেলে রিকশা চালায় বলে কি তুমি ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং লাচিয়ে খাবা? তুমার লাজ লাগবে নি? তুমি কেমন ধারা মা গো? বিস্ফারিত চোখ মেলে তাকায় সাধনা, চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, নিজের পেটে ধরা ছেলে নয় তো, তাই কোনো দয়া মায়া নেই ওর উপর। ওর কিছু হয়ে গেলে আমি যাবো কোথায়? তখন আমার দশা যে তুমার মতন হবে। জেনে-শুনে ও ভুল আমি

করব নি। পারুবুড়ির বুকের মাঝখানে সাধনার কথাগুলো যেন হাতুড়ির বাড়ি মারে। মনোকষ্টে কাহিল হয়ে পড়ে সে। সাধনা সহজভাবে যে কথাগুলো বলল তা আদৌ সহজ নয় হজম করা। দয়ালকে সে পেটে ধরেনি ঠিকই, কিন্তু দয়াল যে তার নাড়ি ছেঁড়া যন্ত্রণার ফসল। শুধু পেটে ধরলেই কি মা হওয়া যায়? দয়ালকে সে কুড়িয়ে পেয়েছিল হাটখোলায়। বর্ষা রাতে ছেলেটা ভিজে জড়িয়ে গিয়েছিল ন্যাতার মতো। তাকে তুষের তাপ নয়, বুকের তাপ দিয়ে বাঁচিয়েছিল সে। দীনু বুড়ো বলেছিল, এ তোর বৃথা চিষ্টা। ও ছেলে বাঁচবার নয়। সারারাত জলে ভিজেছে দুধের খোকা। যারা ওকে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে তারাও জানে—এ ছেলে বাঁচবে না। পারুবুড়ির তবু স্বপ্ন দেখা থামেনি। দীনবন্ধুকে জোর করে থামিয়ে দিয়ে বলেছে, এমন ফুটফুটিয়া ছেলে তার মায়ের কোলে না বাঁচলেও আমার কোলে ঠিক বাঁচবে। জান তো এ ছেলেকে ভগবান আমার হাতে তুলে দিয়েছে শুধুমাত্র বাঁচাবার জন্য। পাড়ার লোকে বলত, আমি বাঁজা। এবার থিকে আমার সেই অপবাদ ঘুচল। তুমি যাও, টুকে গরম দুধ লিয়ে আসো কোথা থিকে। হা দেখ—কেমন হাঁ করছে। ছেলেটাব বড় ক্ষিদে পেয়েছে গো......

সেই যে বাঁজা গাছে ফুল এল মাতৃত্বের, তার দায়ভার দীনবন্ধুও ভাগ করেই নিল স্বেচ্ছায়। ফাঁকা ঘর ভরে উঠল আনন্দজোয়ারে। পারুল পরের ছেলেকে কোলে নিয়ে চুমা খায়, গান গায় ঘুমপাড়ানীর, তার ভরা বুকে এক ফোঁটাও দুধ নেই তবু সে আহ্লাদ করে দুধ ধরিয়ে দেয় ছেলের মুখে। পাড়া-প্রতিবেশীর জ্বলন্ত মুখ সে চাপা দিতে পারে না। দীনবন্ধুর কানে আসে সব, তবু কঠিন কথাগুলো সে পারুলকে মুখের উপর বলতে পারে না। কেউ যদি দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়ে তৃপ্তি পায় তাহলে তার ঐ অতোটুকু আনন্দ সে কেন ছিনিয়ে নেবে? পারুল সংসারের জ্বালা ভুলেছিল দয়ালকে বুকে চেপে। দীনবন্ধু ছেলের চাঁদমুখের দিকে তাকিয়ে থাকত অপলক, আর সোৎসাহে বলত, দয়াল ঠাকুর এরে দয়া করে পাইয়ে দিয়েছে আমাদের। এর নাম দয়াল রাখা হোক।

দয়াল নামটাতেই পরমপুরুষ ঈশ্বরের দয়া-করুণা মিশে আছে। তাছাড়া ছেলেটার গায়ের বর্ণ গাওয়া ঘিয়ের মত, টানা চোখ দুটোয় কার্তিকের চোখ বসানো, কোঁকড়ানো চুলে তাকে ঠিক ঠাকুর-দেবতার মত দেখাত। দয়াল বড় হয়ে ওঠার আগেই ভীত পারুল একদিন কেঁদে-কেটে বলল, আর নয় গো, অনেক হলো—চলো আমরা এবার এখান থিকে চলে যাই। ছেলের জ্ঞানপড়ার আগে না গেলে, লোকে তার ফুলের মতো মনটাকে নষ্ট করে দেবে। পাড়া-প্রতিবেশী তো সবাই জানে—দয়াল আমাদের ছেলে নয়। এ খবরটা ছেলেটার কানে গেলে আমি আর বাঁচব না গো...

—এই ঘরবাড়ি সাজানো সন্‌সার ছেড়ে যাব কোথায়? দীনবন্ধুর দিশেহারা প্রশ্নে একটুও বিচলিতবোধ করেনি পারুল। দু-চোখে স্বপ্ন এঁকে সে বলেছিল,

এতবড় দুনিয়ায় যেখানেই হোক চলে গেলেই হলো। কে আর তুমার-আমার কথা মনে রাখবে। দিন গেলে সবাই ভুলে যাবে আমাদের। দয়ালের কথাও কারোর মনে থাকবে না।

গভীর ক্ষতচিহ্ন মুছে গেলেও এসব কথা মোছে না সহজে। ভিটেবাড়ি জমিজমা বেচে দিয়ে দীনবন্ধু পালিয়ে এসেছিল জন্মভূমি ছেড়ে। পারুল তার পাশে থাকত সবসময়, সাহস দিয়ে বলত, ভগবান সময় দিলে ওসব আবার ফিরে পাব। মাটির ধর্ম সব জায়গাতেই এক। কিন্তু দয়াল তো আমাদের একটাই। ও হারিয়ে গেলে তুমি আমাকে তা খুঁজে দিতে পারবে না।

জমি, ঘরেদোর বেচে দীনবন্ধু পালিয়ে এসেছিল জেলা ত্যাগ করে অন্য জেলায়। দয়াল ইস্কুলে ভর্তি হল। দীনবন্ধু ইস্কুলের খাতায় তার নাম লিখল : দয়াল হাজরা। পিতা শ্রীদীনবন্ধু হাজরা। দয়াল আট ক্লাস অব্দি পড়ল, সে জানত দীনবন্ধুই হল তার আসল বাবা। কিন্তু সত্যি কোনদিন গোপন থাকে না, পাপ কোনদিন বাপকেও ছাড়ে না। অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে ধরা পড়ে গেল ওরা। দয়াল কেঁদে কেটে ফিরে যেতে চাইল তার আসল ঠিকানায়। বাংলার মাস্টারমশাই কুণ্ডুবাবু তার মাথাটা খারাপ করে দিল। মাঝবয়েসী ভদ্রলোকটি দীনবন্ধুকে চিনতে কোন ভুল করেনি। তার সাথে প্রায়ই দীনবন্ধুর দেখা হোত হাটে-বাজারে। কুণ্ডু মাস্টারমশাই হোমিওপ্যাথির ডাক্তার। গরীব দুঃখীদের ওষুধ দিতেন বিনে পয়সায়। ছোটবেলায় দয়ালকে প্রায়ই দেখানোর জন্য ডাক্তারবাবুর ঘরে নিয়ে যেত দীনবন্ধু। কুণ্ডু মাস্টারমশাই ছেলেটাকে আদর করতেন খুব, হোমিওপ্যাথির মোটা বই খুলে ছেলেটাকে ওষুধ দিতেন যত্নে। তখনই সব জেনে যায় কুণ্ডু মাস্টারমশাই। দীনবন্ধু স্বপ্নেও ভাবেনি, সেই কুণ্ডু মাস্টার মশাই এক জেলা ডিঙিয়ে আরেক জেলায় ফিরে আসবেন বদলি নিয়ে।

ভগবানের মার দুনিয়ার বার। দয়াল কেঁদে কেটে জানতে চাইল তার আসল পরিচয়। দীনবন্ধু চুপ করে থাকলেও পারুল চুপ করে থাকেনি। সে তার আসল রহস্য ফাঁস করে দিল জড়তাহীন গলায়। তারপর দয়ালকে বলল, তুই যদি আমার বুকে দাগা দিয়ে চলে যেতে চাস তো চলে যা। আমি জানব—একটা গাছ লাগিয়েছিলাম, সেটা ছাগলে মুড়িয়ে খেয়ে নিয়েছে।

এত বড় পৃথিবীতে দয়ালের মত অবাঞ্ছিত ছেলেরা মাড়িয়ে যাওয়া ঘাসের চেয়েও অসহায়। চোখের জল মুছে সে বলেছিল, তুমিই আমার সত্যিকারের মা। আমি আর কোথাও যাবো না। তোমাদের কোলই হল আমার আসল ঠিকানা।

সেই দয়াল এখন পারুবুড়িকে দেখতে পারে না। ভিডিও দেখে আর মহুয়া-মদ গিলে তার মাথাটা বিগড়ে গিয়েছে একেবারে। সাধনা তার মনের আগুনে হাওয়া দেয় জোরে-জোরে, তুষের আগুন উসকে দিয়ে বলে, তুমি কেন একা খাটবা? বুড়ো-বুড়ি কি বসে বসে খাবে নাকি? ওদেরকে বলো খেটে খেতে। এই আক্রামন্দার দিনে চাল কি অত সস্তা নাকি?

বুড়ো মরল মনের দুঃখে, বুড়িটা বেঁচে আছে কোনমতে। সাধনা চায় না, বুড়িটাও বেঁচে থাকুক। পথের কাঁটা যত তাড়িতাড়ি জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে ততই তার মঙ্গল। কিন্তু মানুষ যা চায়, উপরওলা বুঝি তা চায় না। বুড়ো মারা যাবার পর দয়াল কাছা পরে বলল, বাবার শ্রাদ্ধশান্তি যে করব এতো টাকা কোথায়? তুমি তো আমার অবস্থা সব জানো মা। তোমার কাছে যদি কিছু লুকোনো থাকে তো দাও। তোমার বউমা বলছিল, তোমার নাকি দু-গাছা করে সোনার চুড়ি আছে?

পারুবুড়ি বলে, ওগুলো তোর বাবা আমাকে কিনে দিয়েছিল ধান বেচে। কত দিনকার চুড়ি। কত অভাব গেল তবু তো হাতছাড়া করিনি।

—এবার ওগুলো দাও। আমি দায় উদ্ধার হই।

চুড়ি ক-গাছা বিক্রি করেও শান্তি হয়নি দয়ালের। ওর চোখে মুখে নিষ্ঠুরতার ছায়া। কঠিন গলায় বলে, মা, আর আমি পারছি নে। এবার থিকে তুমি কিছু একটা কাজের ধান্দা করো।

—এই বুড়ো বয়সে আমি আর কী কাজ করব?

—বাবুদের দোরে কাজে লেগে যাও। খাটবে খাবে, তাতে তুমার শরীরও ভাল থাকবে। দয়াল মিহি গলায় মাকে ক্রীতদাসী বানাবার মন্ত্র শেখায়। পারু-বুড়ি সব শোনে। সে ছেলের মনে দুঃখ দিতে চায় না। অভাবের সংসারে তারও যে প্রয়োজন আছে—এটা সে ভালভাবে বুঝতে পারে। মাস গেলে ত্রিশ টাকা বেতন। পুজোর সময় একটা কালোপাড় তাঁতের শাড়ি। পুজো দেখার জন্য আরো দু-দশ টাকা। এতেও সন্তুষ্ট নয় দয়াল এবং সাধনা। বারবার খোঁচা মেরে বলে, মাত্র ত্রিশ টাকায় কি হয় মা? এ বাজারে কিছু হয় না। তুমি বরং অন্য কিছু করো।

—বুড়ো হাড়ে আমি আর কী করতে পারি? পারুবুড়ির চোখের কোণ ঝাপসা হয়ে ওঠে অভিমানে। সে নিজের চোখে দেখেছে দয়াল ভ্যান-রিকসা চালিয়ে কাঁচা মদ খায় বোতল বোতল। জুয়া খেলে হাটতলায়। সাধনার জন্য কিনে আনে ছাপা শাড়ি। অথচ মায়ের জন্য তার হাত দিয়ে জলও গলে না। বরং উল্টো কথা বলে, মা, এবছর তোমাকে আর শাড়ি দিতে পারব না পুজোয়। গেলবারের শাড়িটা তুমি সোডায় কেচে পরবে। শাড়ির পাড়ের রঙটা এখনও নতুন আছে। হাঁ করে শোনে পারুবুড়ি। সাধনা দাঁত-মুখ খেঁচিয়ে বলে, হাঁ করে শোনার তো কিছু নেই। তুমার গত বছরের শাড়িটা তো এখনও ছেঁড়েনি। ওটাই পরো। তুমাকে আর কে দেখবে এই বয়সে!

—আমাকে আর দেখার কেউ নেই, তুমি ঠিকই বলেছ বউমা। দু চোখ ছলছলিয়ে ওঠে পারুবুড়ির, সাদা থান কাপড়ে চোখের জল মুছে সে বলে, আমি মা। আমার পরনে কাপড় না থাকলেও আমি মা।

—কী আমার মা! পেটে না ধরলে কেউ মা হয় নাকি? সাধনার নরম ঠোঁট

দুটো ঘৃণায় শক্ত হয়ে ওঠে, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে তবু বুড়ির সখ গেল না। জানি না বাবা, এরা বয়সকালে কেমন ছিল।

—তুমার মত ছিলাম না। পারুবুড়ির চোখ জ্বলে ওঠে, আমাদের সময় গাছের পাতা এত হলুদ ছিল না। তুমার বাবা যা এনে দিত তাই পরতাম। আমরা কারোর কোনো জিনিস লোভের বশে কড়ে নিতাম না।

—আমি কি তুমার কিছু কেড়ে নিয়েছি নাকি?

—কেড়ে নিলেই ভালো করতে। তাহলে আমাকে আর কথা শুনতে হোত না।

সাধনার চোখে রক্ত উঠে আসে, দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলে, তাহলে সরে আসো। না কেড়েই যখন অপবাদ, তখন পরনের শাড়িটা কেড়ে নিয়েই অপবাদের ভাগীদার হই। পারুবুড়িকে আসতে হয় না সাধনার কাছে, সাধনাই খুঁট ধরে টান মারে শাড়িটায়। ফ্যারফ্যার করে খুলতে থাকে শাড়ি, বুড়িকে নাঙ্গা করে জেদের বশে শাড়িটা সে খুলেই নিত যদি না পাড়ার মহাদেব ছুটে আসত সেসময়। হাতের জড়ানো শাড়ি মেঝেতে ছুড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সাধনা। অদ্ভুত নাটকীয় একটা হাসি ঠোঁটে ছুঁইয়ে সে শুধিয়েছিল, কী ব্যাপার মহাদেবদা, ঘেমে যে একেবারে পুকুর হয়ে গেছো।

মহাদেবের গলা কাঁপছিল কথা বলতে গিয়ে, তবু সে মুখের ঘাম গামছায় মুছে নিয়ে ধীর গলায় বলেছিল, দয়ালের ভ্যানটা উল্টে গিয়েছে ম্যাটাডোরের ধাক্কায়। দয়ালের মাথা ফেটেছে, পা-টা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে একেবারে। জানে বাঁচলেও সে মনে হয় আর কোনদিন ভ্যান চালাতে পারবে না। তোমরা এক্ষুনি চলো, তারে বড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। টাকা-পয়সা যা আছে সাথে নিয়ে নাও।

সাধনার পেটে বাড়ে সাত মাসের বাচ্চা। পারুবুড়ির চিন্তায় তাই ঘুম নেই। বউটাকে সাধ খাওয়াতে হবে মনের মত করে। কিছু না হোক একটা নতুন কাপড় তাকে দিতেই হয়। শাশুড়ি তো মায়ের সমান। মায়ের কর্তব্য না করে সে থাকবে কীভাবে?

সকাল হলেই পারুবুড়ি বেরিয়ে পড়ে ভিক্ষার খোঁজে। এক হাতে টোল খাওয়া কলাইকরা থালা। অন্য হাতে কঞ্চির লাঠি। গায়ে জামা নেই। পরনের শাড়িটাও ছেঁড়াখুঁড়া। ওটার দিকে তাকান যায় না লজ্জায়। সাত গাঁ ঘুরে ভিক্ষা করে পারুবুড়ি। তার চোখে ডাঁটি ভাঙা চশমা। শ্মশানের ধারে চশমাটা কুড়িয়ে পেয়েছিল সে। যে বুড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তার ফেলে যাওয়া চশমায় পারুবুড়ি পথ হাঁটার চেষ্টা করে।

মাথার উপর খাঁ খাঁ রোদ। শরতের আকাশ এখনও বমি করে দেয় চৈত্রের রোদ। কাশফুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে ফনফনিয়ে। ওগুলো সাদা ফড়িংয়ের মত চঞ্চল, দুরন্ত। ওগুলো যেন ছোটবেলার দয়াল। লুকিয়ে আছে সাধনার গর্ভে।

তাকে আলো দেখাতে হবে...। পারুবুড়ি জোরে জোরে পথ হাঁটে। তিন গাছের ছায়া ফেলে সে আল ধরে সোজা চলে যায় বারোয়ারি তলায়। ওখানে অষ্টমী পুজোয় ঢাক বাজাচ্ছে চরণ নেচে কুঁদে। আজ বারোয়ারিতলায় বস্ত্র বিতরণ হবে। পারুবুড়ির নাম লিখে নিয়ে গেছে কমিটির লোকে।

পারুলবালা হাজরা। ডাক আসে দুপুরের পরে। একটা কালো পাড় থান কাপড় হাতে দয়ালুবাবু ডাকেন, আসো মা, আসো। এই নাও তোমার শাড়িখানা!

পারুলবালা হাজরা বাড়িয়ে দেয় তার জরাগ্রস্ত হাত। কালো পাড় শাড়িটা ছুঁয়ে আবার ফিরিয়ে দেয় সসংকোচে। কাঁপা কাঁপা গলায় মিনতি ঝরিয়ে বলে, বাবুগো, কালো পাড় নয়, আজ আমারে একটা লাল পেড়ে শাড়ি দাও। ঘরে আমার বউমা আছে, তার পরনে যে কিছু নাই। বুড়ির গলা বুজে আসে কান্নায়, কী করব বাবু, আমি বুড়ি হয়েছি, যৌবন চলে গিয়েছে শ্মশানে। এখন আমার শাড়ি না হলেও চলবে। আমাকে এখন কে দেখবে বাবু, আমি না হয় আর একটা পুজো না আসা পর্যন্ত আঁধার ঘরে থাকব। আমার তো তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে বাবু—আর তো ক'দিন পরেই বিসর্জনের বাজনা বাজাবে ঢাকি..

বুড়ি হাত পেতে নেয় লাল পেড়ে শাড়ি। ভিক্ষার চালগুলো বেচে সে কিনে আনে সাধের সামগ্রী। সাধনাকে গর্বিত গলায় বলে, বউমা, পুকুরঘাট থেকে নেয়ে আসো। আজ তুমারে সাধ খাওয়াব আমি। দয়াল হাসপাতালে আছে তো কী হলো, আমি তো এখনও মরিনি বউমা।

সাধনা গা ধুয়ে আসে পুকুর থেকে। ভেজা চুল শুকিয়ে সিঁদুর পরে লাল টকটকে। পায়ে আলতার সীমারেখা এঁকে সে চলে যায় শাড়ি বদলাতে আঁধার ঘরে। যে হাত দিয়ে সে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল বুড়ির শাড়ি, সেই হাত দিয়ে সে কোমরে জড়ায় লাল পেড়ে শাড়ি। অন্ধকারে তার দু-চোখ ভরে ওঠে জলে। অনুশোচনায় পুড়ে যেতে থাকে তার মনের ভেতর জমান পাপের গাছ শ্মশানের চিতাকাঠের মত। পরিশুদ্ধ আলোয় সে যখন বাইরে এল তখনো তার দু-চোখে অনুশোচনার বিন্দু। ভিখারী পারুবুড়ির পায়ের কাছে চকিতে বসে পড়ে সে বলল, মাগো, তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো, আমি যেন তোমার মত মা হতে পারি।

পারুবুড়ির খড়খড়ে হাত নেমে এল সাধনার মাথার উপর। বিড়বিড়িয়ে সে বলল, সুখী হও বৌমা। সংসার বড়ো সুখের জায়গা। এখানে মা হতে গেলে মাটি হতে হয় মেয়েমানুষকে। আমি জানি—তুমিও একদিন মা হবে। মাটি হবে। শক্তি দেবে অন্যকে।

পারুবুড়ির খনখনে গলা থেকে কান্নার বদলে গড়িয়ে পড়ল জোয়ার আসা আনন্দ।

# সঙ

ধুলো ওড়া দুপুরে গলগলিয়ে ঘামছিল গোবিন্দ, কানের দু'পাশ দিয়ে ঘাম নামছিল সরু ধারায়। কাঠপুলের নিচে অলস হাই তুলে আকাশমুখো চোখ মেলে শুয়েছিল নাঙাখাল। কটকটে রোদে ঘোলা জলের শরম বাঁচান দায়। এই ঘোলা জল তরুয়ার সঙ্গে বড় মিল খায়। তরুয়ার ভাব ভালবাসা জোয়ার-ভাঁটা খেলা খালের মত, গোবিন্দ যত ভাবে ততই কুঁকড়ে যায় ভয়ে।

এক হাতে তার ঠেকনী লাঠি ধরা. অন্য হাতে সঙের সাজ। চোত পরবে সঙ সাজবে সে, মনে দীর্ঘদিনের বাসনা। তরুয়া সব শুনে দাঁত টিপে হেসেছে দুয়ার গোড়ায়, যাও, যাও তোমার ক্যাদ্দানি সব জানা আছে আমার। মুখে তেল-কালি মেখে এক সের চালের যোগাড়ও তো হয় না। সঙ সাজায় ওস্তাদ হল পুবপাড়ার কেতো। ওর খাছে ধর্না দিয়ে শিখে নাও গে যাও।

তরুয়ার কথাগুলো বিষ মাখান, হাড়মাস জ্বলে, বুকের ভিতরটা পুড়ে খাক হয়ে যায়, তবু নিরুত্তর গোবিন্দ। পুবপাড়ার কেতো তার মন জুড়ে বসেছে। এখন কাদার ভেতর লুকিয়ে থাকা শিঙ্গিমাছের মত ধূর্ততার বিচরণ। গাঁয়ে-ঘরে সে মেয়ে পটানো মাস্টার, আগে বাঁশি বাজাত যাত্রাদলে, এখন টো-টো কোম্পানির সর্দার। এক মাথা চাওড় বাঁধা চুল, টানা চোখে কাজলের রেখা, মুখের মধ্যে মিশে আছে নারীসুলভ এক কমনীয়তা। এই কেতোই কাল হয়েছে এখন। তরুয়াকে সে কথার ফাঁদে লটকে হাতের মুঠোয় এনেছে, তরুয়াও কেতোর ছলাকলায় বানের জলে ভেসে যাওয়া খড়কুটো। তাকে ফেরাবে এমন শক্তি গোবিন্দর আর নেই, যদিও এক ছাদের নিচে তাদের বসবাস, এক বিছানায় গড়াগড়ি, তবু তরুয়ার হাত ধরলে মোড়া মেরে সে বলবে, ঘুমোও তো, সারাদিন খেটে-খুটে গতরে আর জোর পাইনে। তোমার আর কী, তুমি তো ধর্ম্মের ষাঁড় হয়ে ঘুরছো।

সত্যি কথায় গায়ে বড্ড জ্বালা ধরে গোবিন্দর। মুখের ওপর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া জ্বলন-কথা কেউ বলে। তরুয়া আগে বলত না, এখন বলে। তার মাথার ওপর কেতোর ছায়া, গায়ের ব্লাউজ, গলার পুঁতির মালাটাও কেতোর কিনে দেওয়া, এতসব কিছুর পরে কোন মানুষটা না ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

দেখে-শুনে মরমে জ্বলছে গোবিন্দ। খালপাড় ধরে কোনমতে সে নেমে যায় জলের কাছে, চোখে-মুখে জল দিয়ে এলিয়ে যাওয়া তালভুসের মত দম ছাড়ে, বুক হাল্কা হয়ে ভস্‌ভস্‌ করে মন, জ্বালাপোড়া কমে না, বুকের চারপাশে জমা হয় খালপাড়ের তীব্র চ্যাটচেটে কাদার চেয়েও অভিমান।

কী করেনি সে তরুয়ার জন্য। নতুন বউ সখ করে বলেছিল, চাকভাঙা মধু খাবে। শিমুলগাছের ডালে পাহাড়ি মৌমাছির বাসা। রোজ জল আনতে যাওয়ার পথে দেখত তরুয়া। ভাবত, কত না মধু আছে ওই মৌচাকে। গোবিন্দকে আবদার করে বলত, ভেঙে দাও না গো মৌচাক। আমার চাক নিঙড়ান মধু খেতে খুব মন চায়।

গোবিন্দর থতমত খাওয়া চোখ, ভয়ে ঢিসঢিসান বুক, শুকনো গলায় বলত, পাহাড়ি মৌমাছির রাগ ভীষণ। ওদের খোঁচা মেরে কি শাস্তি পাব? তোমার যখন অত মধু খাওয়ার সখ, তখন আমি তোমাকে হাট থেকে মধু কিনে দেব।

—হাটের মধুতে আখের গুড় ভেজাল দেওয়া। তুমি আমাকে কি ভেজাল মধু খাওয়াবে? আমার খাঁটি মনটাকে যদি ছুঁতে চাও তো খাঁটি মধু দাও। তারপরই খিলখিলিয়ে হেসে উঠত তরুয়া, একসময় হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে যেত সে, তুমি না পারলে পুবপাড়ার কেতো ঠিক পারবে। পাহাড়ি মৌমাছি তার কাছে গুড়ের মাছির সমান। সাহস থাকলে তবে না গাছে চড়বা?

কেতোর কাছে হারতে চায়নি গোবিন্দ। ভরদুপুরে চাক ভাঙতে গিয়ে তার বিপদ হল। ওই অতবড় শিমুলগাছ থেকে পা-হড়কে পড়ে গেল। চোখে আঁধার দেখার আগেই গোড়ালির কাছে ঠোঙা ফাটানোর শব্দ শুনল সে। চিৎ-পটাং কোলা ব্যাঙের দশা হল তার। মৌমাছির কামড় খেয়ে চোখ-মুখ ফুলল বেতো রোগীর মত। সব থেকে বড় বিপদ ঘটে গেল গোড়ালির ওপর। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার বললেন, হাড় ভেঙেছে, খুলে গিয়েছে জয়েন্ট। এখানে কিছু হবে না। যা হবার হবে সদরে।

তিনদিন গ্রামে কাটিয়ে চারদিনের মাথায় সদর হাসপাতালের মুখ দেখেছিল গোবিন্দ। তাও আবার কেতোর দয়ায়। তরুয়া তার কাছে কাঁদাকাটি করল, হাতে টাকা নেই, ওরে সদরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো। না হলে যে মানুষটা আমার মারা পড়বে।

মন গলে ছিল কেতোর। ধারদেনা করে গোবিন্দকে সদরে নিয়ে গিয়েছিল সে। বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল। বিনা চিকিৎসায় পচন ধরেছিল মাংসে। হাঁটুর চারপাশ ফুলে গিয়ে কলাগাছের গোড়া। সব চেষ্টা ব্যর্থ হল যখন তার পা-টা কেটে বাদ দিতে হল প্রাণের দায়ে। ঘরে ফিরে আসতে আরও চারমাস। ততদিনে তরুয়া চাম-এঁটুলি হয়ে সেঁটে গিয়েছে কেতোর গায়ে। হাসপাতালে যাওয়া-আসার পথে ভাব-ভালবাসা গাঢ় হয়েছে তাদের, তরুয়া টোপ গিলেছে, কেতোর হাতে হুইলের রশা।

ঘরে ফিরে এসে সাতদিনের মাথায় সব কিছু টের পেয়েছিল গোবিন্দ। কেন না তরুয়ার মুখে তখন অষ্টপ্রহর কেতোর বন্দনা, জান তো, কেতো না থাকলে আমাদের দু'জনকেই ভেসে যেতে হত। চারমাস তোমার কাজ নেই, ভ্যানরিকশ দাঁড়িয়ে আছে উঠোনে। আমি মেয়েমানুষ আর কত দিক সামলাব। গাঁয়ের কেউ

একটা ফুটো কড়ি দিয়ে পুছল না। কলিকালে তেলা মাথায় সবাই তেল দেয়। আমার শুকনো মাথায় চারমাস যে তেল নেই, এটা কেউ দেখল না।

যার দেখার সে দেখেছে। গোবিন্দ মনে মনে বলল কথাগুলো, তরুয়া ক্যাড়কেড়ে গলায় বলল, পা নেই, এখন ভ্যান চালাবা কী দিয়ে? আমি বলি কী ভ্যান-রিকশোটা বেচে দাও। ধার দেনা যা আছে সব শোধ হয়ে যাবে। অগত্যা ভ্যান বেচে দিতে বাধ্য হল গোবিন্দ। জীবন পালনের জন্য শুরু হল তার সংগ্রাম। একটা পা না থাকলে মানুষ আর কতদূর ছুটতে পারবে। কেতো তার দুর্দশা দেখে বলল, গোবিন্দদা, মনে কষ্ট পুষে রেখ না। আমি টাকা দিচ্ছি। বটতলায় একটা চায়ের দোকান কর। দোকান চালিয়ে তোমার ঘর খরচা উঠে যাবে। গোবিন্দর মনে সংশয়, সন্দেহ। কেতো চায় সে ঘর ছেড়ে বাইরে থাকুক সর্বদা। সে তরুয়াকে নিয়ে নেচে-খেলে বেড়াবে। যার একটা পা নেই, তার কি কিছু করার নেই। গোবিন্দ ভাবল, সে এ ফাঁদে আর পা দেবে না। বরং সে টালি কারখানায় কাজ করবে। দরকার হলে ঘরে বসে ঝুড়ি-কুলো বানিয়ে হাটে গিয়ে বেচবে। তবু সে স্বাধীনভাবে বাঁচবে, পরের দয়ায় বাঁচবে না।

তরুয়া তার কথা শুনতে নারাজ। মুখ ভার করে বলল, যে তোমাকে জল থেকে টেনে উঠাতে চায়, তাকেই তুমি কাদায় দেবে দিচ্ছো, এ তোমার কেমন ধারা বিচার। জান, ও না থাকলে তুমি আজ মরে-গলে ভূত হয়ে যেতে।

—তাহলে এ জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে বেঁচে যেতাম। গোবিন্দর গলা বুজে এসেছিল কষ্টে, তরুয়ার হাত ধরে শান্ত হয়ে সে বলেছিল, তুমি আমার পাশে থাকো, আমি সব ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে উঠব। পা নেই তো কী হয়েছে? তোমার তো দুটো পা আছে। আমি তোমার পা দিয়ে হাঁটব।

—কথায় চিড়ে ভেজে না গো, চিড়ে ভেজাতে গেলে জল চাই। হাতটা অবজ্ঞাভরে ছাড়িয়ে নিয়ে তরুয়া বলেছিল, ফেল কড়ি, মাখো তেলে জগত চলছে। যার কড়ি নেই, তার জন্য ধরাও নেই। এই ধরায় মেথি হল আসল কথা। মিঠে কথায় মান বাঁচে না বুঝলে। খালের জলে হাত ছুঁইয়ে গোবিন্দ তরুয়ার মুখটা মনে করার চেষ্টা করে আবার। সকালে ভিজে ভাতে পেঁয়াজ দিয়ে বিরক্তিতে গহীরা থালাটা ঠেলে দিয়েছিল সামনে, ক্যাটকেটে গলায় তরুয়া বলেছিল, এখনকার মত যা খাওয়ার খেয়ে নাও, দুপুরে কিন্তু উপোস। ঘরে চাল-নুন-তেল-মরিচ সব বাড়ন্ত। আমি রোজ রোজ লোকের দোরে হাত পাততে যেতে পারবনি।

খুব অসহায় চোখে তাকিয়ে ছিল গোবিন্দ, সারা গায়ে শুরু হয়েছিল বিচুটির জ্বলন, কোনমতে ঢোক গিলে সে বলেছিল, বিয়ে যখন করেছি, তখন দুটো ভাত তোমাকে ঠিকই আমি দিতে পারব। তুমি ভেব না, গাজনের দিনে তোমাকে আমি উপোসে রাখব।

—কী করবা শুনি? ভিক্ষে করা ছাড়া তোমার আর কোন গতি নেই। কথা

নয় যেন গরম তেল ছিটিয়ে দেওয়ার যন্ত্রণা সারা শরীরে অনুভব করল গোবিন্দ তবু সে রাগল না, মাথা ঠাণ্ডা করে উঠে গেল ঘরের ভেতর। খুঁজেপেতে বের করে আনল সঙের পোশাক। প্রতিবছর গাজনেব দিনে সে সঙ সাজে। মানুষের মনোরঞ্জন করে দু-চার টাকা দক্ষিণা পায়। দক্ষিণা বড় কথা নয়, এটা তার একটা ছোটবেলাকার সখ। গ্রামের মানুষ তার সঙ দেখবে বলে অপেক্ষা করে থাকে। একটা পা নেই বলেই কী সে মানুষগুলোকে ধোঁকা দেবে? তা হতে পারে না। ভেতরে ভেতরে গোবিন্দর রক্ত ফুটতে থাকে উত্তেজনায়। সে টান টান হয়ে দাঁড়ায়। পরচুলার ঝুল ঝেড়ে মুখে হাসি ফোটায়। গতবার সে শিব সেজেছিল। এবারও সে শিব সাজবে। গতবার সে প্লাস্টিকের সাপ গলায় জড়িয়ে ঘুরে ছিল মেলায়। এবার আর প্লাস্টিকের সাপ নয়, জ্যান্ত সাপকে গলায় জড়িয়ে ঘুরবে। তাক লাগিয়ে দেবে মানুষকে। তাক লাগিয়ে দেবে কেতো আর তরুয়াকে। ওদের শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম আদায় করে নেবে সে। ল্যাংড়া শিবের নাচ দেখিয়ে মাৎ করে দেবে সবাইকে।

মনের কথা মনে রেখে সেই কোন সকালে ঘর ছেড়েছিল গোবিন্দ। কটা গণেশের কাছে জ্যান্ত সাপের খোঁজ আছে। একটা সাপ ভাড়ায় পেলে আজ তাকে ধরে কে।

তরুয়া বলেছিল, এখন যাচ্ছো, ফিরবে কখন?

—দুপুর নাগাদ ফিরব। বিকেলে মেলায় যাব সঙ সেজে।

—ঢঙ করে আর সঙ সাজার দরকার নেই। তরুয়ার ঠোঁট বেঁকে উঠেছিল তাচ্ছিল্যে, তোমার সঙ দেখে লোক হাসে। শিব সাজতে গেলে ভুড়ি থাকার দরকার। তোমার তো ভুড়ি নেই। অমন মরা পেট নিয়ে কি আর শিব সাজা যায় গো?

—যায়, আলবাৎ যায়। গোবিন্দর কণ্ঠস্বরে বজ্রের দৃঢ়তা, মেলায় দেখো, তখন চমকে যাবে। আগাম কিছু বলছি না।

কটা গণেশের কাছে হত্যে দিয়েও জ্যান্ত সাপের দখল পেল না গোবিন্দ। কটা গণেশ মুখের ওপর বলে দিল, জ্যান্ত সাপ ভাড়া দিয়ে কি আমি ফাঁসব। ওসব হবে না বাপু। তুমি ঘর যাও। আমাকে আর জ্বালিও না।

কটা গণেশের কারবার হেলে সাপ নিয়ে নয়, ক্ষরিস সাপ নিয়ে। বিষ নিংড়ে নিলেও ক্ষরিস সাপের তেজ কমে না। কে আর নিজের বিপদ ইচ্ছে করে টেনে আনে।

মন খারাপ করে গোবিন্দ ফিরে এল খালপাড়ে। ঠেকুয়া লাঠিতে ভর দিয়ে এতটা পথ যেতে তার কম কষ্ট হয়নি। কষ্টের চেয়ে বড় কথা সে তরুয়ার কাছে কী জবাব দেবে? তরুয়ার জ্বালা ধরান কথাগুলো কি সে সহ্য করতে পারবে?

খালের জলে চোখ-মুখ ধুয়ে কাদা পায়ে পাড়ে উঠে এল গোবিন্দ। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। সপাং সপাং হাওয়া এসে তাতা ঠোঁটে চেটে দিচ্ছে শরীর। রোদের

খসখসে জিভে আঠাল হয়ে উঠছে পুরো গা-গতর। এ সময় দু-বাটি তাড়ি হলে জমত ভাল। নেশা জমলে গায়ে এত রোদ লাগত না।

খালপাড়ের এক ধারে খড়ের চালাঘর। কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা নিকোন উঠোন। গোবিন্দ আগড় সরিয়ে ঢুকে গেল তাড়ির ঠেকে। পটলার তাড়ি এ অঞ্চলে বিখ্যাত। পটলা তালগাছের গুড়ির চেয়েও কালো মিশমিশে চেহারা নিয়ে বসেছিল চটের ওপর। তাড়ির কলসীগুলো পরপর সাজান। কলসীর মুখে মাটির সরা।

দু'বাটি তাড়ি গিলে গোবিন্দ যখন ফেরার ধান্দা করছে, তখন পটলা চট ছেড়ে উঠে এল তার সামনে; হাত ধরে বলল, কী গোবিন্দ, এবার বুঝি আর সঙ সাজবানা?

—সঙই তো আমার জীবন গো! গোবিন্দ হেউ করে ঢেকুর তুলে মনমরা চোখে তাকাল, গাজনের দিনটার জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকি। এই একটা দিন তো আমার।

—তোমার যে পা নেই, এতে কোন অসুবিধা হবে না তো?

—পা নেই মানছি, কিন্তু মনটা তো আমার সেই আগের মত রয়ে গেছে।

—তা যা বলেছ, মনই হল আসল কথা! মন শক্ত তো শরীর শক্ত। মন পচল তো দেহ পচল। ম্যাড়মেড়ে হাসল পটলা, তারপর কথা ঘুরিয়ে বলল, তোমার বউটা বাপু ভারি বুদ্ধিমান। গাঁয়ে-ঘরে অমন মেয়েমানুষ মেলা ভার। ও না থাকলে তোমার যে কী হাল হোত তা ভগবানই জানে!

গোবিন্দ উষ্ণ চোখে তাকাল, আমি বউয়ের কামাই খাই না।

—তাহলে কি কেতোর কামাই খাও? ফুট করে কথাগুলো বলে পটলা গোবিন্দর মুখের দিকে তাকাল; গলা নিচু করে বলল, তোমাকে একটা কথা বলি, কেতো ছেলেটা কিন্তু ভাল নয়। ও শুধু তাড়ি খায় না, বাংলা-চোলাই সব চলে। সেদিন তাড়ি খেতে এসে তোমার সম্বন্ধে যা তা কথা বলে গেল। বলল, ও কি একটা পুরুষমানুষ নাকি, ও হল একটা হিজরে। পুরুষ হলে যুবতী বউকে ঠিক বাগে রাখত। আমার পিছু পিছু ঘুরত না বউটা!

চুল ছাপান ঘামের ধারায় ভিজে যাচ্ছিল গোবিন্দ। এমন অপমানের কথা সে এর আগে বহুবার বহুজনের মুখে শুনেছে। শোনা কথায় গা করেনি গোবিন্দ। কিন্তু এবার সে একটু নড়েচড়ে উঠল। হাতের মুঠি শক্ত করে পটলাকে বলল, আমি কাদামাছের সাথে লড়ি না। লড়তে গেলে বিষধর সাপের সঙ্গে লড়াই ভাল। ঠিক আছে ভাই চললাম। আবার দেখা হবে।

ধানমাঠ পেরলেই মাইতিদের পুকুর। পুকুরের পাড় ধরে হেঁটে গেলেই নজরে পড়বে গোবিন্দর মাটির ঘরখানা। ঘরের সামনে ছায়া বিলানো তেঁতুলগাছ। একটা ছাগল এই ভর দুপুরে তেঁতুলের পাতা কুড়িয়ে খাচ্ছিল। গোবিন্দকে আসতে দেখে ছাগলটা পালিয়ে গেল ভয়ে। দাওয়ার ওপর উঠে

এসে গোবিন্দ দেখল, শীতলপাটি বিছিয়ে ঘরের মেঝেয় শুয়ে আছে তরুয়া। ওর খোলা চুল বালিশের ওপর দিয়ে লতিয়ে গিয়েছে মাটিতে। এই গরমে গায়ে জামা রাখেনি সে, ফলে শাড়ি সরে গিয়ে ঘুমন্ত শরীরের পদ্মফুল দৃশ্যমান। নেশার ঘোরে গোবিন্দ তারিয়ে তারিয়ে দেখছিল ঘুমন্ত তরুয়ার হাতছানি দেওয়া শরীর। এই শরীরের লোভে ভাল মানুষের সঙ সেজে কেতো উড়ছে গুড়ের মাছি হয়ে। তরুয়ার চোখে সে বীর, নায়ক। স্বপ্নের পুরুষ। অথচ তরুয়া জানে না কেতোর কীর্তিকলাপ। যাত্রাসমাজে তার অনেক দুর্নাম। মেয়েছেলে কেসে বারবার সে ফেঁসেছে। চাক ভেঙে মধু খেয়ে পালিয়ে যাওয়া স্বভাব। তরুয়া জানে না, একদিন তাকেও ধোঁকা দেবে কেতো। মধু খেয়ে পালিয়ে যাবে ভ্রমর। যাত্রা সমাজে থেকে সাতঘাটের জল খেয়ে কেতো রপ্ত করেছে মেয়ে ভুলানো নজর। তরুয়া যে ভুল পথে চলছে, এ ভুল তার কে ভাঙবে। গোবিন্দ হাজার বার চেষ্টা করেও সফল হয়নি। তরুয়ার মন জুড়ে বসে আছে কার্তিক ঠাকুর। কেতো তার কাছে ঠাকুর ছাড়া আর কিছু নয়।

সেদিন জ্যোৎস্না রাতে তরুয়াকে ছুঁয়ে ছিল গোবিন্দ, তরুয়া বাধা দেয়নি, মরার মত পড়েছিল। কিন্তু গোবিন্দর যে কী হল হঠাৎ তরুয়াকে ছুঁতেই তার ঘেন্না হল! নাক টেনে শ্বাস নিতে গিয়ে সে কেতোর গন্ধ পেল তরুয়ার শরীরে। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে সে একটা বিড়ি ধরাল। ক্ষুব্ধ, অপমানিত, আশাহত তরুয়া বলেছিল, আমি জানি, তুমি আর জ্বলে উঠতে পারবে না। যে পা মাটি ছুঁয়ে থাকে, সেই পা-টাই তো তোমার নেই। তোমার তো শুধু পা ভাঙেনি, মনটাও ভেঙে গেছে। এখন তোমার ওই ভাঙা মন জড়িয়ে ধরে আমার জীবন বাঁচবে কী করে? তুমি তো সঙ সাজো, মেয়েমানুষের ঢঙ-রঙ, চোখের ভাষা কি বোঝ না? গোবিন্দ কোন উত্তর দিতে পারেনি, শুধু হাত কামড়ে বলেছে, আমি তো গাজনের দিনে সঙ সাজি, আমার সঙ সবাই বুঝতে পারে। কিন্তু যে মানুষটা বছরভর সঙ সেজে ঘুরছে, তার রঙ-ঢঙ তোমার কি চোখে পড়ে না? চোরাবালিতে পা রেখেছো ভাল কথা, কিন্তু তা বলে কি মাটির সম্পর্ক তুমি ভুলে যাবে?

—যাকে তুমি চোরাবালি বলছ, সে হল আসল মাটি আমার কাছে। তরুয়ার চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাস, বিপদের দিনে মাটিই আমাকে সাথ দেবে। সময় আসলে আমার কথাটা মিলিয়ে নিও।

গাজনের মেলা শেষে ঘর ফিরছিল গোবিন্দ। তাড়ির ঘোরে বেহেড তার শরীর। চোখ দুটো টকটকে জবা ফুলের চেয়েও লাল। মেলার মধ্যে তরুয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হল তার। তরুয়া হাসল না, কেমন নির্দয় কঠিন চোখে তাকাল। ল্যাংড়া শিবের নাচ দেখিয়ে গোবিন্দ যখন ক্লান্ত, তখনও সে তরুয়ার পাশে দেখতে পেল না কেতোকে। অথচ কত যত্ন করে সেজে মেলায় ঘুরতে এসেছে তরুয়া। গলায় পরেছে কেতোর কিনে দেওয়া পুঁতির মালা। লাল ব্লাউজের নিচে

দামি কোম্পানির ব্রা। শাঁখা ঢেকে দিয়েছে ঝলমলে কাচের চুড়ি। কে বলবে এই তরুয়া ল্যাংড়া গোবিন্দর বউ!

তরুয়ার ডাহুকপাখির চেয়েও চঞ্চল চোখ ভিড়ের মধ্যে কেতোকেই খুঁজছিল। এই বিশেষ দিনে কেতোর সান্নিধ্য পাবার জন্য তার ঘাসফড়িং মনটা বড় উন্মুখ। কেতো হল ঝড়ো পাখি, সে বাসা বাঁধতে জানে না। চরে খাওয়া যার স্বভাব, চার দেওয়াল তাকে আটকে রাখতে পারে না। সন্ধ্যা নামার আগেই তরুয়ার চোখে জল এল হুড়মুড়িয়ে। ভ্যাপসা গরমে তার প্রসাধনের চিহ্ন ধুয়ে গেল ঘামে।

এই ফাঁকে গোবিন্দ এল তার কাছে, মনের ফোসকা গেলে দিয়ে বলল, এই টাকা কটা রাখো, কিছু কিনে খেও মেলায়। আজ ঘর ফিরতে আমার দেরি হবে। মেলা দেখে তুমি গাঁয়ের কারোর সঙ্গে ফিরে যেও। আর যদি ফিরে যেতে মন না করে তাহলে যাত্রা দেখে যেও। সঙ দেখানো শেষ হলে আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

তরুয়ার কানে কোনও কথাই ঢুকল না, টাকাগুলো মুঠোর মধ্যে পুরে নিয়ে সে শুধু খুঁজতে থাকল কেতোকে। কথা দিয়েও কেতো কেন কথার দাম রাখল না, এটাই তার কেবল চিন্তা। আজ সে অপমানিত, ক্ষুব্ধ। বিশেষত গোবিন্দর কাছে তার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকল না। কেতো মেলায় না এসে তার মুখে চুন-কালি ভরে দিয়েছে। এই পোড়া মুখ সে এখন গ্রামসমাজে দেখাবে কীভাবে!

গাজনের মেলার শব্দ কানে ভাসছিল তরুয়ার। ওই শব্দযন্ত্রণা থেকে সে পালিয়ে বাঁচতে চাইল। খালপাড়ে উঠে এসে ছুটতে শুরু করল তরুয়া। চোখ ভরে জল এল। মাথা ছিঁড়ে পড়তে চাইল যন্ত্রণায়। কত আশা করে সে মেলায় গিয়েছিল, ভেবেছিল যাত্রা দেখে ফিরবে। গভীর রাতে যাত্রা দেখে ফেরার পথে কেতোর ভালবাসায় সে ডুবে যাবে। এখন ভালবাসার বদলে তার মনের ভেতর থেকে উঠে আসছে গরল। গরলে ডুবে যাচ্ছে শরীর। খালধারের নোনা হাওয়ায় তার বিন্দুমাত্র আরামবোধ হল না।

তাকে উদভ্রান্ত ফিরতে দেখে পাড়ার মিনতি বলল, বৌদি একা একা ফিরে এলে যে, শরীর বুঝি ভাল নেই?

তরুয়া কোন জবাব দিতে পারল না। মিনতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল, গোবিন্দদার সঙ বড় ভাল হয়েছে। মুখে তেল কালি মাখলে সব মানুষকে অন্যরকম দেখায়।

মিনতি চলে যাওয়ার পরও খালপাড়ে একা একা দাঁড়িয়ে থাকল তরুয়া। তার কিছু ভাল লাগছিল না। তাড়ি দোকানি পটলা তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল সামনে; ঠাট্টা করে বলল, গোবিন্দদার সঙ আজ মেলার সেরা জিনিস। মন ভরে গেল ল্যাংড়া শিবের নাচ দেখে। পটলা থামল, তরুয়াকে প্রতিক্রিয়াহীন

দেখে সে বলল, কেতোটার কোন আক্কেলজ্ঞান নেই। তাড়ি খেয়ে পয়সা না দিয়ে চলে গেল। আমাকে বলল, কাল পয়সা দেব, আজ একটু তাড়া আছে। আজ নাকি সদর থেকে যাত্রার দল এসেছে। ওর নাকি চেনা জানা। যে মেয়েটা আজ সীতার রোল করবে তার সাথে নাকি ওর খুব ওঠা-বাসা। তা বৌদি, মেয়েটাকে দেখলাম। একেবারে ডানাকাটা পরী। আমাদের কেতোর সঙ্গে মানাবে ভাল।

তরুয়ার মুখ শুকনো বালির মত রুক্ষ্ম হয়ে এল কথা শুনে। পটলা আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বলল, মেয়েটাকে নিয়ে কেতো দেখলাম খালপাড় ধরে চলে গেল। বলল, যাই দাদা, শহরের মেয়ে তো, গ্রাম দেখেনি, একটু গ্রামটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।

—ওরা কি হেঁটে-হেঁটে গেল? কোনমতে প্রশ্ন করল তরুয়া। পটলা বলল, হেঁটে যাবে কেন, মেয়েটা কেতোর সাইকেলে বসেই গেল! ক্যারিয়ার ছিল না, তাই সামনের রডে বসেই গেল। তা কী বলব বৌদি, ভগবানের দিব্যি দিয়ে বলছি—ওদের জুড়িটাকে মানাচ্ছিল ভারি চমৎকার। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।

হুড়মুড় করে নেমে আসা অন্ধকারে একলা দাঁড়িয়ে থাকল তরুয়া। পটলা তার মনে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে মেলায়। তার কথাগুলো হজম করতে না পেরে জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছিল তরুয়া। পুঁতির মালাটা চেপে বসছিল গলায়। তার এই সঙ সাজা চেহারাটা যেন ঠাট্টা করল তাকে। একরাশ হাওয়ায় এলেমেলো হয়ে গেল মাথার চুল। অন্ধকারে নিজেকে তার মনে হল অন্ধকারের মানুষ। এমন অন্ধকারের জীবন সে তো চায়নি কোনদিন। তাহলে সে কেন সঙ সেজে জীবনভর ভুলপথে হাঁটবে? সঙের রঙ উঠিয়ে ফেলবে সে। তার এই সুন্দর মুখে সে আর কোনদিন পর পুরুষের রঙ মাখবে না। কাঁপা কাঁপা পায়ে তরুয়া নেমে এল খালধারে। আঁচলে চোখের জল মুছে সে উবু হয়ে বসল জলের কাছে। জলকে শুনিয়ে বলল, আমার দোষ নিও না। সংসারে সঙ সেজে ঘুরে বেড়ানো মানুষগুলোর জন্য আমার জীবনটা আজ এত নোংরা।

জল বলল, জীবন নোংরা নয়, জীবন সুন্দর। সঙ মুছে ফেল, দেখবে নীল আকাশ কত উদার।

পুঁতির মালাটা খালের জলে ভাসিয়ে দিয়ে তরুয়া ফিরে গেল ঠেকুয়া লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটে বেড়ান সেই মানুষটার কাছে, যে চোরাবালি নয়—মাটি, তাকে আশ্রয় দেবে গভীর ভালবাসায়।

# স্নেহের নদী

বারমাস ঝগড়া করে তিলকা।

আউট হাউসের আশেপাশের কোয়ার্টারগুলোয় যারা থাকে তারা রীতিমত ভয় পায় তিলকার গলাকে। ঐ ফাটা বাঁশি গলায় মধু নয়, চলকে পড়ে বিষ। সেই বিষ বাতাসে ছড়িয়ে পড়লে দুষিত হয়ে পড়ে চারপাশ। কার কী এল গেল তা তিলকার চিন্তার কারণ নয়, ঝগড়া করার মশলা খুঁজে না পেলেই তার মাথাটা আরো বিগড়ে যায়।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়েছিল নিত্যপদর। কাল অনেক রাতে মেল ট্রেন নিয়ে ফিরেছে সে। ঠায় সাত-আট ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা মুখের কথা নয়। প্রায় সাড়ে এগারটায় খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকল। তিলকাই এগিয়ে দিল ঢাকা দেওয়া খাবারগুলো। চামড়ার মত শক্ত রুটিগুলো দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে গিয়ে ট্যারা চোখে নিত্যপদ দেখছিল তিলকাকে। এই তিলকাই তার এখানকার সর্বময় কর্ত্রী, আউট হাউসে থাকলেও সে নিত্যপদর তিনটে ঘরেই যাতায়াত করে। বাইরের ট্যাপে জল না এলে সে বাবুর বাথরুমের ট্যাপ কলটাই ব্যবহার করে। তার জন্য এ ঘরের সব কিছু ছাড় দিয়েছে নিত্যপদ।

রুটি আলুভাজা আর ছোলার ডাল খেতে খেতে নিত্যপদ আড়মোড়া ভেঙে বলেছিল, আজ আর শরীর চলছে না। গাড়িটা অনেক লেট করল নাহলে দু'ঘন্টা আগে ফিরতাম।

তিলকা সব শুনল কিন্তু রা করল না।

নিত্যপদ ডালে রুটি ভিজিয়ে বলল, তোর খাওয়া হয়েছে?

এবার ফুঁসে উঠল তিলকা। শরীরে যথাসম্ভব ঢেউ তুলে বলল, আমি খেলাম কী মরলাম সে খোঁজে তোমার কী? আমি তো তোমার ঘরের ঝি ছাড়া আর কিছু নই। তুমি বাবু, তোমার তো সাত খুন মাফ। তোমার সাথে আমার কি তুলনা চলে?

তিলকার কথাগুলোয় ঝাঁঝ ছিল কিন্তু নিত্যপদ অত্যাধিক চালাক বলেই গায়ে মাখল না কথাগুলো। আজকাল ওর কথায় অভিমান বেশি। একটু সুযোগ পেলেই মুখ ভরে কথা শুনিয়ে দেয় অথচ নিত্যপদর করারও কিছু নেই, সে তো নিজের পায়ে নিজেই জেনে-শুনে কুড়ুল মেরেছে। এখন সেই গদগুদে ঘা না শুকনো পর্যন্ত তার কোন শান্তি নেই। এদিকে তিলকাকে চটানো চলে না, ও একবার মুখ খুললে পৃথিবী ভাসিয়ে দেবে কথার তোড়ে। তখন সব জানাজানি হয়ে যাবে রেল কলোনীতে। লোক হাসবে। সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠবে কলোনী সমাজ। এন-পি-সামন্ত মানে নিত্যপদ সামন্ত তা চায় না। এই

তথাকথিত ভদ্র সমাজে তার একটা সম্মান আছে। দু-দশ জন মানী লোক তাকে মান্য করে। অ্যাসিষ্ট্যান্ট ড্রাইভাররা তাকে দেখলে সিগ্রেট লুকোয় এখনও। শুধু কলোনীতে নয়, অফিসেও তার বিরাট সম্মান, কর্তব্যপরায়ণ অভিজ্ঞ দক্ষ ড্রাইভার হিসেবে তার সুখ্যাতি আছে। তার যাবতীয় মান-সম্মান তিলকার আঁচলের গেরোয় বাঁধা। সে যদি একবার গিঁট খুলে সব আলগা করে দেয় তাহলে পুরো কলোনী জেনে যাবে মেল-ট্রেন ড্রাইভার এন-পি-সামন্তর যাবতীয় কীর্তিকলাপ। তখন এই কলোনীতে সে কি মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারবে? যারা তাকে শ্রদ্ধা করে, তারা কি আবার শ্রদ্ধার আসনে বসাবে তাকে? ডালে ভেজান রুটিটা চিবাতে গিয়ে গালটা কামড়ে ফেলেছিল নিত্যপদ। নরম মাংসে দাঁত ঢুকে গিয়ে নোনতা রক্তের স্বাদ লেগেছিল জিহ্বায়। চোখ-মুখ কুঁচকে সে আবার ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে ছিল তিলকার দিকে।

—কী হল বাবু, গালে বুঝি কামড়ে ফেলেচো? তিলকা ফিক ফিক করে হাসছিল, অনেকদিন ঘর যাওনি, বৌদি তোমার কথা ভাবচে। যাওনা ক'দিন ঘর থেকে ঘুরে আসো। বউয়ের মুখ দেখলে মন ভাল হয়ে যাবে তোমার।

—ঘর গেলে তুই কি খুশি হবি?

—আমার খুশি না-খুশিতে তোমার কী এসে যায়? তিলকা বুড়ো আঙুলের নখ দাঁত দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে তির্যক চোখে তাকিয়েছিল, বাবুদের তো সাত খুন মাফ। আমি আউট হাউসে থাকি, যত দোষ তো আমার। আমার গায়ের গন্ধ মানুষে বেশি পায়। তোমাদের দুর্গন্ধ বাংলো থেকে বেরয় না। তোমরা তো সাধু। নিত্যপদর বুঝতে বাকি থাকে না তিলকারাণীর আজ মন খারাপ, বুঝে-সুজে কথা না বললে এই রাতেই হয়ত তুলকালাম কাণ্ড বেধে যাবে। তিলকাকে বিশ্বাস নেই, ওর মাথা গরম হলে এই তীব্র শীতের রাতকে তাতিয়ে ছাড়বে।

খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়েছিল নিত্যপদ, তিলকা তাকে হাত ধরে বসাল। রাগে চোখ কপালে তুলে বলল, সবগুলো রুটি না খেয়ে উঠে যাচ্ছো যে! ঝাল লেগেছে বুঝি? বলি, তোমার এত ঝাল কিসের? আমি মেয়েমানুষ হয়ে যেটুকু সাহস ধরি, তুমি পুরুষ হয়ে তা পার না কেন?

—তোর মত সবাই যদি সাহসী হোত তাহলে আর কথাই ছিল না। নিত্যপদর কণ্ঠস্বরে পরাজয়ের চিহ্ন, হাতটা ছাড়িয়ে নেবার সাহস হয় না। তিলকা শক্ত করে ধরে থাকে তার হাত। এক সময় হাত ধরেই পাতের গোড়ায় জোর করে বসিয়ে দেয় নিত্যপদকে, খেয়ে নাও বলছি নাহলে কিন্তু খুব খারাপ হবে। বাবু, তুমি তো জান আমার রাগ কেমন! মাথা তেতে গেলে আমি আমার বাপকেও ছাড়ব না।

বসতে বাধ্য হল নিত্যপদ, ফেলে রাখা রুটি দুটো সে আবার চিবিয়ে খেল ধীরে ধীরে। খাওয়া শেষ হতেই তিলকা বলল, বড় স্বার্থপর তুমি। একা সব খেয়ে নিলে, আমার জন্য প্রসাদ রাখলে না তো!

রোজই নিত্যপদর এঁটো খাবার চেটে পুটে খায় তিলকা, তার ধারণা বাবুর এঁটো খেলে পুণ্যি হয়। বাবুর এঁটো নয় যেন ঠাকুরের প্রসাদ।

—ভুল হয়ে গিয়েছে। নিত্যপদর মুখ গোরু চোরের মতন, বাটিতে ডাল আছে, এটুকু তুই খেয়ে নে।

—সে আর তোমাকে বলতে হবে না।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে রাত এগিয়ে গিয়েছিল অনেকদূর। বাড়ির সামনের বটগাছটায় শীতের হাওয়া আছাড় দিয়ে কাঁদছিল। নিত্যপদ সিগ্রেট ধরিয়ে তাকিয়েছিল সেইদিকে। কুয়াশারা ঘন হয়ে নামছিল পৃথিবীতে, বটের পুরুপাতা জ্যোৎস্নার আলো মেখে চকচকিয়ে উঠেছিল তেল-ঘাম প্রতিমার মতো। এঁটো কাঁটা গুছিয়ে গুটি গুটি পায়ে তিলকা তার পাশে এসে দাঁড়াল।

—বাবু।

যেন কোন অতলে তলিয়ে গিয়েছিল নিত্যপদ, জানলার শিক ধরে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। তিলকা নতমুখে অস্পষ্ট স্বরে বলল, আমার এই মুখটাকে তুমি কেন, আমার ঘরের লোকটাও ভয় পায়। মানছি আমার মুখটা খারাপ। কিন্তু বাবু, এই মুখটাই কি মানুষের সব। আমার ভেতরে যে মনটা আছে তাকে কই তুমি একদিন ছুঁয়ে দেখলে না। কই আমার দুঃখটাকে তুমি কোনদিন নিজের দুঃখ বলে মেনে নিলে না।

—এসব কথা কেন? নিত্যপদ এড়িয়ে যেতে চাইছিল প্রসঙ্গ, হাই তুলে বলল, আজ খুব শীত পড়েছে। দেখ, বাইরে কেমন চাঙড় বাঁধা কুয়াশা। তুই ঘর যা, আমি একটু ঘুমোব।

—ঘুমোও না কেন, কে তোমাকে ঘুমাতে মানা করেছে। অভিমানে আধোমুখ হল তিলকা; নীচু গলায় বলল, তুমি ঘুমোও, আমি তোমার গা-হাত-পা টিপে দিই। তুমি ঘুমিয়ে পড়লে আমি চলে যাব।

—নারাণ কি জেগে আছে? প্রশ্ন শুনে কিছুটা ছিটকে গেল তিলকা, চোখে মুখে অদ্ভুত এক ক্রূরতা ফুটিয়ে বলল, তার এখন মাঝ রাত। ভর পেট মদ গিলে এসে সেই যে খাটিয়া পেতে শুয়েছে—সকাল ন'টা না বাজলে তার ঘুম ভাঙবে না। যদি সে জেগে থাকত তাহলে কি আমি আসতে পারতাম। মানুষটার মনে খুব হিংসে, খেতে দিতে পারে না অথচ কারোর সাথে দুটো কথা বলতে দেখলেই তার বুক ফেটে যায়।

চুপ করে থেকে নিত্যপদ আবার তিলকার মুখের দিকে তাকাল। তিন সন্তানের জননী হলেও তিলকার শরীরের বাঁধন এখনও হারায়নি। কালো ছিপছিপে চেহারা তবু ঐ চেহারায় সাপের মসৃণতা। খোপা বাঁধা একমাথা চুল, কানের কাছে দোল খাওয়া ঝুমকো দুল ইলেকট্রিক আলোয় ঝকমকিয়ে ওঠে। তার দাঁড়িয়ে থাকার ধরণটা নিত্যপদর বড় পছন্দ। দু-পাশ চাপা মুখটায় ছায়া পড়েছে টিকাল নাক আর টানা ভ্রু'র। সুচলো চিবুকের মধ্যভাগে যে তিলটা

আছে তা তিলকার যাবতীয় সৌন্দর্য্যের মধ্যমণি। নিত্যপদ ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে তিলকার শরীর যেন তাকে আগুনের দিকে ধাবমান পোকার মত টানছে। অসহায় ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে নিত্যপদ ঢোক গিলল, আমি এবার ঘুমোব। সারাদিন বড় ধকল গেল।

—তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্চো। ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্চি। আর কোনদিন তোমার ঘরে ঢুকব না। শাড়ি গুছিয়ে নিয়ে তিলকা আর দাঁড়াল না, দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে। দরজাটা সে এত জোরে ভেজিয়ে দিল, যার শব্দে বেড়ালের থাবার নীচে ইঁদুরের মত কেঁপে উঠল নিত্যপদ।

সকাল আটটার পরেও ঘুম ভাঙ্গত না তার যদি না তিলকার কণ্ঠস্বর পাখ-পাখালির চিৎকার ছাপিয়ে তার কর্ণমূলে যন্ত্রণার সৃষ্টি করত। তিলকা বুড়ো বটের তলায় বসে গাল পাড়ছিল তার স্বামীকে।

—ঘরে চাল নেই, বাবু সকালে উঠেই মদ মেরে এল। এমন সোয়ামী থাকার চাইতে না থাকাই ঢের ভাল।

নারাণ আউট হাউসের সিমেন্ট চটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে সব শুনছিল, মুখে বিড়ি, চোখে রসিকতার হাসি। তিনটে ছেলে-মেয়ে শালিকের মত চরছিল তার আশেপাশে। বড়টার নাম ফুকাই। সে তাতিয়ে দেবার জন্য বলল, বাবা, মা তোমাকে গাল পাড়ছে।

—ওর মুখে আমি সিমেন্ট ঘষে দেব। নারণ উত্তেজিত হয়ে বলল, বড় তেজ তোর। তোর তেজে আমি ইয়ে করি।

এবার বটতলা থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে এল তিলকা, হাত-পা ছুঁড়ে সে চিৎকারে দশদিক ফাটিয়ে বলল, মরতে পার না, কেন জ্বালাচ্চো আমাকে। ভাত দেবার মুরোদ নেই, কথা শোনাবার রাজা।

নারাণ ঘুষি পাকিয়ে ছুটে গেল তিলকার দিকে, তবে রে আজ তোর মুখ দিয়ে আমি রক্ত উঠিয়ে ছাড়ব। তুই কি ভাবিস—আমি ভেড়া?

—ভেড়া হলেও তো লোকে মাংস কেটে খেত। তিলকার নির্মম কথাগুলো মাথায় রক্ত চড়িয়ে দেয় নারাণের। সে আর নিজের ক্রোধকে সংযত করতে পারে না। চুলের মুঠি ধরে তিলকাকে ফেলে দিল পাথুরে মাটিতে, বুকের উপর চেপে বসে বলল, আমি খেতে দিই না তো কি তোর আর একটা ভাতার আছে-সে খেতে দেয়? বল হারামজাদী, আজ বলতেই হবে।

নারাণের ঘুষির বৃষ্টিতে তিলকার ঠোঁট ফেটে রক্ত চুঁয়াল। ভুরু কাছটা ফুলে উঠল সুপারির মত। পড়ে পড়ে মার খেল তিলকা তবু মুখ ফুটিয়ে সে কোন শব্দ উচ্চারণ করল না।

নিত্যপদ ভয়ে জমে গিয়েছিল কিছু দূরে দাঁড়িয়ে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় নাক গলানো উচিত নয় ভেবে তার ভূমিকা অনেকটা গাছের মত নিশ্চল। নারাণ বীরবিক্রমে চলে যাবার পরই বড় বড় শ্বাস নিল সে। তবু ভয়ের ঢেলাটা

কিছুতেই নামছিল না বুক থেকে। তিলকা বেদম মার খেয়েও তার নাম করেনি। ভগবানকে ধন্যবাদ, আজও তার মুখ বাঁচল।

নারাণ চলে যাবার পরেই গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল তিলকা, যেন তার কিছু হয়নি এমন মুখ করে নিত্যপদর মুখের দিকে তাকাল। নিত্যপদর সংকোচ হচ্ছিল তার দিকে তাকাতে, তার শিক্ষিত বিবেক বারবার করে বলছিল, আজকের এই ঘটনার জন্য তুমি দায়ী হে নিত্যপদ।

তিলকার মনে ভাবনা চিন্তার কালো ছায়া অতি দ্রুত মিলিয়ে যায়; সে ঠোঁটের রক্ত মুছে নিয়ে বলল, বাবু, তোমার ঘরে লাল ওষুধ আছে, আমাকে একটু তুলোয় ভিজিয়ে দাও না? মাতাল আজকে আরো মাতাল হল। নিজের চোখে তো সব দেখলে। ওর মনে পাপ ঢুকেছে, বাবু। ওকে সন্দেহের পোকাটা কুরে কুরে খাচ্ছে। ও বাঁচবে না। তুমি দেখো বাবু, ও ঠিক মরবে। ওর দিন ঘনিয়ে এসেছে। হাঁ-করে তিলকার কথাগুলো গিলছিল নিত্যপদ, নিজেকে তার অপরাধী মনে হচ্ছিল নানা কারণে। তিলকার আজকের এই চরম পরিণতির জন্য সে তো অনেকাংশে দায়ী। ঘর ছেড়ে আসার পর এত বড় কোয়ার্টারে সব সময় ফাঁকা লাগত নিত্যপদর। আরতি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গ্রামে থাকে, এখানে এলে ওদের পড়াশুনার প্রভূত ক্ষতি। তাই ইচ্ছে থাকলেও আরতি এখানে আসতে পারে না। এদিকে চাকরির যা ঝামেলা তারও যাওয়া হয়ে ওঠে না। একা মানুষ, রান্না করে খাওয়াও মুশকিল, ডিউটি থেকে ফিরে প্রায় দিন তার খাওয়া জুটত না। ঘরে সব কিছু থাকত তবু রাঁধতে মন হত না। শরীর অবসাদ-ক্লান্তিতে ঝিমোতে। এই ভাবেই বছরগুলো গড়িয়ে যাচ্ছিল, আর নিত্যপদ ক্রমশ বার্দ্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল দৈনন্দিন অনিয়মে। ষ্টেশনে একদিন নারাণের সঙ্গে পরিচয় হল তার। বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে সে খুব সমস্যায় পড়েছে, মাথা গোঁজার আশ্রয় নেই তার। নারাণের দুর্দশার কথা শুনে নিত্যপদই আগ বাড়িয়ে বলেছিল, আমার আউট হাউসে তুমি থাকতে পারো; তবে বেশী দিন রাখতে পারব না, ঘর খুঁজে নিয়ে চলে যেও। সেই যে নারাণ এসে উঠল, সাত বছর কোথা দিয়ে চলে গেল টের পায়নি নিত্যপদ। তিলকা প্রথম থেকেই পরোপকারী মহিলা। নিত্যপদকে সে আগে যমের মত ভয় করত। চোখে চোখ ফেলে কথা বলার সাহস হোত না তার। তাছাড়া অভাব তাকে পঙ্গু করে রেখেছিল সব সময়। এক হাত ঘোমটা টেনে তিলকা সংসারের কাজকর্ম করত, সারাদিন তার বিশ্রাম ছিল না। নারাণ ষ্টেশনের কুলি, তার সামান্য আয়ে সংসার চলত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তখন অভাব ছিল ওদের, অভাব থাকলেও শান্তি ছিল যথেষ্ট। সারাদিন খেটে খুটে এলে নারাণের গা-হাত-পা দাবিয়ে দিত সে। এক খাটিয়ায় শুয়ে কত হাসি-ঠাট্টার কথা বলত ওরা। পিছনের দিকের জানালা খুললেই সব দেখতে পেত নিত্যপদ। যে জীবন সে ফেলে এসেছে, সেই জীবনের ছবি তাকে অতিষ্ঠ করে তুলত। তিলকার তখন ঘষা-মাজা শরীর, তার শ্যামলা

মুখশ্রীর সঙ্গে আরতির মুখের অদ্ভুত মিল ছিল। সে যখন বটতলা দিয়ে সামনের কলটাতে জল আনতে যেত তখন তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকত নিত্যপদ। চোখের পাতা পড়ত না, এমন তার দৃষ্টি। এক বর্ষার সন্ধ্যায় নারাণ এল হাঁপাতে হাঁপাতে, সারাদিন ষ্টেশনে ঘুরেও এক পয়সা কামাই হয়নি তার। পরিশ্রান্ত, চিন্তাগ্রস্থ, গোঁফ-দাড়ি ভর্তি মুখ ভিজে চুপসে গিয়েছে জলে। লম্বা শরীরটা ক্ষিদের যন্ত্রণায় নুয়ে পড়েছে অনেকটা।

নারাণ এসে চৌকাঠের ওপাশে বসল। সেদিন নিত্যপদর ডিউটি ছিল না, রাত তিনটেয় কলবুক এলে সে যাবে, তাই বিশ্রাম নিচ্ছিল গদী দেওয়া পালঙ্কে শুয়ে। নারাণের পায়ের শব্দে নিত্যপদ দরজার কাছে উঠে এল, কী ব্যাপার নারাণ, এই সন্ধেবেলায় তোমার কী হল?

—বাবু, বড় ঠেকায় পড়ে এসেছি। নারাণ কাচুমাচু মুখে বলল, টগরটার সাতদিন হল জ্বর ছাড়ছে না। ডাক্তার দেখাব তেমন পয়সাও নেই। আজ সারাদিন দুটো টাকাও কামাতে পারিনি।

—তোমার কি টাকার দরকার?

—হ্যাঁ, বাবু। গোটা পঞ্চাশেক টাকা আপনি ধার দিন। আমি ধীরে ধীরে শোধ দিয়ে দেব।

—ঠিক আছে, নিয়ে যাও। তবে মনে করে শোধ দিও কিন্তু।

টাকাটা নিয়ে নারণ চলে যাচ্ছিল, নিত্যপদর মনে তখন বদ চিন্তা। নারাণকে ডেকে মিষ্টি গলায় বলল, তিন মাসের মধ্যে আউট হাউস ছেড়ে দেবে বলেছিলে তার কী হল?

শুকনো পাতার চেয়েও খসখসে মুখ করে জোড়হাতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল নারাণ, চোখে মুখে দীনতা ফুটিয়ে বলেছিল, আর দুটো মাস সময় দিন, তারপর ঘর দেখে আমি উঠে যাব।

—আমি উঠে যেতে বলছি না, তবে—। একটু থেমে নিত্যপদ ঢোক গিলে বলেছিল, আমি তোমাদের দেখছি, তোমরা কি আমাকে দেখবে না?

—আপনাকে ভগবান দেখবে, বাবু।

—ভগবান তো আমার রান্না করে দেবে না। আমার বয়স হচ্ছে, হোটেলে খাই আর পেটের রোগে ভুগি। তোমার বউ কি আমার দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে পারে না? নিত্যপদ মোলায়েম স্বরে বলেছিল, আমার রাঁধাবাড়া করে দিলে মাসে মাসে ওকে আমি পঞ্চাশ টাকা দেব। তোমার আউট হাউসে থাকাটাও ফ্রি—

পরদিন সকাল থেকেই তিলকা এসেছিল রাঁধতে। সেদিন থেকেই তিলকা অলিখিতভাবে নিত্যপদর হয়ে গেল। তারপর থেকে তিলকাকে একবেলা না দেখলে ছটফট করত নিত্যপদ, ছুতোনাতায় সে তাকে ডাকত শোওয়ার ঘরে। একদিন দুপুরে তিলকার দখল নিল সে।

কাঁদতে কাঁদতে তিলকা যখন খাট থেকে নেমে গেল, নিত্যপদ তখন তার অভাবী হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল একটা শ'টাকার নোট। তিলকা টাকাটা নেয়নি, ঘৃণা ভরে বলেছিল, টাকার জন্য নয় বাবু, তুমি আমার দায়ে-অদায়ে পাশে দাঁড়িয়েছ আমার তো দেবার কিছু নেই তাই নিজেকে দিয়ে তোমার ঋণ শোধ করলাম। আমার ঘরের মানুষটা যদি জানতে পারে আমি নষ্ট হয়েছি, তাহলে সে আর বাঁচবে না।

—তুই নষ্ট হোসনি তিলকা। তোকে আমি যেদিন প্রথম দেখি, সেদিন থেকে তুই আমার মনে জুড়ে আছিস। তোর দিদি গ্রামে থাকে, সে এখানে আসতে চায় না। সে যদি আসত তাহলে তোকে আমি আমার মনে জায়গা দিতাম না।

—আমি তোম্যর জ্বালাটা বুঝি। তোমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলেও এমন অঘটন ঘটত।

তিলকা চলে যাওয়া পরও নিত্যপদ মানসিক শান্তি পায় নি। আরতি তাকে অলক্ষ্যে থেকে শাসন করেছে, ছিঃ ছিঃ, এ কী করলে তুমি! এইভাবে হেরে গেলে? এভাবে নিজের মুখে কালি মাখলে? তোমার ছেলে-মেয়ে বড় হয়েছে, তারা জানলে তোমাকে কোনদিনও ক্ষমা করবে না।

কেউ তাকে ক্ষমা করবে না—এ বিষয়ে নিত্যপদ নিশ্চিত। পাপের ভাগীদার কেউ হয় না। দস্যু রত্নাকরের গল্পটা সে তো শুনে আসছে ছোটবেলা থেকে। তিলকার গর্ভবতী হওয়ার সংবাদ শুনে সে বিচলিত বোধ করেছিল সাময়িক। পরে তা কাটিয়ে ওঠে।

তিলকা বলেছিল, ভয় পেও না বাবু। অমি মরে গেলেও কারোর কাছে তোমার নাম ফাঁস করব না। তবে তোমার সন্তান যাতে মানুষ হয় সেই চেষ্টা করো। আমাদের অভাবের সংসার, সময় মত খেতে-পরতে দিতে পারব না। তাই একটু খেয়াল রেখো।

তিলকার ছোট ছেলে বই-শ্লেট নিয়ে ইস্কুলে যায়, তার দিকে হাঁ-করে তাকিয়ে থাকে নিত্যপদ। অবিকল তারই মত দেখতে হয়েচে ছেলেটা। তিলকা সাধ করে নাম রেখেছে, নিতাই।

নিত্যপদ যখন ঘরে থাকে তখন নিতাইকে ডেকে আনে প্রায়। আদর করে চকলেট দেয়, কখনও দু-চারটে টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, দোকান থেকে কিছু কিনে খাস।

তিলকা কাছে থাকলে প্রতিবাদ করে বলবে, ওর হাতে পয়সা দেবে না বাবু, পয়সা দিলে বাচ্চারা নষ্ট হয়ে যায়।

নিতাই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে।

—বড় হয়ে তুই কী হবি বাবা? যদি তিলকা এমন প্রশ্ন শুধায় তাহলে নিতাই সহজ সরলভাবে জবাব দেয়, আমি জ্যাঠার মত টেরেণ গাড়ি চালাব মা। টেরেণ গাড়ি চাপতে আমার খুব ভাললাগে।

নারাণের হাতে বেদম মার খাওয়ার পরেও রাঁধা-বাড়ার কাজ সেরে আউট হাউসে ফিরে গেল তিলকা। ঘরে চাল নেই। নিত্যপদ ওর হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলল, দোকান থেকে চাল কিনে নিস। আর শোন, আমি যে টাকা দিলাম নারাণ যেন না জানে। আজকাল দেখেছি ও আমাকে একদম সহ্য করতে পারে না। সেদিন বলছিল, আউটহাউস ছেড়ে চলে যাবে। নিতাই কী দোষ করেছিল—ওকে খুব মারল।

—নিতাইকে ও খুব মারে। মুখ ফসকে কথাগুলো বেরিয়ে গেল তিলকার। হাতের ঢিল ছুঁড়ে দেওয়ার মত আফশোস হল তার, মারবে না কেন, ছেলেটাও বড় দুরন্ত। মোটেও কথা শোনে না। সব সময় বটতলায় গায়ে ধুলো মেখে খেলছে। কত মানা করি তবু শোনে না।

—তা বলে অমন গোরুর মত মারবে?

—ছেলে তো তোমার নয়, তার। মারল তো তোমার কী?

—এ কথা বলতে পারলি? নিত্যপদর ভেঁটুল চোখে ব্যথার ছায়া, তিলকা সেই ব্যাথাহত চোখকে উপেক্ষা করে বলল, নিতাইটা মরে গেলেই আমার শান্তি। ও যত বড় হচ্ছে ততই আমি সবার চোখে ধরা পড়ে যাচ্ছি। বাবু গো, তোমার মুখের আদলটা যে পুরো ওর মুখে বসানো। কলে জল আনতে গেলে সবাই আমার দিকে কেমন চোখে তাকায়। ওদের চাহুনি আমি সহ্য করতে পারি না। ঘরের লোকটাও সন্দেহ করে সব সময়। প্রায় রাতেই ঝগড়া-কাজিয়া করে বলে, তুই আর বাবুর ঘরে ঝিগিরি করতে যাবি না। বাবুর চোখ দুটোয় বড় পাপ আছে। আমি একটা ঝুপড়ি পেলে এই নরক থেকে পালিয়ে বাঁচতাম।

—নারাণকে তুই বোঝা।

—কত বুঝিয়েছি। বোঝালে ও বুঝবে কেন? ওতো অন্ধ নয়। সব দেখতে পায়, শুনতে পায়। আমি কার মুখ চাপা দেব।

একটা ভয় নিত্যপদর বুকের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এই ভয়টাই আজকাল তাকে একদম স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। তিলকা এবং নিতাইয়ের মুখটা সর্বদা তার মনে পড়ে। ইঞ্জিনে থাকলেও ওই মুখ দুটি তার পিছু পিছু ধাওয়া করে, এদের সে কিছুতেই লুকিয়ে রাখতে পারে না। লুকোতে গেলেই সব কিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠে চোখের সামনে। নারাণের মেজাজ ইদানীং অসহ্য লাগছে নিত্যপদর কাছে তবে কি নারাণ তাকে ব্লাক-মেল করতে চায়? ও কি গোপন এই সম্পর্কের কথা জেনে গিয়েছে? কলোনীর মানুষ সন্দেহ জ্বরে ভোগে বেশী। ওরা নিত্যপদর দিকে কেমন একটা চোখে তাকায়। কী দেখে অমন করে? উদ্‌ভ্রান্ত ভাবনারা ক্রমশ কোনঠাসা করে তোলে তাকে। সে পালিয়ে বাঁচতে চায় কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়? সন্ধের পরে আবার তিলকা এল, মনমরা গলায় বলল, বাবু, আজও নিতাইয়ের বাবা মদ গিলে এসেছে ঘরে, আমি টিকতে পারলাম না ওর জ্বালায়। আমার আর

নিতাইয়ের মরণ না হলে ওর শাস্তি হবে না। এখন কী করি বাবু, আমার মাথায় কিছু আসছে না।

নিত্যপদর স্নায়ুগুলো টানটান হয়ে উঠল নিমেষে, হাতের পেশী শক্ত করে বলল, ওকে ঘাড় ধরে আউট হাউস থেকে বের করে দে। কী ভেবেছে ও। ভদ্র সমাজে থেকে  অভদ্রতা করবে, এ হতে পারে না।

চোখে জল নিয়ে প্রতিক্রিয়াহীন দাঁড়িয়ে থাকল তিলকা, ঠোঁট নড়ছিল অসহায় ভাবে। তার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল নিত্যপদ, গলা কাঁপিয়ে বলল, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে শয়তানটা আরো মাথায় উঠবে। ফণা তোলার আগে ওর মাথা নীচু করে দে।

—আমি পারবো না বাবু, ও বড় সেয়ানা মানুষ।

—সেয়ানা মানুষের ওষুধ আমি জানি। তুই চল। নিত্যপদ ঘরের বাইরে এল কাঁপতে কাঁপতে। তিলকা তার মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকাল, ওখানে ঐ নরকে গিয়ে তোমার কাজ নেই বাবু। আমার ঘা তুমি আমাকেই শুকোতে দাও। নেশাখোর মানুষের মুখকে তুমি ভয় না করলেও আমি করি। মাতাল হলে ওদের মুখ দিয়ে সত্যি কথাটা বেরিয়ে আসে। তুমি তো সত্যিটাকে ভয় পাও, লুকোতে চাও। তাই বলছি—তোমার আর ওখানে গিয়ে কাজ নেই, ওর কাছে গেলে ও হাটের মাঝখানে হাঁড়ি ভেঙে দেবে। তোমার মুখে চুন-কালি পড়বে। তুমি আর কলোনীতে মুখ দেখাতে পারবে না।

নিত্যপদ ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাওয়া বেরনো বেলুনের মত মুখ করে দাঁড়াল। তিলকা অধোমুখ করে বলল, কতদিন ভেবেছি ওকে আমি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলব। কিন্তু তা আর পারিনি বাবু। ওর সিঁদুর যে আমার সিঁথিতে। তুমি আমাকে সব দিয়েছ, কিন্তু পায়ের তলার মাটিটুকু দাওনি। ঐ মাতাল আমাকে সময়মত খেতে পরতে না দিলেও ঐ সুখ টুকু দিয়েছে। ওর ভালবাসাটুকু না পেলে আমি যে পাগল হয়ে যেতাম বাবু।

তিলকা চলে যাবার পরও স্বাভাবিক হতে পারল না নিত্যপদ। বটগাছের মগডালে বসে একটা শকুন চিৎকার করে ডাকছিল। শকুনটার কদর্য কণ্ঠস্বর নারাণের গলার স্বরের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। শকুনটাকে কত দিন সে ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে কিন্তু সফল হয়নি। তাড়িয়ে দিলেও পাখিটা আবার উড়ে এসেছে। গাছটা যতদিন বাঁচবে, শকুনটা হয়ত উড়ে যাবে না। এমন স্থায়ী আশ্রয় সে কোথায় পাবে?

নিত্যপদ ভাবল, নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখতে গেলে তাকে এ বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে। এছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই। পর মুহূর্তে সে ভাবল, এভাবে ভীতুর মত পালিয়ে গেলে তার নিজেরই ক্ষতি। সে কেন পালাবে? আউট হাউস থেকে নারাণকে উঠিয়ে দিলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। শুধু তিলকা একটু দুঃখ পাবে। তা পাক। সবকিছু দিয়েও সে তিলকার

মনে স্থান পায়নি। তিলকার কাছে নারাণ-ই সব। তার বড় সিঁদুরের গর্ব। ছোট-লোকদের ছোটকথাকে সে আর পাত্তা দেবে না। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে দু-চোখ অসাড় বুজে শুয়ে থাকল সে। কপালটা ভার হয়ে আছে সেই কখন থেকে। তিলকাকে ডাকলে ও সব কাজ ফেলে কপাল টিপে দেবে, অমৃতাঞ্জন ঘষে দেবে। কিন্তু না, আর নয়। অনেক হয়েছে। এবার নিজেকে গুটিয়ে নেবার পালা। শমুকের মত শক্ত মোড়কে সে এবার থেকে নিজেকে ঢেকে রাখবে। আর কোন দুর্বলতা নয় তিলকার উপর। আরতিকে সে ফাঁকি দেবে না। এবার প্রতি মাসেই সে বাড়ি যাবে। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কতদিন ভালভাবে মেশেনি সে। তিলকা তাকে অন্ধ করে রেখেছিল।

দরজা ঠেলে হাওয়া ঢুকে আসার মত ঘরে ঢুকে এল নিতাই। ওর হাতে বই-শ্লেট। রোজ যেমন পড়তে আসে তেমনই এসেছে সে।

—জেঠু।

চমকে উঠল নিত্যপদ। ইলেকট্রিকের আলোয় সে নিতাইকে দেখল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। গোলগাল মুখ। টানা চোখ, টিকাল নাক। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মাথার চুল, মুখের হাসি, চিবুকের কাছটা সব যেন নিত্যপদর।

নিতাইকে আদর করতে গিয়ে ভয়ে পিছিয়ে এল সে। এই আদল তার ছোট বেলার। তাহলে কি তার ছোটবেলা চুরি হয়ে গেছে? সে জানত ছোটবেলা হারিয়ে গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না। নিতাই তার ছোটবেলা ফিরিয়ে দিয়েছে তবু একটা বুনো ক্রোধ চাড়া দিয়ে উঠছিল নিত্যপদর ভেতরে। সে যেন আয়নায় নিজের ক্ষত চিহ্ন দেখে চমকে উঠছে ভয়ে।

—জেঠু, তুমি আমাকে নাম লেখা শিখিয়ে দাও না। নিতাইয়ের কচি গলা যেন বিষ ঢেলে দেয় নিত্যপদর কানে। হাঁপাতে-হাঁপাতে সে নিতাইয়ের মুখোমুখি দাঁড়াল। শক্ত দু-হাত স্পর্শ করল তার গলা। কড়া পড়া বলিষ্ঠ দু-হাত ধীরে ধীরে চেপে বসেছিল নিতাইয়ের গলায়।

—আঃ জেঠু, আমার লাগছে! নিতাই ছটফটিয়ে উঠল যন্ত্রনায়। তার আর্তচিৎকার শুনে চিল শরীর নিয়ে আউট হাউস থেকে ছুটে এল তিলকা। অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে সে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল তারপর ছুটে গিয়ে সজোরে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিল নিত্যপদকে। এতক্ষণ সে আততায়ী ঘোরের মধ্যে ছিল, হাত আলগা হতেই ঐ লৌহ কঠিন হাত দুটোর দিকে বার বার তাকাল নিত্যপদ। তিলকার কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ল ধিক্কার, একী করছিলে বাবু, আর একটু হলে ছেলেটা যে আমার মারা পড়ত!

—ওকে আমি শেষ করে দেব। তুই ওকে আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যা। নিত্যপদ ক্রুদ্ধ পশুর ঢঙে তাকাল, ও না মরলে আমার যে শান্তি নেই। আমার আদল নিয়ে নারাণ মণ্ডলের ছেলে বেঁচে থাকবে—তা হয় না তিলকা।

দু-হাতে মুখ ঢেকে গভীর অনুশোচনায় ডুবে গেল নিত্যপদ।

তিলকা তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। পরম মমতায় বলল, তোমার দুঃখটা আমি বুঝি, বাবু। তবু বলি, তুমি তো মাছ নও যে নিজের পোনাকে নিজেই খেয়ে নেবে?

—তুই ওকে আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যা। এখানে আসবি না, বল কোনদিনও আসবি না।

—কাল রাত পোহালেই আমরা চলে যাচ্চি বাবু। নিতাইয়ের বাপ একটা ঝুপড়ি দেখে এসেছে, মাত্র চল্লিশ টাকা ভাড়া। তিলকা কিছুক্ষণের জন্য থামল, তারপর নিতাইয়ের হাত ধরে বলল, চল বাবা, এই অন্ধ মানুষটার কাছে আর পড়ালেখা শিখে লাভ নেই। যে মানুষ নিজেকে ভয় পায়, তার মত ভীতু মানুষ দুনিয়ায় আর কেউ নেই।

ওরা চলে যাবার পরও অন্ধকারের দিকে মুখ করে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকল নিত্যপদ। শকুনটা ডাকতে ডাকতে চুপ করে গিয়েছে। এখন চরাচর শান্ত তবু ঝড় বয়ে যাচ্ছে নিত্যপদর বুকের ভেতরে। এই ঝড় সে কীভাবে থামাবে, কীভাবে?

রাত গভীর হলে এই প্রথম নিত্যপদ আউট হাউসের দরজায় গিয়ে টোকা মারল।

নারাণ বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

তার হাত ধরে নিত্যপদ অসহায় গলায় বলল, কাল তোমরা চলে যাবে নারাণ? কেন যাবে? এতবড় ঘর, তোমরা চলে গেলে আমার যে দম আটকে যাবে। তাছাড়া নিতাইটার উপর বড় মায়া পড়ে গিয়েছিল। ও চলে গেলে আমার এখানে থাকাই দায় হবে।

সব শুনেও চুপ করে থাকল নারাণ।

নিত্যপদ ব্যস্ত হয়ে বলল, নিতাই কোথায়? জান, ওকে আজ আমি খুব মেরেছি। এই দেখ, এই হাত দুটো দিয়ে ওকে আমি মেরেছি। কথা শেষ না করেই উন্মাদের মত ঘরের ভেতরে ছুটে গেল সে, যে হাত দিয়ে গলা টিপে ধরেছিল নিতাইয়ের সেই হাত দিয়ে বুকে টেনে নিল তাকে।

আদরের বন্যায় ভেসে যেতে থাকল ঘুমন্ত নিতাই। স্নেহের নদীতে এমন বন্যা নিত্যপদর জীবনে এই প্রথম।

# কুল গাছ

সাত সকালে ঝাঁকড়া মাথার কুলগাছের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল যশোদা, বুকের কাছ থেকে ভয়ের স্রোত নেমে মিশে গেল মাটিতে। চোখের তারায় কাঁপুনী উঠল থরথর। চোখের কোনো দোষ নেই, দোষ তার নিজের। হরনাথের মরার বয়স হয়নি, অথচ সে মরে গেল দুম করে, হাসপাতালে নিয়ে যাবার সুযোগ পেল না সুবল। ভুঁই নিড়ুতে গিয়েছিল সে চাপড়ার বিলে, ফিরে এসে দেখল তার বাপ মরে পড়ে আছে উঠোনে, মুখের দুপাশে গ্যাঁজলা, চোখ দুটো পোড়ান ভেঁটুলের চেয়ে শক্ত। সেদিন ঐ কুলগাছের ডালে বসে একটা কাক ডাকছিল তার স্বরে কা-কা, যশোদা শোকভরা চোখে ভয়ের প্রলেপ দিয়ে দেখছিল কাকটাকে। চোখের জল শুকিয়ে শুখা নদী, পরনের কাপড় এলোমেলো, খোঁপা ভাঙা চুল আছাড় দিয়ে পড়েছিল মুখের ঘামে। পাঁচ বছরও পেরোয় নি, এর মধ্যে কতবার যে কাকটা উড়ে এসে বসেছে কুলগাছে, আর প্রতিবারই নজরে পড়েছে যশোদার। হাতের কাজ ফেলে সে তখন গাল দিয়ে উঠেছে নিজেকে বাঁচাতে, আবার কেনে এলি রে, যা। ঢিল ছুঁড়ে মারলেই কাকটা উড়ে গিয়ে সামান্য দূরের পেয়ারাগাছের ডালে বসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ঐ চাউনীটাই যশোদার সহ্য হয় না সাত সকালে, ভয়ে মোচড় মেরে ওঠে বুক, বুকের খোদল থেকে গড়িয়ে নামে তাতা নিঃশ্বাস। ভয় তার টুঁটি টিপে ধরে, কথা আটকে যায়, চোখ বুজলেই কাকটাকে সে বুঝি স্পষ্ট দেখতে পায়। সাহস পেয়ে কাকটা আবার উড়ে বসে কুলগাছের ডালে। হরনাথের মরার বয়স হয়নি তবু তাকে অসময়ে চলে যেতে হল। সুবল কপাল চাপড়ে কাঁদছিল দাওয়ায়। পড়শীরা তাকে বোঝাল, কাঁদিস না সুবল, তোর বাপ মহাপুণ্যবান ছিল নাহলে হুট করে কেউ অমনধারা মরে যায়! জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই, টুক করে পড়ল আর মরল। এমন ভাগ্য ক'জনের হয়?

যার যায়, তার যায়: অন্যের হাঁড়ি ঠনঠনায়। হরনাথের এই বসত বাড়িটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাকে দাহ করার কাঠ কেনার ক্ষমতা ছিল না সুবলের, দিন মজুর খেটে যার ঘরে চাল-তেল-নুন আসে, সে কী করে কিনবে বাপকে পোড়ানোর কাঠ? ঘাট খরচার অনেক খরচ। শ্মশান যাত্রীদের পেট ভরে না খাওয়ালে বাপের আত্মা শান্তি পাবে না। আর শ্রাদ্ধ-শান্তির খরচও কম নয়। যার দোরে জনমজুর খাটত সুবল, সেই বাবু তাকে বুদ্ধি দিয়ে বলেছিল, একটা নিমগাছ কিনতে গেলে অনেক টাকার ধাক্কা। তুই এক কাজ কর সুবল, তোর বাপের ভিটেয় যদি কোন গাছ থাকে কেটে ফেল। বাপকে পোড়াবার জন্য পরের কাছে কেন হাত পাতবি, সেটা ভাল দেখায় না। মুখ নিচু করে ফিরে এসেছিল

সুবল। ঘরে এসেই প্রথমে তার নজরে পড়েছিল কুলগাছটা। বেশ ঝাঁকড়া মাথার কুলগাছ। বড়-বড় কাঁটা আছে গাছের ডালে। শীতের অনেক আগেই গাছটায় কুল আসে, তখন পাতাগুলো তেলতেলে হয়, সবুজ খোলস ছেড়ে ফেলে কালচে একটা রঙ ধরে। দাওয়ায় শুয়ে থাকলে কুলফুলের বাতাস ভরিয়ে রাখে চারপাশ। দিনের আলোয় ভ্রমর আসে গুনগুনিয়ে, সারাদিন ওরা মধু খেয়ে সাঁঝলাগার আগে পালিয়ে যায়। সকাল হওয়ার আগে কত যে পাখি আসে কুলগাছে। একটা খোঁড়া শালিক রোজ আসে। অন্য আর একটা শালিকের সাথে সে সব সময় কিচির-মিচির কথা বলে। শালিকের ভাষা বোঝে না সুবল, তবু সে শোনে। ঐ কুলগাছে একদিন ঢোঁড়াসাপ উঠেছিল পাখির ডিম খেতে, সেদিনও কাকটা কোথা থেকে উড়ে এসে সবাইকে সতর্ক করে পালিয়ে গেল। যশোদা ভয়ে মরছিল সাপ দেখে। সুবল ঘরের ভেতর থেকে ছুটে এসেছিল লাঠি নিয়ে। সাপ খেদিয়ে সে রাগে অস্থির হয়ে বলেছিল, মা. ঘরের ছিমুতে কুলগাছ আমি রাখব না। উঠোন নোংরা হয় কুলপাতায়। তুই আর কত ঝেঁটুবি, মা? তার চেয়ে ওর গোড়া আমি কুড়ুল দিয়ে কেটে সাফ করে দিই।

ছেলের কথা শুনে আঁতকে উঠেছিল যশোদা, কী বলছিস বাপ, এতদিনের পুরনা গাছটা তুই কেটে ফেলবি? তা হয় না। একটা গাছকে মানুষ করা ছেলে মানুষ করার সমান। বিয়ের পর থেকে গাছটাকে আমি দেখছি। এমন মিষ্টি কুল গাঁয়ে আর কারোর দোরে পাবি নে। এই গাছটা তোর বাপের বড় সখের ছিল। যশোদার কথা মিথ্যে নয়। কুলগাছটার গুণ অনেক। শীতের শুরু থেকে কুলে-বোঝাই হয়ে যায় গাছটা। শীত বুড়ো হলে বুড়ো হতে থাকে কুল। সবুজ কুলে রঙ ধরে, তখন চেহারা হয় হলুদ মাখা বাবুঘরের মেয়েদের গায়ের মত। হরনাথ কোঁচা মেরে গাছের ডাল ধরে ঝাঁকা দিত গায়ের জোরে। টুপটুপিয়ে কুল ঝরত নিচে, ডাসা-পাকা কুল সশব্দে মাটিতে পড়ে থেঁতলে যেত আহ্লাদে। হরনাথ সুখী গলায় চেঁচিয়ে উঠত, সুবলের মা, হাঁ-করে দোঁড়িয়ে দেখছিস কী, কুলগুলা সব কোঁচড়ে ভরে নে। পাড়া জানলে হৈ-হৈ করে ছুটে আসবে। তুই কারে মানা করবি? গাছের ফল তুই যারে না দিবি, তার মনে রাগ হবে। সাত সকালে কাকটা বসে আছে ডানা মেলে, আকাশের দিকে নজর, পৃথিবীর কোন কিছুর সে বুঝি ধার ধারে না। যশোদা চোখ রগড়ে নিয়ে ভাল করে দেখতে চাইল কাকটাকে। আবার ভয় পেল সে। কাকটা যেন কাক নয়, তার ঘরের মানুষ। উপর থেকে চোখ নামিয়ে কাকটা তাকে দেখছে, যেন কতদিনের জানা শোনা। পেয়ারাগাছের ডালে কাকের মন বসে না। সে ফাঁক পেলেই উড়ে আসে কুলগাছের ডালে। যশোদা আজ আর ঢিল ছুঁড়ে মারল না কাকটার দিকে, শুধু হাঁ-করে তাকিয়ে থাকল এক দৃষ্টিতে। সুবলের বুকের ব্যামো, কাশরোগ। হাসপাতালের ডাক্তার বলেছে, ওকে টি.বি. হাসপাতলে ভর্তি করাতে। বুকের ফটো তুলে ধরা পড়েছে রোগটা। ছেলেটা দিনকে দিন শুকিয়ে যাচ্ছিল। সারারাত সে ঘুমোত না, শুধু খুক খুক করে কাশত। ঘুষঘুষে জ্বর আসত সন্ধ্যা

নামলে। বুকের চারপাশটায় কনকনানী ব্যথা। ভিজে ভাত খেলে সেই ব্যথা আরও বাড়ত। বেড়ে যেত কাশির মাত্রা। জনমজুর খাটতে গিয়ে সুবল একদিন ধরা পড়ে গেল সবার সামনে। দিনের আলোয় মুখের রক্ত সে লুকিয়ে রাখতে পারল না। ধুতির খুঁটে মুখ মুছতে গিয়ে চমকে উঠল সে। তাজা রক্তের ঝাঁকুনীটাই অন্যরকম, হরনাথ যেমন কুলগাছের ডাল ধরে ঝাঁকুনী দিত, এই ঝাঁকুনীটা তার চেয়েও তীব্র। রোগটা জানাজানি হয়ে গেল লোক মুখে। যশোদা ছেলের শুকনো, চিমড়ে গতরখানার দিকে তাকিয়ে বুক উজাড় করে শ্বাস ছেড়ে বলল, তোর আর জন খাটতে গিয়ে কাজ নেই। তুই ঘরে শুয়ে আরাম কর। আজ থেকে আমি যাব বাবুর দোরে খাটতে। কথাবার্তা সব বলে এসেছি, বাবু আমাকে মাস কাবারী মাহিনা দেবে। —সে টাকা তো ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। সুবলের ছলছলে চোখে আর্তি ভরা জিজ্ঞাসা, দুটা প্রাণীর সংসার কি তোর বাসন মাজার পয়সায় চলবে? এখন যা দিনকাল পড়েছে তাতে গতর নিংড়েও ঘর খরচের পয়সা ওঠে না। তুই ভাবিস না মা, আমি আবার ভাল হয়ে উঠব। আবার আমি পরের দোরে মজুর খাটতে যাব। আমি থাকতে তুই কেনে পরের দোরে ঝিগিরি করতে যাবি? সেটা কি ভাল দেখায় নাকি?

সুবলের তীব্র ইচ্ছা শক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিল যশোদা। কিন্তু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। হপ্তা না ঘুরতেই টান ধরল পেটে। শূন্য হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে যশোদা মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, বাপরে, তোর অখন ভাল ভাল পথ্য খাওয়ার দরকার! তোর যা চেহারার হাল হয়েছে, তাতে কেউ তোকে আর কাজে নেবে না। শরীল না সারলে তাগত আসবে কোথা থেকে? তুই ভাবিস নে, আমি চললাম বাবুর দোরে। খাটব খাবো, এতে কোন লাজ নেই। তোর বাপ বলত, পেটের জন্য চুরি-চামারী ছাড়া আর কোন কাজে পাপ হয় না। দিনভর ঘরে থাকত না যশোদা, সুবলকে দাওয়ায় বিছানা পেতে শুইয়ে দিয়ে সে চলে যেত কাজে। ফিরে আসত সাঁঝ লাগার আগে। ফিরে এসে খড়ের জ্বালে ভাত ফোটাত সে। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখত সে, ঠাকুরের কাছে মানত করে বলত, মা কালী, আমার সুবলটারে ভাল করে দাও, আমি তোমাকে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো দেব।

দিন গেল, সুবলের তবু ভাল হবার লক্ষণ নেই। গোড়ায় কেঁচো লাগা কলা গাছের মত শুকিয়ে গেল তার শরীর। চোখ কোঠরাগত। চুল পাটফেঁসো। কথা বলার দমটুকু সে হারিয়ে ফেলছিল ধীরে ধীরে। বিছানা লেপটে পড়ে থাকত সর্বক্ষণ। তার দুর্বল চোখ জোড়া হাঁ-করে দেখতে চাইত শুধু কুলগাছটাকে। হরনাথের কত সখের ছিল কুলগাছটা। এত বড় পৃথিবীতে শুধু এই কুলগাছটা ছাড়া তার গর্ব করার মতো কোন জিনিস ছিল না। দাহ করার জন্য কাঠের দরকার। বাবু সব শুনে বলল, ভাববার কী আছে। তোর ঘরেই তো কাঠ আছে সুবল। কুলগাছটা কেটে ফেল। অত বড় কুলগাছে হরনাথের দুবলা দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ঘরের জিনিস ঘরের কাজে লাগা, তাতে তোর মঙ্গল।

ঐ অত শোকের মধ্যে যশোদা মানা করেছিল, তা হয় না বাপ। কুলগাছটা তোর বাপের জান্ ছিল। শীতকাল আসলেই এই গাছটা নিয়ে তার কত গর্ব। ও ভুল করিস নে, তুই অন্য কোথাও কাঠের যোগাড় কর। ধার-দেনা ঠিক শোধ হয়ে যাবে কিন্তু গাছ চলে গেলে গাছ পাব না।

ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছিল আকাশ, সুবলের চোখ ভরা জল। হাওয়া এসে জলবাহী মেঘের মত কুলগাছের মাথায় দাঁড়িয়ে। হাসপাতালের ডাক্তার বলেছে, তাকে টি. বি. হাসপাতালে দেখতে। কথাটা শোনার পর থেকে সুবলের মাথার কোন ঠিক নেই। এই রুগ্ন, শীর্ণ শরীর নিয়ে তার আর বেঁচে থাকতে মন করে না। যশোদা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আশায় বুক বাঁধে। চুলায় খড়কুটো ঠেলে দিয়ে বলে, রোগ-জ্বালা কোন্ ঘরে নেই? তুই ভাবিস নে বাপ, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তো কারোর কোনদিন ক্ষতি করিনি, ভগবান কেন আমার ক্ষতি করবে?

সুবলের মনে তবু চিন্তার মেঘ জমে থাকে। গাছ ভর্তি কুলগুলোর দিকে তাকিয়ে তার চোখে জল আসে। বুকের ফটো তুলতে গেলে সদরে যাওয়ার দরকার। যাওয়া-আসার বাসভাড়া, আরো অনেক কিছুর জন্য টাকার দরকার। বাবুর বউ মাত্র পঁচিশটা টাকা যশোদার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, টাকাটা তোমাকে ফেরৎ দিতে হবে না সুবলের মা। আমাদের মিনুর বড় কুলের আচার খাওয়ার সখ। তুমি বরং গাছের কুলগুলো আমাকে দিয়ে যাও।—এক গাছ কুলের দাম মাত্র পঁচিশ টাকা? যশোদার গলা থেকে তুষারপাতের মতো ঝরে পড়ে ছিল বিস্ময়। তার কথা লুফে নিয়ে বাবুর বউ বলল, কুল কি কেউ গাঁয়ে ঘরে কিনে খায় গো? তোমার বিপদ বলেই পঁচিশটা টাকা দয়া করে দিচ্ছি, না পোষায় টাকা ফেরৎ দাও। আমি জানি, এ যুগে কারো ভাল করতে নেই; কালো চুলের ভাল করলে ঠকতে হয়। টাকাটা ফেরৎ দিতে পারেনি যশোদা, ঝুড়ি ভরে পাকা কুল নিয়ে গিয়েছে সে বাবুর দোরে। পাকা কুলে কামড় মেরে বাবুর বউ গালে টোল ফেলে বলেছে, বাঃ, ভারী মিষ্টি তো তোমার গাছের কুল!

যশোদার গলা ভার হয়ে এসেছে কথা শুনে, সে থাকতে না পেরে বলেছে, কী করব মা, গাছের কুল বেচে যে ছেলের চিকিৎসা করতে হবে এ আমি জীবনেও ভাবিনি। সুবলের বাপ বেঁচে থাকলে এ কাজ আমি কোন দিনও করতাম না। আমার ঘরের মানুষটা কুলে রঙ ধরলে বলত, গাছের ফল সবাইকে দিয়ে থুয়ে খাবি। মানুষকে যত দিবি, তত ফলন বাড়বে গাছের।

—ও তো কথার কথা। আজকালকার যুগে আর ওসব কথা চলে না। বাবুর বউ ঠোঁট উল্টে যশোদাকে হারিয়ে দিতে চায়। যশোদা হেরো মানুষ, দায়ে পড়ে তার মুখে আর কোন কথা নেই। ঘরে ফিরে আসলে সুবল রুগ্ন গলায় প্রশ্ন তোলে, মারে, গাছের কুলগুলো তুই বেচে দিলি? তুই নিজে তো একটাও খেলি না!

—বছর বছর তো খাই, এক বছর নাই বা খেলাম। যশোদার চোখ ভিজে

যায় জলে, অবুঝ ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে বারংবার। হাতি যখন কাদায় পড়ে, চামচিকিতে লাথি মারে। তার নিজের দশা এখন তেমন। ধার দেনা করে সদরে সুবলের বুকের ফটো তুলে ফিরে এসেছে সে। যেদিন সে ফিরল সেদিন থেকে সুবলের বাড়াবাড়ি। কাশির সাথে থোক-থোক কাঁচা রক্ত উঠে এল বারবার। পাড়ার লোকরা তার কান্না শুনে ছুটে এল, সব বুঝে শুনে বলল, সুবলের মা, কাঁদামাটি করে কোন লাভ নেই, সুবলকে তুমি হাসপাতালে ভর্তি করে দাও। ওর অবস্থা আমরা ভাল বুঝছি না। ঘরে ফেলে রাখলে ছেলেটার অবস্থা যে হরনাথের মত হয়ে যাবে। তখন কপাল চাপড়াতে হবে। গ্রামের হাসপাতালে সুবল লড়াই করছে মৃত্যুর সঙ্গে। সারারাত ফাঁকা ঘরে ঘুমাতে পারে না যশোদা। হরনাথ যেন তার পাশে এসে দাঁড়ায়। গায়ে হাত ছুঁইয়ে বলে, ভাবিস নে, আমি আছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

—তুমি কেন এসেছ? আমাকে কাঁদিয়ে কি তোমার সুখ হয়নি?

—সুবলটার বড় কষ্ট। ওকে আমি নিয়ে যাব। হরনাথের কণ্ঠস্বর যেন ফাঁকা ঘরে গুমরে বেড়ায়। আঁতকে ওঠে যশোদা। প্রায় রাতেই এমন একটা স্বপ্ন তার সাজান ছক উল্টে দেয়। হরনাথ কি তাহলে সত্যি সুবলকে নিয়ে চলে যাবে। কেন যাবে? সুবল চলে গেলে সে বাঁচবে কাকে নিয়ে? কুলগাছের দিকে তাকিয়ে যশোদার চোখ শক্ত হয়ে ওঠে রাগে। এই কুল গাছটা না থাকলে হরনাথ কাক হয়ে উড়ে এসে রোজ বসতে পরত না গাছের ডালে। রোজ সকালে কাকটা কি সুবলের নাম ধরে ডাকে? উঠ সুবল, উঠ। বেলা হল। কাজে যাবি নে? যশোদার অঙ্গার চোখ থেকে ছিটকে বেরয় তাপ। নিমেষে শক্ত হয়ে ওঠে হাত-পা চোখের দৃষ্টি। মাজা ধাপিয়ে একটা ঢেলা তুলে নিয়ে সে ছুঁড়ে মারে কাকটার দিকে। কাকটা কা-কা শব্দে পৃথিবীর বাতাস নোংরা করে উড়ে যায়। তার সচল ছায়া ধুলোর পৃথিবীতে মিলিয়ে যায় দ্রুত। যশোদার তবু হাঁপু লাগা কমে না। পরনের শাড়িটা ঠিক করে নিয়ে সে দাঁড়াল না। সকালবেলায় হাসপাতালে না গিয়ে সে সোজা চলে গেল ছুতোর বাড়ি। পরিমল বাবলা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে লাঙ্গল বানাতে ব্যস্ত ছিল। সকালবেলায় যশোদাকে দেখে তার হাতের বাঁটালি থেমে গেল, কী ব্যাপার খুঁড়ি?

—আমি তোর কাছে এসেছি পরিমল। যশোদা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, সুবলের অবস্থা ভাল নয়। ওর বুকের রোগ ধরা পড়েছে। ক'দিন হল ছেলেটার খুব বাড়াবাড়ি। কথা থেমে গেল যশোদার, আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে সে বলল, হাতে টাকা-পয়সা নেই যে চিকিৎসা করাই। হাসপাতালের বড় ডাক্তার বলছিল, ওকে ধুবুলিয়ার টি. বি. হাসপাতালে ভর্তি করানোর জন্য। তা বাপ, সেখানে কি ভর্তি করা মুখের কথা। খুঁটির জোর দরকার। এম-এল-এ না লিখে দিলে ওরা ছেলেকে আমার ভর্তি করাবে না। তাই তোর কাছে ছুটে এলাম। আমাকে বাঁচা।

—আমাকে কী করতে হবে বলো? পরিমল শুকনো ঢোক গিলে তাকাল, কাজ কামাই করে সে কথা বলতে নারাজ। যশোদা ঘন হয়ে সরে আসল

পরিমলের কাছে, কান্নার আবেগকে সংযত করে বলল, হাতে টাকা-পয়সা নেই। আমি কী ভাবে এত দৌড়ঝাঁপ করি বলতো? তুই যদি আমার কুলগাছটা কিনতিস তাহলে—

যশোদার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পরিমল হালকা গলায় বলল, কুলগাছ কেউ আবার কেনে নাকি? ও গাছ তো বিনে পয়সায় দিলেও কেউ নেবে না। কুলগাছ কি বাবলাগাছ যে ও দিয়ে লাঙ্গল হবে? পরিমল যশোদার ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে লেজে খেলাতে চাইল, তবে তুমি যখন ঘর বয়ে এসেছ তখন আমি তোমাকে নিরাশ করব না! হাজার হোক সুবল আমার বন্ধু ছিল। তা বলো, কত হলে গাছটা দিতে পারবা?

—তোর কাছে আমি আর কী দরদাম করব? তুই আমার ছেলের মত। যা নেয্য দাম হয় দিস।

—তোমাদের কুলগাছ আমি দেখেছি। ও বুড়ো গাছে পোকা ধরে গিয়েছে। ওর দাম পঞ্চাশ টাকার বেশি হবেনা।

—অত বড়ো গাছটার দাম মাত্র পঞ্চাশ টাকা?

—তা নয় তো কি হাজার টাকা? পরিমলের ঠোঁট শক্ত হয়ে উঠল, পঞ্চাশ টাকায় আজকাল কুলগাছ কেন চন্দন গাছও পাওয়া যায়। কুলকাঠ তো কোন কাজে লাগে না, ওটা আমি ঘরে এনে চুলা ধরাব। ডাল-পালাগুলো তে ফেলে দিতে হবে, ও গুলো কোন কাজে লাগবে না।

—আর কিছু ধরে দে বাপ।

—ওর বেশি পারব না খুড়ি। শুধু তোমার মুখ চেয়ে আমি পঞ্চাশ টাকা দাম দিয়েছি। নাহলে....

পরিমলের ঘর থেকে কথাবার্তা সেরে ফিরে আসার সময় পা চলছিল না যশোদার। হরনাথের কথাগুলো বারবার করে তার মনে পড়ছিল। সে তখন নতুন বৌ। হরনাথ তাকে কুলগাছের ছায়ায় দাঁড় করিয়ে বলেছিল, এ গাছের কুল তোমার মুখের বুলির মত মিষ্টি।

পেটে সন্তান আসার পর হরনাথ কুল পেড়ে দিত নিজের হাতে, রগড় করে বলত, এগুলা কুল নয় রে, আঙ্গুর। আঙ্গুর ভেবে কুল খা. গায়ে তোর শক্তি আসবে। আমি তো ভালমন্দ খাওয়াতে পারিনে, কুল খেয়ে তোর ছেলে হোক। পূর্ণিমায় চাঁদ উঠলে কুলের পাতা বেয়ে গড়িয়ে নামত জ্যোৎস্না। দাওয়ায় মাদুর পেতে হরনাথ শুয়ে থাকত রাতভর, চাঁদের দিকে চোখ, রাজার মত গলা করে বলত, হা-দেখ, আকাশের চাঁদটা আমার কুলগাছের ভেতর ঢুকে পড়েছে। আর বেরতে পারছে না। কুলের কাঁটায় শুধু তোর শরীলে রক্ত বেরয় না, চাঁদেরও কেমন কষ্ট হচ্ছে দেখ।

পরিমল লোকজন নিয়ে এসেছে গাছ কাটতে। যশোদা ঘরে ছিল না, গিয়েছিল বাবুর কাছে। বাবুর চিঠি নিয়ে গেলে এম-এল-এর সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। এম-এল-এর সার্টিফিকেট পেলে ধুবুলিয়ার টি.বি. হাসপাতালে

বিনে পয়সায় ভর্তি হতে পারবে সুবল। নাহলে অনেক সময় পেরিয়ে যাবে সিট পেতে। কেউ তাকে পাত্তাই দেবে না।

বাবুর চিঠি যশোদার হাতে ধরা।

গাছ বিক্রির টাকা দিয়ে সে সুবলের জন্য আঙুর আর আপেল কিনে নিয়ে গিয়েছিল হাসপাতালে। এক পোয়া করে দুধ নিচ্ছে রোজ। সুবল যা খায় তা বমি করে দেয়, হজম করতে পারে না। এসব দেখে-শুনে যশোদর মনে সুখ নেই। গ্রামের হাসপাতালের দিদিমণি তাকে বলেছে, তোমার ছেলের অবস্থা ভাল নেই মাসী। তুমি ওকে তাড়াতাড়ি টি.বি. হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো। রোজ যদি গাদা-গাদা রক্ত বেরয় তাহলে শরীরে আর কী থাক্‌বে? দিদিমণির কথা শুনে বুক মোচড় দিয়ে উঠেছে যশোদার। বাবুর হাত চিঠিটা নিয়ে সে ফিরে এসেছে ঘরে।

তাকে দেখে পরিমল হাসতে হাসতে বলল, খুড়ি, টাকা যখন মিটিয়ে দিয়েছি গাছটা তখন কেটে নেওয়াই ভাল। কী বলো?

পরিমলের লোক গাছ কাটছিল। কুড়ুলের শব্দ কানে বিষ ঢেলে দিচ্ছিল যশোদার। কত দিনের গাছ, আর ক'মুহূর্তের মধ্যেই ধরাশায়ী হবে। তারপর টুকরো-টুকরো হয়ে গোরুর গাড়িতে বোঝাই হয়ে চলে যাবে পরিমলের ঘরে। প্রতিটি কুড়ুলের আঘাত বুঝি যশোদার বুকে গিয়ে বাজে। আঁচলে মুখ ঢেকে সে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। মাত্র কটা টাকায় তার সখ আহ্লাদ-স্মৃতিচিহ্ন ভাব ভালবাসা সব মুছে যাচ্ছে—তবু চিৎকার করে বলতে পারে না, পরিমল, কুড়ুল থামা। এই নে তোর টাকা। গাছ আমি বেচব না, বাপ। তুই ফিরে যা। ফিরে যা।

কুড়ুলের শব্দের মাঝখানে আর একটা শব্দ এসে থামল। হাসপাতালের জমাদার এসেছে ঘর বয়ে খবর দিতে। পরিমলকে চেঁচিয়ে সে বলল, আরে, তোমরা কী করে খবরটা শুনলে বলতো? তা ভাল করেছ, কাঠ-টাঠ কেটে রেডি রাখো। মাসির তো আর কেউ নেই যে ছেলেটাকে নিয়ে ঘাটে যাবে। ও মাসি চলো গো, টিপছাপ দিয়ে মড়া নিয়ে আসবে।

জমাদারের নিষ্ঠুর কথা শুনে যশোদা বুক ফাড়িয়ে কেঁদে উঠতে পারল না, শুকনো খটখটে চোখে তাকিয়ে সে শুধু আর্তনাদ করে উঠল, মিছে কথা, তোমার কথা আমি বিশ্বেস কবি নে। আমার সুবল মরতেই পারে না। হা-দেখ, বাবু চিঠি লিখে দিয়েছে এম-এল-এ-র কাছে। আমি সুবলরে নিয়ে টি.বি. হাসপাতালে যাব গো।

কুড়ুলের শেষ কোপে আছড়ে পড়ে গাছ। কথা শেষ করে ভূমি নেয় যশোদা। তখনও তার হাতের মুঠোয় শক্তভাবে ধরা বাবুর লিখে দেওয়া চিঠিটা। যশোদার শরীর যেন কাঁটা ভর্তি কুল গাছ। কাঁটা ঢুকে যাওয়ার ভয়ে কেউ তাকে ডিঙিয়ে যেতে পারে না।

# স্বপ্নের খরাপাখি

মাথায় ন্যাকড়ার টুপি, পায়ে সোল ক্ষয়া হাওয়াই চপ্পল, খাকি জামার বুক পকেটে পরপর তিনটে ডট পেন গোঁজা, এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, অনিদ্রায় ভরা দু-চোখ মেলে সাইমন তীর্থের কাকের মতো হাঁ করে তাকিয়েছিল দুর্গার দিকে। সে এমনভাবে তাকিয়েছিল পাথর হলেও বলে উঠত, কী চাই তোমার? দুর্গা পাথর নয়, তার রক্তমাংসের শরীর, চকিতে সাইমনের চোখে চোখ ফেলে রাগে-ঘেন্নায় মুখ ঘুরিয়ে, নিয়ে ঝাড়ু-অফিসটার দিকে তাকাল। শম্ভুবাবু হেল্‌থ ইন্সপেক্টর, রোজই ছটার আগে এসে যান, হাজিরা খাতা হাতে তিনি চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে নাম ডাকছেন, মতিবালা, গিরিবালা, ধনঞ্জয়, রাইচরণ, পদ্ম। কারোরই নামের শেষে পদবি নেই, পদবিসুদ্ধু পড়তে গেলে দেরি হয়ে যাবে কাজের। এত বড় কলোনির সাফ-সুতরোর দায়-দায়িত্ব সব তার ঘাড়ে। সবাই যে মন লাগিয়ে কাজ করে তা নয়। বেশির ভাগই দারু হাঁড়িয়া খেয়ে গাছতলায় দেহ ফেলে দেয়, রোদ গড়ালে ঘর ফিরে যায় ঝাড়ু হাতে। সাইমন কালও হাজিরা দিয়ে চলে গিয়েছিল হাঁড়িয়া ঠেকে, সঙ্গে ছিল মাঝবয়েসী ফিটকিরি। আজ শম্ভুবাবু বাগে পেয়ে একচোট নিলেন। সাইমন মুখ নিচু করে আড়ষ্ট গলায় বলল, বাবু, পরের মুখে ঝাল খেয়ে আপনি আমাদের বকছেন। কাল দিনভর আমি বাংলো সাইডের ড্রেন সাফা করলাম। বিশ্বেস না হয় ফিটকিরিদাকে শুধান। সে বেচারিও আমার সঙ্গে ছিল সর্বক্ষণ।

সাইমনের গলায় যে দৃঢ়তা ছিল তা পলকা লতার মতো, চাপ দিলে পুট করে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। শম্ভুবাবু অভিজ্ঞ মানুষ, এ-লাইনে তার মাথার চুল পাকল, সাইমনের ঘেমে-ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি ধমক দিয়ে বললেন, মিথ্যে কথা বলে তুমি আমার মন গলাতে পারবে না। আমি নিজে দুপুরবেলায় সাইকেল নিয়ে গিয়েছিলাম বাংলো সাইডে। তোমাকে দেখতে পাইনি। শুধু দুর্গাকে দেখলাম ঝাড়ু দিচ্ছে লাল বাংলোটার কাছে।

সাইমন ন্যাকড়ার টুপিটা খুলে চোরের মতো মুখ করে তাকাল, শম্ভুবাবুর মুখের উপর তার কোনো কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। তার যত রাগ দুর্গার উপর। বাপের হয়ে কাজ করতে এসে মেয়েটার মুখে ভাষা ফুটেছে ক্যাচকোচি পাখির মতো। অথচ সাইমনের দয়াতে তার আজ যত ফুটানি। শম্ভুবাবুকে বলে কয়ে সে-ই তো মেয়েটার কাজের ব্যবস্থা করে দিল। দুর্গার বাপ জয়রাম পুরোনো দিনের ঝাড়ুদার, ঝাড়ুকাজ করতে গিয়ে তার মাজা পড়ল কলোনির বুড়া বটগাছটার গোড়ায়। সেদিন সাইমন ছিল জয়রামের গ্যাংয়ে। ধরাধরি করে

হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল তারা। দুর্গা কেঁদে-কেটে অস্থির। বুড়ো বাপ ছাড়া তাকে দেখার কেউ ছিল না বস্তিতে। সাইমন সেদিন দুর্গাকে অভয় দিয়ে বলেছিল, তোমার কোনো চিন্তা নেই। শম্ভুবাবুকে বলে আমি তোমাকে ঝাড়ু কাজে ঢুকিয়ে দেব। হাজিরা খাতায় নাম থাকবে তোমার বাপের। তুমি এসে ঝাড়ু ধরবে।

শম্ভুবাবু মেনে নিয়েছিলেন সাইমনদের প্রস্তাব। সেদিন থেকে জয়রাম আসে মেয়ের হাত ধরে হাজিরা দিতে। ঝাড়ুকাজ, ড্রেন সাফা, খাটা পায়খানার কাজ, সে এখন করতে পারে না। তার হয়ে দুর্গাই ঝাঁট দেয় কলোনির রাস্তা-ঘাট। বেতনের দিনে জয়রাম এসে টিপছাপ দেয়। ক্যাশবাবুর হাত থেকে টাকাটা নিয়ে দুর্গা ঢুকিয়ে রাখে বুকের ভেতর। জয়রামকে দারু খেতে সে এখন আর পয়সা দেয় না। চোখ রাঙিয়ে বলে, মদ খেলে তুমি আর বাঁচব না। ডাক্তারবাবু বারে বারে মানা করেছে। মেয়ে হয়ে আমি তোমার মুখে বিষ তুলে দিতে পারব না।

দুর্গার শাসন বড় কড়া। জয়রাম কেঁচো হয়ে থাকে মেয়ের সামনে। খুব বেশি নেশা চাগিয়ে উঠলে সে ঘন ঘন বিড়ি টানে। হাঁড়িয়া ঠেকের দিকে তাকিয়ে ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তবু মন গলে না দুর্গার। সর্বদা সে চোখে চোখে রাখে জয়রামকে।

সাইমনের ঝাড়ু গ্যাংয়ে দুর্গা মাসের উপর কাজ করেছে, মেয়েটাকে দেখলে তার বুকের ভেতর ঝড়-তুফান শুরু হয়। তখন তার মনে হয় ওই সুন্দর হাতে বড় বেমানান ওই নোংরা ঝাঁটা। ঝাঁটা ধরার জন্য জন্ম হয়নি মেয়েটার। কিন্তু জয়রামের যা অবস্থা, তাতে ঝাড়ু না ধরেও তার কোনো উপায় নেই। দুটো পেটের দায়-দায়িত্ব কে নেবে এই কঠিন সংসারে? দুর্গা যদি তার কথামতো চলত তাহলে সাইমন ভেবে দেখত কী করা যায় ওদের জন্য। কিন্তু দুর্গা হল ধানীলঙ্কা, তার এত ঝাল যে সামনেই দাঁড়াতে পারে না সাইমন। আগ বাড়িয়ে কিছু বললে মুখ ঝামটায় দুর্গা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বলে, নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও, ঘুরবে ভালো। আমার পিছনে লাগতে এসো না। বড় অকৃতজ্ঞ মেয়েটা। চোখের চামড়া পুরু বলেই তার শরীরে দয়া-মায়া কম। সাইমনকে সে এখন দেখেও দেখে না। কাজের সময় গল্পগুজব তার একেবারে না-পছন্দ। সাইমন কাছে ঘেঁষতে চাইলে দুর্গা চোখ টাটিয়ে বলবে, আমি অত শস্তা নই যে, আমাকে পটাবা। তোমার মতি-গতি আমি বুঝি। তুমি সবার চোখকে ফাঁকি দিলেও আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবা না। ফের যদি তুমি আমার পেছনে লাগ, তাহলে আমি বাবুর কাছে নালিশ করব তোমার নামে। ভেবো না, আমি তোমার গাংয়ে আছি বলে তোমার সব কথা মুখ বুজে মেনে নেব। আমিও মানুষ। আমারও চিমটি কাটলে লাগে।

সাইমনের চুপসে যাওয়া মুখ, দুর্গার কথাগুলোয় সে নুন দেওয়া জোঁকের

মতো ছটফট করে। বাস্তবিক তার কিছু করার থাকে না, সে শুধু হাঁ-করে দেখতে থাকে। ফিটকিরি তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, মেয়েটার তেজ অনেক, তা বলে ঘাবড়ে গেলে তোরও চলবে না। তবে কান ধরলে মাথা আসে। তুই জয়রাম বুড়াকে পটাবার চেষ্টা কর।

—সে বুড়া তো মেয়ের ভয়ে জুজু।

ফিটকিরি তবু হারবার লোক নয়, সাইমনের হাত ধরে টানে। সাহস দিয়ে বলে, চল আমার সঙ্গে। বুড়াটা পিপলতলায় গামছা পেতে শুয়ে আছে। চল ওরে ধরে নিয়ে যাব দারুভাটিতে। দারু পেটে পড়লে পাথরও গলে যাবে, আর ও তো মানুষ!

পিপলতলায় বুড়ো শিবের মতো বসেছিল জয়রাম, সাইমন গিয়ে তার পাশে বসতেই বুড়োটা চোখ পিটপিটিয়ে তাকাল। ভাঙা গলায় বলল, কী ব্যাপার, আজ যে হঠাৎ বুড়ার কাছে এসে বসলে?

সাইমন চোখে-মুখে হাসল, সময় পাই না খুড়া, কী করব বলো? আজ একটু ঝটপট কাজ সেরে ফেললাম। ভাবলাম, যাই তোমার সঙ্গে একটু গল্প করে আসি।

—তা এসেছ ভালো করেছ। ছায়ায় বোসো। যা রোদ, চামড়া চড়চড় করে, গলা শুকায়।

—গলা তো আমারও শুকিয়ে গেছে খুড়া। সাইমনের গলা নিচু হয়ে এল, খুব সাবধানে সে বলল, চলো, দারুভাটি থেকে ঘুরে আসি। অনেকদিন ওদিকে আর যাওয়া হয়নি। তুমি গেলে পাশাপাশি বসে খাওয়া যাবে।

জয়রাম বুড়ার চোখ চকচকিয়ে উঠল লোভে, দুর্গার কথা ভেবে সে আবার ঝিমিয়ে গেল, না থাক, ওদিকে আর যাব না বাপ। মেয়েটা জানতে পারলে বড্ড রাগারাগি করবে। ওর ফিরে আসার সময় হল। আমাকে পিপলতলায় না দেখলে পুরো বস্তি মাথায় তুলে ছাড়বে। তুমি তো ওর রাগ জানো না। রেগে গেলে মেয়ের আমার মাথার কোনো ঠিক থাকে না।

—ও জানতেই পারবে না। ও আসার আগেই আমরা ফিরে আসব। সাইমন ফিসফিসিয়ে বলল, চলো, আর দেরি করে লাভ নেই। তোমার মেয়ে এখন জঙ্গল সাফা করছে বড়রাস্তার। কাজ শেষ করে আসতে তার ঘণ্টাখানিক লেগে যাবে।

জয়রাম বুড়া মাথা চুলকে কী যেন ভাবল, তারপর লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল কোনোক্রমে। সাইমন তার হাত ধরল ; যেতে যেতে বলল, তুমি দেখছি তোমার মেয়েকে যমের মতো ভয় করো। অত ভয় করলে কি চলবে খুড়া। তুমি তার বাপ ; তুমি তাকে জন্ম দিয়েছ, সে তোমার কথা মতো চলবে। এখন তুমি যদি তার কথামতো চলো, তাহলে লোক হাসবে।

—লোক হাসলেও আমার কিছু করার নেই। জয়রাম বুড়া বিরক্তি-ভরা চোখে তাকাল; ছেলে-মেয়ে বড় হলে বুড়া বাপ-মা তো তাদের হাতের পুতুল হয়ে যায়। তবে আমার ঘরের দুর্গা সেরকম নয়। ওর মতো মেয়ে বস্তি ঘুরে আসলে তুমি আর দুটি পাবে না।

—তা যা বলেছ, দুর্গার মতো মেয়ে হয় না! সাইমনের চোখের কোণে হতাশার মেঘ জমে ওঠে, হাঁটতে হাঁটতে সে বুড়ার মুখের দিকে তাকায়, তবে তোমার মেয়ের সব ভালো, শুধু তার দেমাগটা একটু চড়া। এই ধরো. কত দিন আমি তার সঙ্গে কাজ করছি—সে একদিনও আমার সঙ্গে ভালো মনে কথা বলল না। অথচ শম্ভুবাবুর কাছে আমি ওর কত নাম করি।

মদভাটিতে বসে সাইমন দুর্গার কথাই ভাবছিল। সেদিন দুর্গা তার মুখের উপর যা-না-তাই বলল। ঝাড়ু গ্যাংয়ের সবাই তার কথা শুনে খিলখিলিয়ে হাসল। পার্বতী টিপ্পুনী কেটে বলল, দুর্গারে, সাইমন তোর জন্য পাগল হয়ে গিয়েছে। ওর মাথার কোনো ঠিক নেই। সেদিন দেখলাম, জামার বোতাম উলটা-পালটা লাগানো। ঝাড়ু হাতে নিয়ে ক্ষ্যাপার মতো ঘুরছে। কাজে কোনো মন নেই। দুর্গা ঠোঁট উলটে বলেছিল, ওসব পাগলামি একদিনেই ঘুচিয়ে দিতে পারি আমি। এবার আমার দিকে তাকালে ঝাড়ু কাঠি দিয়ে ওর চোখ দুটা আমি গেলে দেব। আমাকে তো চেনে না, আমার নাম দুর্গা, আমি কাউকে ডরাব না।

এত বড় অপমানের কথা, এখনো গায়ে বিঁধে আছে সাইমনের। পুরো গ্যাংয়ের লোক তাকে সেদিন নেকনজরে দেখছিল। সাইমন ছোট হয়ে গিয়েছে সবার মাঝখানে। দুর্গা তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চড়া গলায় বলেছিল, ভাদুরে কুকুরগুলোকে আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি নে। ওরা পথঘাটে ফ্যা-ফ্যা করে ঘোরে। লোক হাসায়। ওদের গায়ের চামড়া গণ্ডারের চেয়েও মোটা। তবে মোটা চামড়ায় কীভাবে হুল ফোটাতে হয় সে বিদ্যে আমার ভালো জানা আছে। তাই তোমাকে বলছি-একটু হিসেব করে চলো, লোকলজ্জার ভয় থাকলে আমার সামনে এসো না। আমি ভালোর ভালো মন্দের যম।

যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। মদের বোতলটা আঁকড়ে ধরে রাগে লাল হয়ে উঠছিল সাইমনের আপাত-নিরীহ চোখদুটো। ফিটকিরি তাড়া মেরে বলল, কী ভাবছিস, মদ ঢাল গেলাশে। ওদিকে দেরি হয়ে গেলে দুর্গারানী খেপে আবার বোম্ হয়ে যাবে।

যুবক সাইমনের হাত কেঁপে উঠল গ্লাশে মদ ঢালতে গিয়ে, তীব্র রাগে জ্বালা পোড়া করে উঠল তার সর্বাঙ্গ। জয়রাম বুড়ার হাতে মদের গ্লাশটা ধরিয়ে দিয়ে সে বলল, খাও খুড়া। প্রাণ ভরে খাও। মদ খাওয়ার সময় মনে কোনো ভয়ডর রেখো না। দুর্গাকে তুমি কেন ভয় পাবে, সে কি বাঘ না ভালুক?

মদের গ্লাশে চুমুক দিয়ে কৃত্রিম স্ফূর্তিতে টগবগিয়ে উঠতে চায় জয়রামবুড়ো,

কিন্তু অদৃশ্য দুটো হাত যেন তার গলা টিপে ধরে, গলায় মদ আটকে বিষম খায় সে, নাক-মুখ দিয়ে ছিটকে আসে ঝাঁঝালো পানীয়। চোখ-মুখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় বুড়োটার, কোনোমতে নিজেকে সামাল দিয়ে সে আবার ঘন ঘন চুমুক দিতে থাকে মদের বোতলে।

বেলা বেড়ে যায়, সূর্য ওঠে টিকলির উপর। দুর্গা ফিরে এসে খুঁজে পায় না তার বাপকে। কোথায় যেতে পারে বুড়ো মানুষটা—এই ভেবে অস্থির হয় সে। পার্বতীর সঙ্গে দেখা হলে সে ব্যাকুল হয়ে শুধোয়, বাপ তো পিপলতলায় শুয়েছিল, কোথায় গেল বল তো মানুষটা?

পার্বতীর স্বচ্ছ চোখে রসিকতা, কোথায় আর যাবে, দেখ গে দারুভাটিতে পড়ে আছে কি না? বস্তির মানুষগুলোর তো যাবার ঠিকানা ওই একটা। দুর্গা দারুভাটির দিকে যাচ্ছিল, মাঝ পথেই দেখা হয়ে গেল সাইমনের সঙ্গে। সাইমন তাকে দেখে থামল, গায়ে পড়ে বলল, যার খোঁজে তুমি যাচ্ছ, সে দেখো গে মদ খেয়ে শুয়ে আছে দারুভাটিতে। আজ গলা অব্দি মদ খেয়েছে বুড়াটা। মদ খেয়ে সে তোমাকে গালি দিচ্ছিল। তুমি তাকে এতদিন উপোসে রেখেছ কেন?

দুর্গার ঠোঁট শক্ত হয়ে উঠল নিমেষে, চোখে আগুন ঝরিয়ে সে বলল, আমি বুঝতে পেরেছি, এসব তোমার কারসাজি। তুমি কি চাও, বুড়া মানুষটা বেঘোরে মারা যাক। তোমার তো তিনকূলে কেউ নেই, আমাকেও কি তোমার মতো অনাথ সাজাতে চাও? সেটা কি তোমার ভালো হবে? রাগে ধকধক করছিল দুর্গার চোখ। সাইমন বেশিক্ষণ তার আগুন চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না। সে পালিয়ে বাঁচতে চাইছিল। কিন্তু দুর্গা তার পথ আগলে দাঁড়াল। শক্ত গলায় সে বলল, আমার বুড়া বাপটার কিছু হয়ে গেলে বস্তিতে আমি সবাইকে ধরে ধরে বলব। বলব, তুমি আমাকে পাবার জন্য আমার বুড়া বাপটাকে বিষমদ খাইয়ে দিয়েছ। তোমার পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে নেবে বস্তির লোকে। আমি সেই চামড়া দিয়ে জুতা বানাব। কথাগুলো বলে দুর্গা চলে যেতে চাইছিল, এবার সাইমন গিয়ে হাত মেলে দাঁড়াল তার সামনে, কাতর হয়ে বলল, দুর্গা, শোনো আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার বাপ. সে তো আমারও বাপ। আমি কেন তাকে মারতে যাব বিষমদ খাইয়ে? বুড়াটা পিপলতায় শুয়েছিল খিদে পেট নিয়ে। আমাকে দেখতে পেয়ে বলল, বেটা সাইমন, গলাটা শুকায়। তুই আমাকে টুকে দারু এনে দে না। আমি বুড়া মানুষের কথা ঠেলতে পারিনি। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম দারুভাটিতে। সেখানে গিয়ে তোমার বাপ এমন খাওয়া খেল যে আর উঠতে পারল না। আমি তাকে অনেক নিষেধ করেছিলাম। সে আমার কথা শুনল না। উলটে তোমাকে গাল দিয়ে বলল, ও আমার বিটি নয়রে, ও হল সাক্ষাৎ রাক্ষুসী। রাক্ষুসী না হলে কি বুড়া বাপের হাত থেকে কেউ মদের গেলাশ কেড়ে নেয়!

—মিছে কথা, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিনে। দুর্গার দু-চোখে জলের ধারা, সাইমনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে ছুটে গেল ঝড়ের বেগে। হাঁ-করে সাইমন দেখল দুর্গার আঁচল উড়ছে হাওয়ায়। যেন দুর্গা নয়, একটা প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে তার নাগালের বাইরে দিয়ে।

পরের দিন সকালে সাইমনকে সবার সামনে শম্ভুবাবু ধমকালেন, ফের যদি দুর্গার সঙ্গে অসভ্যতা করো তাহলে তোমাকে আমি এখান থেকে বদলি করে দেব। কাজ করতে এসেছ, মন দিয়ে কাজ করো। আর তোমার যদি এত বিয়ে করার শখ তাহলে মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেলো। দুর্গাকে আর জ্বালাতন করবে না। ও বস্তিতে থাকলেও তোমার মতো অত নোংরা নয়।

শম্ভুবাবুর কথাগুলো সারা গায়ে বিষ পিঁপড়ে কামড়ের জ্বলন ধরিয়ে দিয়েছিল সাইমনের। অপমানিত হলে তার চোখে-মুখের চেহারা বদলে যায় পুরোপুরি। সে তখন কারোর দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারে না। মাথা ভার হয়ে ঝুঁকে আসে মাটির দিকে। চোখে-মুখে ফুঠে ওঠে অদ্ভুত নৈঃশব্দতা। সাইমন কাজের জন্য চলে যাচ্ছিল ঝাড়ু হাতে। কাল সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি দুর্গার কথা ভেবে। দুর্গা তার সমস্ত মন জুড়ে বসে আছে। কিছুতেই এই ছবি তার মন থেকে মুচছে না। ফিটকিরি ঝাড়ুকাজে এসে সাইমনকে বুঝিয়ে বলল, তুই এবার দুর্গার আশা ছেড়ে দে। তার চেয়ে বরং চল আমরা মেয়ে দেখে আসি। দুর্গার মতো অমন মেয়ে তুই ঢের পাবি। ওর জন্য কেন মিছিমিছি তুই ভাববি? তুই হলি সরকারি চাকুরিয়া। এবার বিয়ের কথা তুললেই হাজার গণ্ডা মেয়ে জুটে যাবে। চল, মন খারাপ না করে বরং মাল টেনে আসি।

সাইমন মদভাটিতে গেল না, বুকে কিল মেরে সে দুর্গার কোমর দুলিয়ে চলে যাওয়া দেখল অন্য গ্যাংয়ের সঙ্গে। শম্ভুবাবু এত কিছু জানার পরে দুর্গাকে যে তার গ্যাংয়ে রাখবে না, এটা সে ধরেই নিয়েছিল। দুর্গা চলে যাবার পর সাইমন তার ঘেমো বুকটায় হাত বুলাল বারবার। এক সময় নাক-কান মুলে সে প্রতিজ্ঞা করল, আর নয়, ঢের হয়েছে। দুর্গার পেছনে দৌড়ে তার হাত-পা ভাঙবে, কাজের কাজ কিছু হবে না। সে-ও এক বাপের বাচ্চা। সে কেন একটা মেয়ের কাছে এত ছোট হতে যাবে। রোদ ওঠার পর ফিটকিরিকে সে ধরে নিয়ে গেল মদভাটিতে। ভরপেট মদ গিলে টলতে টলতে ফিরে গেল বস্তিতে।

সাইমনের ঘরের সামনে কুলগাছ, রোজ সেখানে কাক-চড়ুইয়ের হাট বসে। মদ-মেদো চোখে সাইমন হাঁ-করে তাকিয়ে থাকে পাখিগুলোর দিকে। খুদে-খুদে পাখিদের ভাব-ভালোবাসার, প্রেম-পিরিত সবই নজরে পড়ে তার। পাখিগুলো তার চাইতে কত সুখী। তাদেরও কথা বলার, সময় কাটানোর ব্যবস্থা আছে। পাখিদের যা আছে, সাইমনের তা নেই।

মন চাইলে অ্যালুমিনিয়ামের ছোট হাঁড়িটাতে ভাত ফুটিয়ে নেয় সে, নাহলে কুন্তিবুড়ীর দোরে গিয়ে পাত পেড়ে বসে। বুড়ীটা তাকে ছেলের মতো ভালোবাসে, তারও তিনকূলে কেউ নেই, সাইমন চাল-ডাল কিনে দিলে বুড়ীটা তার জন্য দুটো ভাত ফুটিয়ে রাখে।

ক-দিন থেকে সাইমন অন্যমনস্ক। খেতে বসেও খাওয়ায় তার মন নেই। উদাস চোখ মেলে সে শুধু তাকিয়ে থাকে দুর্গাদের টালির ঘরটার দিকে। বস্তির কলে দুর্গা একবারও পিছন ঘুরে তাকায় না। সে তার দেমাক নিয়ে মেতে আছে। বস্তির কোনো ছেলের প্রতি তার কোনো দুর্বলতা নেই। সে পাঁকে থাকবে, অথচ গায়ে পাঁক লাগাবে না এমন তার চালচলন।

কুন্তিবুড়ীর বিচক্ষণ চোখে কোনো কিছুই এড়ায় না। সে সাইমনের উলঝাল, নেশাগ্রস্ত মনের ঠিকানাটা বুঝতে পেরেছে। পাশে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে কুন্তিবুড়ী বলল, বেটারে, আসমানের চান্দার জন্যি দুখ করা তোর ভুল। চান্দা কারোর একার নয়, সবার। যা বেটা, গা ধুয়ে আয়। খানা-পিনা সেরে টুকে নিদ্ যা। আরামসে নিদ গেলে তোর পোড়া মন টুকে জুড়াবে।

—নিদ্ আসে না মাসী! সাইমনের গলা বুজে আসে অভিমানে।

—তোর বাপও তোর মতন কাঙাল ছিল ভালোবাসার। সে সব সময় কী যে খুজত তোর মায়ের চোখে! কুন্তিবুড়ী ফিরে যেতে চাইল অতীতে। সাইমন বুড়ীর ঘোলাটে চোখের দিকে তাকিয়ে ব্যথা ভরা গলায় বলল, আমিও খুঁজছি মাসী, কিন্তু পাচ্ছি না!

—ধৈর্য হারাস নে বেটা, ঠিক পাবি। উপরওলা সবাইকে সমান চোখে দেখে। কুন্তি বুড়ীর বয়স চেহারা দেখে বোঝা ভার, তবে চোখে সে এখন কম দেখে। আগে শীতলাঠাকুর নিয়ে ভিখ্ মাঙতে যেত পাড়ায়-পাড়ায়, কিন্তু এখন আর সে পারে না। ভ্রাম্যমাণ শীতলাঠাকুরকে সে ঠাঁই দিয়েছে ঘরের কোণে। গেল মঙ্গলবারে দুর্গা এসেছিল শীতলাঠাকুরের পূজো দিতে। কুন্তিবুড়ীর তাক লেগে যায় দুর্গাকে দেখে। মেয়েটার গায়ের রং বুঝি ফেটে বেরোচ্ছিল সকালের রোদে। একমাথা ভিজে চুল পিঠের উপর ছড়ানো। কপালের গোল টিপখানা তার মুখের সঙ্গে মানাচ্ছিল ভীষণ। কুন্তিবুড়ীর মনে হয়েছিল, এ মেয়ে বস্তির নয়, নির্ঘাৎ কোনো বাবুঘরের। সেদিন দুর্গা অনেকক্ষণ তার ঘরে কাটিয়ে গেল। গল্প-গুজবে মন ভরিয়ে দিয়েছিল বুড়ীটার। কথায় কথায় দুর্গার হাত ধরে কুন্তিবুড়ী বলেছিল, তোরে একটা কথা বলি বেটি। মন দিয়ে শুন্। আমার ঘরের সাইমন দিনরাত তোর স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। ছেলেটা মাটির মতন ঠাণ্ডা। তোর সঙ্গে মানাবে ভালো। যদি তোর মত থাকে তাহলে আমাকে বল। আমি তোর বাপের কাছে কথাটা পাড়ব তাহলে।

গরম তেলে জল পড়ার মতো শব্দ উঠেছিল দুর্গার ঠোঁটে, রাগে সে অন্ধ

হয়ে বলেছিল, যা বলেছ মাসী তা আর দ্বিতীয় বার বোলো না। আমি সারাজীবন আইবুড়ো থাকলেও সাইমনের হাত ধরব না!

—কেন ও তোর কী করেছে?

—কী করেনি তাই বলো? ওর জ্বালায় আমি ঝাড়ু কাজে যেতে পারি না। ওর জ্বালায় আমার বুড়া বাপটা আবার দারুভাটির দিকে ঝুঁকেছে। দুর্গার ঠোঁট শক্ত হয়ে এল, আমি বেঁচে থাকতে সাইমন কোনোদিন আমার মনের নাগাল পাবে না। মাসী গো, আমি ওর পায়ে পড়া স্বভাবটাকে ঘৃণা করি।

এসব কথা সাইমনকে নির্দ্বিধায় বলে দিয়েছে কুন্তিবুড়ী। সব শুনে সাইমন ধরা গলায় গলেছে, মাসী গো, দুর্গাকে বলো, ওকে আমি আর জ্বালাব না। ও তো আমার ভয়ে গ্যাং ছেড়ে চলে গিয়েছে অন্য গ্যাংয়ে। আমিও এই বস্তি ছেড়ে চলে যাচ্ছি অন্য বস্তিতে। এখানে আমার বাপ-মা মরেছে। আমি আর মরতে চাই নে।

—কোথায় যাবি রে বেটা ; দুনিয়া গোল, দেখা তো হবেই।

যেদিকে দু-চোখ যায়, আমি চলে যাব মাসী। আমি আর ওর মুখ দেখব না। যে আমাকে ঘৃণা করে, এবার থেকে আমিও তাকে ঘৃণা করতে শিখব। কথাগুলো সাইমন জেদের বশে বললেও তার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে, হাতের উলটো পিঠে চোখ রগড়ে নিয়ে সে বলে, এখানে থাকলে বাপের দশা আমারও একদিন হবে। বাপ হেরেছে বলে আমি আর হারব না মাসী, এবার আমি পালাব। কুন্তিবুড়ী কপালে ভাঁজ ফেলে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবল। সাইমনের দয়ায় তার পেট ভরে আজকাল। ছেলেটা চলে গেলে তার পেট শুকাবে। কে তাকে ঘর খরচের পয়সা দেবে দু-বেলা? সাইমনের হাত ধরে কুন্তিবুড়ী ফিসফিসিয়ে শুধাল, তুই দুর্গাকে পেতে চাস?

চুপ করে থাকল সাইমন।

কুন্তিবুড়ী সাইমনের মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, ঘাবড়াস নে বেটা। আমি তোর জন্য উপায় ভেবে রেখেছি। তবে তিনটে সামান চটজলদি তোকে জোগাড় করে দিতে হবে। মা শীতলাবুড়ীব নাম নিয়ে আমি তোর জন্য বশীকরণের মাদুলি বানাব। দেখবি, দুর্গা ঠিক তোর হাতের মুঠোয় চলে যাবে।

ভাঙা মন জোড়া লাগার আনন্দ হল সাইমনের, কুন্তিবুড়ীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে শুধোল, কী লাগবে মাসী? জান দিয়ে হলেও আমি তোমার সামান জুটিয়ে আনব।

—বাদুড়ের হাড়, কাকের নখুন, আর শাদা শুয়োরের গায়ের লুমা। পরবি বেটা আনতে?

—হ, হ, পারব মাসী।

—কেউ যেন না জানে।

—জানবে না।

ক-দিন ঝাড়ুকাজ থেকে ছুটি নিয়ে নিল সাইমন। গুলতি হাতে সে এখন ঘুরছে অলিতে-গলিতে। বাদুড়ের হাড় আর শাদা শুয়োরের লোম সে জোগাড় করেছে গুনিনের কাছ থেকে। এর জন্য চড়া দাম দিতে হয়েছে তাকে। টাকা-পয়সার কথা সে এখন আর ভাবছে না। যে কেনো মূল্যে সে চায় কাকের নখ জোগাড় করতে। তার বাপ ছিল ভালোবাসার কাঙাল। তার মা বাপকে দু-চোখে দেখত না। একজনের সিঁদুর পরে সে দেহ দিত অন্যজনের কাছে। তার স্বভাব ছিল বারমুখী। বস্তির সবাই জানত এসব ঘটনা। কিন্তু কেউ সাইমনের কাছে মুখ খোলেনি। কুন্তিবুড়ী একদিন মদ খেয়ে গড়গড়িয়ে বলে ফেলল সব, তুই হলি অ্যাংলোশাহাবের বেটা। তোর মা মরার আগে আমাকে বলে গিয়েছে কথাটা। একথা এতদিন আমার পেটের ভেতরে ছিল। আজ পেট খোলশা করে আমি হালকা হলাম।

সাইমন যে অ্যাংলোশাহেবের বেটা এসব নিয়ে বস্তির কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই। তার গায়ের রং, চুলের খয়রেটে ভাব—সবকিছুতেই সাহেবিপনা। আয়নায় নিজেকে দেখে সাইমন অনেক সময় চিনতে পারে না। তখন বুক ভেঙে যায় কষ্টে। কুন্তিবুড়ীর হাতদুটো চেপে ধরে সে শুধায়, মাসী গো, মা কেন আমার বাপটারে ভালোবাসত না? বাপের কি শরীরে কোনো অসুখ ছিল?

—না না, তার শরীরে কোনো অসুখ ছিল না, সে ছিল খাঁচাভাঙা ময়নাপাখি। যেদিকে মন যেত, চলে যেত। তোর মা-ও চাইত সে চলে যাক। দারু খেয়ে পড়ে থাকুক নালীর ধারে, তাহলে তার মস্ত সুবিধা। কুন্তিবুড়ী ঢোক গিলে আড়ষ্ট চোখে তাকাত, মনের জড়তা ঝেড়ে ফেলে বলত, অ্যাংলোসাহাবটা রোজ আসত তোর মায়ের ঘরে। সে তো খেতে-পরতে দিত, তাই সব উসুল করে নিত সুদে-আসলে। তোর মা-ও কোনো বাধা দিত না।

—শালা কুত্তার বাচ্চা! অ্যাংলোসাহেব বেঁচে থাকলে আমি তার টুঁটি ছিঁড়ে নিতাম! সাইমনের চোখদুটো ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে আগুনের গোলা। হাঁপাতে হাঁপাতে লালা ঝরত তার মুখ দিয়ে। মদের বোতলটা নিঃশেষ করে সে আবার বেহেড হয়ে শুয়ে থাকত খাটিয়ায়।

তার বাবা বুকের ভেতরে আগ্নেয়গিরি লুকিয়ে রেখে মরেছে, সাইমন তার বাপের মতো মরবে না। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে সে আঙুল বেঁকাতে বাধ্য হবে। দুর্গাকে সে সহজে ছেড়ে দেবে না। অপমানের বদলা নিয়ে সে শান্ত হবে। বস্তিতে ভালো-মন্দ মানুষ মাছ ও জলপোকার মতো পাশাপাশি বাস করে। কুন্তিবুড়ীর ওষুধ যদি কাজ না করে তাহলে সে দুর্গাকে বস্তির পথ দিয়ে হাঁটতে দেবে না। যে তার মনে দগদগে ঘায়ের সৃষ্টি করেছে তার শরীরেও জোর করে ক্ষতচিহ্ন এঁকে দেবে সে। ওর আত্মগরিমায় কালি লেপে দেবে সাইমন। উঁচু,

স্পর্ধিত মাথা নামিয়ে দেবে মাটির দিকে। দরকার হলে মাটিতে মিশিয়ে দেবে সেই মাথা। শম্ভুবাবুর চোখ রাঙানি সে আর বরদাস্ত করবে না। কেন করবে? শম্ভুবাবু কে হয় তাকে শাসন করার? সাইমনের বুকের চারপাশ দিয়ে ঘামের ধারা নেমে আসল তরতরিয়ে। রুমাল বের করে শরীরের ঘাম মুছে নিয়ে সাইমন হেঁটে গেল চা-দোকানে।

বস্তির চা-দোকানটায় সবসময় গিজগিজ করে ভিড়, টেপ বাজে, চ্যাংড়া ছোকরাগুলো ঘাড় দোলায় আড্ডা মারার ছলে। এই দোকানটায় ধার বাকি খায় সাইমন। ডিউটি যাওয়ার পথে এখানে সে একবার দাঁড়াবেই। চা-দোকানে তার সঙ্গে দেখা হল ফিটকিরির। তার চোখে-মুখে চিন্তা। ইশারায় সাইমনকে বাইরে আসতে বলে সে দাঁড়াল একটা কুসুম গাছের গোড়ায়। সাইমন তার মুখোমুখি দাঁড়াতেই ফিটকিরি বলল, তোর কপাল পুড়েছে ভাইরে, জয়রামের বিটিকে দেখতে এসেছিল জামুনবস্তির লোকেরা। মেয়ে ওদের পছন্দ হয়েছে শুনলাম। তোর এখন কী হবে ভাইরে? তুই কি দুর্গাকে ছাড়া বাঁচতে পারবি এক দণ্ড?

অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পাবল না কসাইমন, বিড়ি বের করে ফুকফুক্ দম দিয়ে সে পাগলের চোখে তাকাল, তারপর একসময় বিড়িটা ফেলে দিয়ে নিজের চুলের মুঠি চেপে ধরল সে। ফিটকিরির হাতটা ধরে অস্বাভাবিক গলায় সে বলল, আমার দুর্গাকে কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। যে আসবে বাধা দিতে, আমি তার বুকে ছোরা ঢুকিয়ে দেব। সাইমন কথা বলতে বলতে এক সময় বোবা হয়ে গেল, ফিটকিরির হাতটা জোরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, কুন্তিবুড়ী আমাকে বলেছে—সে আমাকে মাদুলি বানিয়ে দেবে। সেই মাদুলি পরে ঘুরলে দুর্গা চিরদিনের জন্য আমার হয়ে যাবে। ও কারোর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবে না।

—তাহলে মাদুলিটা চট-জলদি বানিয়ে নে। ফটকিরির গলায় ফুটে উঠল ব্যস্ততা, পাখি উড়ে গেলে ধরা খুব শক্ত হয়রে।

—মাদুলি বানাতে তিনটে সামান দরকার। তার দুটো আমি জোগাড় করতে পেরেছি। সাইমনের চোখে ফুটে উঠল আশার আলো, আর-একটা সামান জোগাড় হলেই দুর্গা আমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে!

—কী সেই সামান?

—তেমন কিছু নয়, কাকের নখুন! সাইমন সহজ হতে চাইল ফিটকিরির সামনে। ফিটকিরি তাকে উৎসাহ দিয়ে বলল, কাকের নখুন পেয়ে যাবি, কিন্তু তার বদলে তুই আমাকে এক বোতল মহুয়া খাওয়াবি বল?

—এক বোতল কেন, তিন বোতল খাওয়াব—বল কোথায় পাব সামানটা? মাথা চুলকে কিছু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল ফিটকিরি। কাক সহজদর্শন পাখি হলেও সহজলভ্য পাখি নয়। বস্তির নোংরা ফেলা ঢিপিটার কাছে রোজ

কাক আসে গাদাগুচ্ছের। দিনভর পাখিগুলো ঘোরাঘুরি করে নোংরা খাওয়ার লোভে। মানুষের ছায়া দেখলে উড়ে পালায় কালো কালো পাখিগুলো। ওদের ধরা বড় শক্ত। ফিটকিরি কপালে ভাঁজ ফেলে আর-একবার সাইমনের প্রেমকাতর মুখের দিকে তাকাল। কষ্ট হল তার। এমন পাগল মানুষ সে আর দেখেনি। মনে মনে হাসি পেলেও নিজেকে সামলে নিল ফিটকিরি, সাইমনের কাঁধে আলতো থাপ্পড় মেরে সে বলল, চল আমার সঙ্গে, আমি তোকে কাকের দেশে নিয়ে যাই।

—কাকের দেশ, সেটা আবার কোথায় গো? সাইমনের চোখে-মুখে বিস্ময়। ফিটকিরি তার হাত ধরে টানল ; পিচসড়কে উঠে এসে সে বলল, শম্ভুবাবুর ঘরের সামনে যে বুড়া আমগাছটা আছে—সেখানে কাকের বাসা আছে। সেদিন বাবুর বাসায় গিয়ে আমি নিজের কানে কাকের ছায়ের ডাক শুনেছি। ওরা চিঁ চিঁ করে ডাকছিল। ছানাগুলো মনে হয় এখনো উড়তে শেখেনি। চল, এক্ষুনি তুই পেড়ে আনবি গাছে উঠে।

—বাবু যদি কিছু বলে?

—সে চিন্তা তোর নয়, আমার। চল তো, আর দেরি করিস নে।

প্রস্তাবটা মনে ধরার মতো, এক কথায় রাজি হয়ে গেল সাইমন। ফিটকিরিকে সঙ্গে নিয়ে সে হেঁটে এল বুড়া আমগাছটার তলায়। ঝাঁকড়া মাথার আমগাছটার গোড়া বয়সের জন্য ফোঁপরা। সাইমন একঝলক দেখেই মুখ শুকিয়ে ফিটকিরির দিকে তাকাল। ফিটকিরি তাকে অভয় দিয়ে বলল, ভয় নেই, আমি নীচে আছি—তুই বুক ঠুকে উঠে পড়। তবে সাবধানে উঠিস, বুক ছেঁচড়ে গেলে নুনঘাম লেগে জ্বলবে।

—এই জ্বলুনি সেই জ্বলুনির চাইতে ঢের কম। হাফ-প্যান্টের উপর দিয়ে গামছাটা বেঁধে নিল সাইমন। কাপড়ের টুপিটা খুলে তোল্লা করে ছুঁড়ে দিল ফিটকিরির দিকে। গাছে হাত ছোঁয়াতেই ফিটকিরি তাকে সাবধান করে বলল, গাছে চড়ার আগে তিনবার দণ্ডবৎ কর গাছকে। গাছ তাহলে তোকে খালি হাতে ফেরাবে না।

কথামতো তিনবার গাছের গুঁড়িতে মাথা ছোঁয়াল সাইমন, তারপর ছেঁচড়ে-মেচড়ে কোনোমতে ওঠার চেষ্টা করল। কিছুটা ওঠার পরেই হাঁপ ধরে গেল তার, কোথা থেকে উড়ে এল একরাশ খুদে-খুদে পোকা। পোকাগুলো যেন তার পথ আটকে দিতে চাইল। সাইমন নিজের জেদে টইটম্বুর, পোকা কেন আজ যদি বিষধর সাপ এসে তার পথ আগলে দাঁড়ায় তাহলেও সে হার মানবে না কারোর কাছে। সে উঠবে, আমগাছের মগডাল থেকে পেড়ে আনবে কাকের বাচ্চা। যে কোনো শর্তে তার কাকের নখুন চাই। মা শীতলাবুড়ীর দয়ায় দুর্গা তার ঘরের বউ হবে। হেসে হেসে কথা বলবে, চা করে দেবে, ভাত বেড়ে দেবে, দুপুরবেলায়

খাটিয়ায় শুয়ে ঘামাচি মেরে দেবে পুট্‌পুট্‌ করে। দূর আকাশ থেকে তার বাপ দেখে বাহবা দিয়ে বলবে, সাবাস বেটা! আমি যা পারিনি, তুই তা করে দেখালি। তুই আমার পুরনো বেদনায় মলম ঘষে দিলি। তরতরিয়ে এ-ডাল সে-ডাল ধরে মগডালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সাইমন, অনভ্যাসে তার গা-হাত-পায়ের চামড়া ছড়ে গেল আমের ডালে। তবু কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না সাইমনের, তার পাগল চোখদুটো শুধু খুঁজছিল কাকের বাসা। মোটা একটা ডাল ধরে সে যখন টিকলির দিকে তাকাল তখনই নজরে পড়ল খড়কুটো দিয়ে এলোমেলো সাজানো কাকের বাসাটা। গা ঘেমে গেল উত্তেজনায়, হাতের তালু বেয়ে ঘাম চুঁইয়ে মিশে গেল কব্জিতে। আর মাত্র ক-হাত উঠতে পারলেই সে ছুঁয়ে দেবে তার স্বপ্নের পাখি।

নীচ থেকে ফিটকিরি তাকে উৎসাহ দেবার জন্য চিৎকার করে উঠল, খপ্‌ খপ্‌ উঠে যা ভাইরে, আর দাঁড়াস নে। ঝোঁকে-ঝোঁকে না উঠলে তোর কষ্ট বাড়বে।

মাথার উপর দাউ দাউ করে জ্বলছিল সূর্য, এলোমেলো হাওয়া ঠোঁটে আগুনের তীর নিয়ে খোঁচা মারছিল সাইমনের দেহে। আমগাছের পাতায় জড়িয়ে যাচ্ছিল সাইমনের পিঠের ঘাম। খুব ভালো করে কাকের বাসাটা দেখে নিয়ে সে আবার উঠতে শুরু করল। সামনে আর কোনো বাধা নেই, আর মাত্র দুটো ডাল পেরোলেই সে ছুঁয়ে দেবে কাকের বাসা। সাইমনের গায়ের লোম চেগে উঠল আনন্দ শিহরনে, সে তরতর করে উঠতে থাকল উপরে....

বাসাটার কাছাকাছি পৌঁছাতেই তার কানে এবার ভেসে এল কাকের তীক্ষ্ণ, কর্কশ চিৎকার। একটা-দুটো কাক নয়, প্রায় 'বিশটা কাক গোল হয়ে উড়ল তার মাথার উপর। চক্কর কেটে উড়তে-উড়তে কালো পাখিগুলো মাথা নিচু করে রকেট গতিতে নেমে আসছিল আমগাছের মগডালে। বাসার ভেতর থেকে বিপদের আঁচ বুঝতে পেরে কাকের বাচ্চাদুটো ডাকছিল চিঁ-চিঁ শব্দে। সব মিলিয়ে সে এক ভয়ংকর শব্দযুদ্ধ। সাইমন ঘাড় তুলে আর-একবার তাকাতেই মাদী কাকটা হিংস্র চোখ-মুখ নিয়ে নেমে এল সাইমনের মাথার কাছাকাছি। একহাতে ডাল ধরে অন্য হাত দিয়ে কোনোমতে মাথাটা বাঁচাল সাইমন। এমন অপ্রত্যাশিত বিপদের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না আদৌ। ফিটকিরি বিপদ বুঝে নীচ থেকে চিৎকার করে বলল, ভয় পাস নে রে ভাই। আমের ডাল ভেঙে মাথার উপর ঘোরা।

ডাল ভাঙার আর সময় হল না সাইমনের। তার আগে দুটো কাক ছোঁ মেরে নেমে আসল তার মাথার উপর, কঠিন ঠোঁট দিয়ে সক্রোধে ঠুকরে উড়ে পালাল নাগালের বাইরে। গল গল করে রক্তের ধারা নেমে আসল সাইমনের কপাল বেয়ে। যন্ত্রণায় বেঁকে-চুরে গেল শরীর। নীচ থেকে ফিটকিরি তাকে উৎসাহ দিয়ে

বলল, আর দেরি না করে কাকের ছা-দুটো তুই পেড়ে আন। দেরি করলে বিপদ হতে পারে। হা দেখ, কত কাক উড়ে আসছে চারদিক থেকে।

সাইমনের কোনো কিছু দেখার সময় ছিল না, মরিয়া হয়ে সে হাত বাড়িয়ে দিল কাকের বাসায়। কিন্তু তার আগে একদল কাক হিংস্র ডানা মেলে, ক্ষুরধার ঠোঁট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। এক হাতে চোখ ঢেকে, অন্য হাতে ডাল ধরে সাইমন ক্রমাগত সহ্য করতে লাগল কাকের আক্রমণ। এক সময় জ্বালাপোড়া করে উঠল তার পুরো শরীর। রক্ত গড়িয়ে ভিজে গেল বুক-পিঠ-গলা। মুখের নরম মাংস, কানের লতি শক্ত ঠোঁট দিয়ে চিরে ফালাফালা করে উড়ে বেড়াতে লাগল কাকের দল। সাইমনের আর দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা ছিল না, রক্তঘামে ক্রমশ পেছল হয়ে উঠছিল তার হাতদুটো। বেগতিক দেখে ফিটকিরি নীচ থেকে ছুঁড়ে মারল ইট-পাটকেল। কিন্তু কোনো কাজের কাজ হল না। হেরে গিয়ে ভয়ে সে চিল্লিয়ে-চিল্লিয়ে বলল, নেমে আয় ভাইরে, নেমে আয়। এগুলো কাক নয়, রাক্ষস! তোকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

সাইমন হারবে না, জেদ ঘিরে রাখে তার পুরো শরীর। মাজা সোজা করে সে যখন শেষবারের মতো হাত বাড়াল বাসাটার দিকে তখনই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রতিশোধমুখর কাকের দল। পাখিগুলো ঠুকরে ছিন্নভিন্ন করে দিল তার হাতদুটো। জ্ঞান হারানোর আগে সাইমন মনে করতে চাইল দুর্গার মুখখানা, কিন্তু দু-চোখে ধোঁয়া দেখল সে। কানের ভেতর ক্রমাগত ঢুকে যেতে লাগল শব্দবিষ, কা-কা-কা।

এ-ডালে সে-ডালে ঠোক্কর খেয়ে সাইমন যখন ঠিকরে পড়ল নীচে তখন তার থেঁতলে যাওয়া শরীরটার দিক তাকিয়ে নিমেষে মূক হয়ে যাওয়া ফিটকিরি ভাবল, এ আর বাঁচবে না! শম্ভুবাবুর কোয়ার্টারের দিকে তাকিয়ে ভয়ে সে আর্তনাদ করে উঠল, কে কোথায় আছো, ছুটে আসো গো-ও-ও-ও।

হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স এল আধঘণ্টার মধ্যে। পিলপিল করে বস্তি ভেঙে লোক এসে জড়ো হল হাসপাতালের বারান্দায়। সাইমনের ডান পাটা কুঁচিয়ে ভেঙে গেছে পুরোপুরি। আঘাত যা লেগেছে তাতে বাহাত্তর ঘণ্টা না পেরোলে ডাক্তার তার আয়ু নিয়ে কোনো কথা বলতে নারাজ।

কুন্তিবুড়ী কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছিল হাসপাতালে, দুর্গা তার পথ আগলে দাঁড়াল, খবরটা শোনার পর থেকে তার বুকের ভেতরে ভীষণ রকমের তোলপাড়, ব্যাকুল হয়ে শুধোল, মাসী গো, সাইমন বাঁচবে তো?

—ভগবানকে ডাক। কুন্তিবুড়ী চোখ মুছে নিল আঁচলে, তারপর দুর্গার দিকে তাকিয়ে বলল, যাবি মা, তাকে একবার দেখতে? আজ তার এই দশা শুধুমাত্র তোর জন্য। তোর জন্য সে কাকের ছা ধরতে গাছে চড়েছিল খরাবেলায়!

—আমার জন্য?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ বিটি তোর জন্য! কুন্তিবুড়ী থামল, তারপর অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, আমি তারে বলেছিলাম বশীকরণের মাদুলি বানিয়ে দেব। সেই মাদুলি পরে ঘুরলে তোর সঙ্গে তার ভাব হবে। সেইজন্য বেটা আমার কাকের নখুন আনতে গাছে চড়েছিল। মাদুলিতে কিছু হয় না রে বিটি, এসব ছিল আমার মনগড়া কথা। সে তোর জন্য পাগল বিটি। এমন পিরিত কাঙাল ছেলে আমি জীবনে দেখিনি। ছোটবেলা থেকে সে কারোর ভালোবাসা পায়নি, তাই এত ভিখারিপনা।

দুর্গা সাইমনকে দেখে ফিরে আসল ঘরে। কোনো কাজে তার মন বসল না। বারবার করে চোখে ভেসে উঠল, সাইমনের অচৈতন্য দেহটা। নিজেকে তার অপরাধী মনে হল নানা কারণে। খরায় পোড়া আকাশে হঠাৎ উদয় হল একটুকরো জলবাহী মেঘ। সেই মেঘের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ঠোঁট কেঁপে উঠল দুর্গার। একছুটে সে চলে গেল শীতলাতলায়। মানত করে ফিরে আসার সময় সে কিনে আনল বিষ পুরিয়া।

প্রতিদিন রোদ এসে খেলা করে যায় উঠোনে। বিষমাখা ভাত ছড়িয়ে দুর্গা বসে থাকে কাকের অপেক্ষায়। দূর-দুরান্ত থেকে জলবাহী মেঘের মতো উড়ে আসবে কাক। ঠুকরে ঠুকরে খাবে ভাত। তারপর ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। বস্তিতে কাকের জ্বালায় কি মানুষ থাকতে পারবে না? ভালোবাসার অঙ্কুর কি পুড়ে খাক হয়ে যাবে খরায়? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে দু-চোখে জল ভরে আসে দুর্গার। দিনে দিনে রোদ সরে গিয়ে ছায়া নামে তার মনে। □